ব্যাপ্তির একবিংশতি প্রকার লক্ষণ: গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের দৃষ্টিতে একটি পর্যালোচনা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পি.এইচ.ডি. (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা অভিসন্দর্ভ

গবেষক

বুদ্ধদেব চ্যাটার্জ্জী

তত্ত্বাবধায়ক

ড. দীপায়ন পট্টনায়ক

অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

দর্শন বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা – ৭০০০৩২

২০২৪

Certified that the Thesis entitled

I hereby declare that the work which is being presented in the thesis, entitled

"ব্যাপ্তির একবিংশতি প্রকার লক্ষণ: গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের দৃষ্টিতে একটি পর্যালোচনা"

submitted by me for the award of the Degree of Doctor of Philosophy in Arts at Jadavpur University is based upon my work carried out under the Supervision of Prof. Dipayan Pattanayak, and that neither this thesis nor any part of it has been submitted before for any degree or diploma anywhere / elsewhere.

Countersigned by

Supervisor:

Date: 26/11/2024

Professor
Department of Philosophy
Jadavpur University
Kolkata - 700 032

Candidate: Buddhadeb Chatterjee

Date: 26/11/2024

উৎসর্গ

পরমারাধ্য স্বর্গত

মাতামহ গদাধর আচার্য্য

ও

মাতামহী গীতা আচার্য্য-এর

পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশ্যে

প্রস্তাবনা

ইতর প্রাণী থেকে মনুষ্যের স্বাতন্ত্র্য প্রতিফলিত হয় তার বিচারশীলতায়। দৃশ্যমান ঘটনাকে বুদ্ধিস্থ করতে গিয়ে মনুষ্য এমন সব তত্ত্বে উপনীত হয় যেগুলি দৃশ্যমান নয়। দৃশ্যমানকে অবলম্বন করে অদৃশ্যে উপনীত হওয়ার এই মননাত্মক প্রক্রিয়াকে বলে অনুমান। এ নিছক আন্দাজ নয় বরং প্রমাণের সাহায্যে অর্থের স্বরূপ নিরূপণের এক জটিল প্রক্রিয়া। এই প্রামাণিক প্রক্রিয়া সম্ভব হয় দৃশ্যমান ঘটনার সঙ্গে অদৃশ্যমানের এক চিরায়ত সম্বন্ধের জ্ঞানকে অবলম্বন করে। এই সম্বন্ধ ভারতীয় পণ্ডিতকুলে পরিচিত লিঙ্গ-লিঙ্গী সম্বন্ধ হিসাবে। এই সম্বন্ধের স্বরূপ নিরূপণ যে দর্শনে সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করেছে তা হল ন্যায়শাস্ত্র বা আন্বীক্ষিকী বিদ্যা। ন্যায়দর্শনে লিঙ্গ-লিঙ্গীর এই সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি বলা হয়। ন্যায় মতের আলোকে বিশেষত নব্য ন্যায়ের ধারা অবলম্বন করে ব্যাপ্তি সম্বন্ধের স্বরূপ অনুধাবনের চেষ্টাতেই এই গবেষণাকর্ম।

স্নাতকস্তরে ‘তর্কসংগ্রহ’ পাঠের সময় থেকে ব্যাপ্তি বিষয়ে গভীর বিশ্লেষণের প্রতি যে আকর্ষণ তৈরি হয়েছিল স্নাতকোত্তরে ‘ব্যাপ্তিপঞ্চক’ পাঠের পর সেই আকর্ষণ আরও তীব্র হয়। গবেষণার বিষয় হিসাবে ব্যাপ্তিকে নির্বাচনের মূলেও রয়েছে সেই জটিল চিন্তার গভীরে ডুব দেওয়ার বাসনা। কিন্তু সাধ ও সাধ্যের মধ্যে ব্যবধান দুস্তর। সেই ব্যবধান দূর করে নব্য ন্যায়ের গভীর অরণ্যে কিছু পথ পাড়ি দেওয়া সম্ভব হয়েছে যাঁর হাত ধরে তিনি এই গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক দীপায়ন পট্টনায়ক। স্নাতক স্তরে প্রথম বর্ষে দর্শনের প্রথম পাঠ লাভ যাঁর কাছে – যাঁর পাঠদান থেকেই দার্শনিক অনুসন্ধিৎসার জন্ম – গবেষণাকর্মের তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে তাঁর পুনঃপ্রাপ্তি একজন ছাত্রের কাছে অনেকখানি

সৌভাগ্যের বিষয়। তবে অধ্যাপক পট্টনায়ক আমার কাছে শুধু তত্ত্বাবধায়কই নন, একজন পিতৃপ্রতিম অভিভাবকও। জীবনের নানা পর্যায়ে ঘাত-প্রতিঘাতে ক্ষত-বিক্ষত একজন দুঃস্থ ছাত্রকে সস্নেহে কীভাবে লালন করে জীবনপথে অগ্রসর হতে হয়, মননে পটু করে তুলতে হয়, তার এক আদর্শ দৃষ্টান্ত। তাঁর আশ্রয়, প্রশ্রয়, শাসন আমাকে চিরঋণী করেছে। ধন্যবাদ, নমস্কার, শ্রদ্ধা এসব শব্দের সীমায় তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতাকে ব্যক্ত করা যাবে না।

তত্ত্বাবধায়কের পাশাপাশি গবেষণা বিষয়ক উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্যা হিসাবে অধ্যাপিকা সবিতা সামন্তের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। নিয়মিতভাবে গবেষণার অগ্রগতি অবলোকন করে নানা বিষয়ে উপদেশ ও ভাবনা দান করে তিনি এই গবেষণাকর্মকে সম্পন্ন করতে সহায়তা করেছেন। এই গবেষণাকর্মের সঙ্গে সরকারি নিয়মে যে মানুষের কোনো যোগ নেই সেই লাল বাহাদুর শাস্ত্রী কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় পণ্ডিত অধ্যাপক বিষ্ণুপদ মহাপাত্রের চরণে আমার বিনম্র প্রণাম জানাই। অধ্যাপক মহাপাত্র বহু সময় মূলগ্রন্থের পাঠোদ্ধারের ক্ষেত্রে আমাকে প্রভূত সহায়তা করেছেন।

বাঁকুড়া জিলা সারদামণি মহিলা মহাবিদ্যাপীঠে আমার সহকর্মীরা, বিশেষ করে অনুপ্রিয়দা, হারাধনদা, সায়ন্তনদা, আনবিকদা, ঋতুপর্ণদা, অমিত বৈরাগীদা, অমিত সানাদা, জাহাঙ্গীরদা, আনন্দদা ও মনোজের প্রতিও আমি অশেষ কৃতজ্ঞ। তাদের সহায়তা ও উৎসাহদান শ্লথ হয়ে পড়া গবেষণাকর্মে বহু সময় প্রাণসঞ্চার করেছে।

এই গবেষণাকর্মে যারা প্রতিনিয়ত প্রেরণা জুগিয়ে এসেছে এবং সর্বতোভাবে তাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে তাদের মধ্যে প্রিয় দাদা অনিরুদ্ধ চক্রবর্তীর নাম যেমন সর্বাগ্রে আসে, তেমনই আসে বন্ধুপ্রতিম দয়াময় মাজি, ভূতনাথ

জানা ও ভ্রাতৃপ্রতিম অসীম মাজি, উদয় কুমার মণ্ডল, পলাশ প্রামাণিক, সৌমিক সাহা, ভাস্কর পাল, সুমন আদক, সাহেব সামন্ত, সুব্রত ক্ষেত্রী ও জয় দাসের নাম।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং বাঁকুড়া জিলা সারদামণি মহিলা মহাবিদ্যাপীঠের গ্রন্থাগারের সকল কর্মীদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। বিশেষত সারদামণি মহিলা মহাবিদ্যাপীঠের উজ্জ্বল ও প্রলয়দা প্রতিনিয়ত নানা মূল্যবান গ্রন্থ সন্ধানে যেভাবে আমায় সহায়তা করেছেন তা উল্লেখের দাবি রাখে।

অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারে লালিত হয় যে সন্তান, তার পথ চলা যে কতখানি কঠিন তা ভুক্তভোগী মাত্রই অবগত। শৈশবে পিতৃহীন একটি শিশুকে বড়ো করে তোলার দায় মাতার উপর বর্তায়। কিন্তু এই ভাগ্যহীনের ক্ষেত্রে সে দায় সম্পূর্ণত যিনি বহন করেছেন তিনি আমার মাতামহ স্বর্গতঃ গদাধর আচার্য্য। প্রতি পদক্ষেপে কন্যা ও পুত্রকে আগলে রেখে অত্যন্ত কষ্টের মধ্য দিয়ে তার শিক্ষালাভের পথটিকে উন্মুক্ত রাখার প্রয়াস করেছেন তিনি। মাতার সঙ্গে সঙ্গে সেই মাতামহ এবং সেই সঙ্গে মাতামহী ও মাতৃসদৃশা মাসিমণিদের কাছেও আমি চিরঋণী।

এছাড়াও এই গবেষণাকর্ম সম্পাদন হওয়ার মূলে আমার স্ত্রী মধুরিমার অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যে জীবনের সকল প্রকার জটিলতাকে তুচ্ছ করে প্রতিনিয়ত গবেষণায় প্রাণ জুগিয়েছে, সর্বতোভাবে পাশে থেকেছে, যার বিভিন্ন আহুতি, সমর্থন ও মঙ্গলকামনায় এই মহাযজ্ঞ সমাপ্ত হল, তার প্রতি আমার অশেষ ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

গবেষণার পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য

আপাতদৃষ্টিতে এই গবেষণাকর্মটি একপ্রকার চর্বিত-চর্বন বলে মনে হতে পারে। কেননা নানা দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রাচীন গ্রন্থসমূহ পাঠ করে লিঙ্গ-লিঙ্গী সম্বন্ধ বিষয়ে তাঁদের মতামত উদ্ধার এই গবেষণায় গুরুত্ব পেয়েছে। কিন্তু গভীরে অগ্রসর হলে এই বিষয়টি স্পষ্ট হবে যে এটি ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধার ও বিশ্লেষণের একটি প্রক্রিয়ামাত্র নয়। ঐতিহাসিক তথ্য ও বিশ্লেষণ এই গবেষণাকর্মে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও এটি মূলত একটি উদ্ভাবনী কর্ম। যেখানে পরম্পরাকে গ্রহণ করলে যেসব সমস্যা দেখা দেয় সেগুলির সম্ভাব্য সমাধান অনুসন্ধান করা হয়েছে। ফলে একাধারে এটি বিশ্লেষণমূলক ও ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি গবেষণাকর্ম।

কেন এই গবেষণাকর্মটি উদ্ভাবনমূলক সংক্ষেপে সে বিষয়ে কিছু কথা বলা যাক। ভারতীয় দর্শনে নৈয়ায়িকের প্রমাণ তত্ত্ব যেমন বিশেষ সমাদর লাভ করে থাকে তেমনি সেই প্রমাণ মধ্যে অনুমান বিষয়ে নব্য নৈয়ায়িকের বিশ্লেষণ দার্শনিককুলে বিশেষ সমীহা আদায় করে থাকে। বিশেষ ওই অনুমানের অলোচনায় গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের জটিল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং ব্যাপ্তি বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত লক্ষণ প্রায় সর্বজন গ্রাহ্য বলে গণ্য হয়। যেসব যুক্তিতে গঙ্গেশ প্রতিপক্ষ মীমাংসক আচার্যদের ব্যাপ্তি লক্ষণগুলি খণ্ডন করেন। সেই যুক্তিগুলি নির্ণায়ক বা চুড়ান্ত বলে বিদ্বৎসমাজ স্বীকার করেন। কিন্তু মণিকারের ওই খণ্ডন কি সত্যিই চূড়ান্ত? বিশেষত কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতির ক্ষেত্রে অব্যাপ্তি হয়– এই অজুহাতে তিনি যখন মীমাংসক সম্মত ব্যাপ্তি পঞ্চলক্ষণ বা শশধর, মণিধর সম্মত সিংহ-ব্যাঘ্র লক্ষণের বিরুদ্ধে দোষ প্রদর্শন করেন তখন কি তাঁর সেই আপত্তি সর্বজনগ্রাহ্য হয়?

এমন বহু আচার্য রয়েছেন যারা কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতিকে বৈধ অনুমিতি বলে গণ্য করেন না। শুধু পূর্বপক্ষী দার্শনিক নয় বহু নব্য নৈয়ায়িকও মনে করেন যেখানে সাধ্য কেবলান্বয়ী সেখানে অনুমিতি অনুপসংহারী হতে বাধ্য। যদি এই ভাবনা সঠিক হয় তাহলে গঙ্গেশ যে অব্যাপ্তির আপত্তি অব্যভিচরিতত্ববাদীদের বিরুদ্ধে বা সিংহ-ব্যাঘ্র লক্ষণের বিরুদ্ধে পেশ করেছেন তা অমূলক হয়ে দাঁড়ায় না কি? আর সেক্ষেত্রে বিকল্প যে সিদ্ধান্ত লক্ষণ তিনি পেশ করেছেন তাকে কতখানি সার্থক বলা যায়? এই প্রশ্নগুলির উত্তর সন্ধান এই গবেষণাকর্মের উদ্দেশ্য।

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

ভূমিকা ১-১৪

প্রথম অধ্যায় ১৫-২৩

অনুমিতিতে ব্যাপ্তিজ্ঞানের ভূমিকা

১.১ অনুমান পরিচয়

১.১.১ অনুমানের লক্ষণ

১.২ অনুমিতির ঘটক সমূহ

১.৩ অনুমিতির ঘটক হিসাবে ব্যাপ্তিজ্ঞান

দ্বিতীয় অধ্যায় ২৪-৮৯

লিঙ্গ-লিঙ্গী সম্বন্ধ বিমর্শ

২.১ ব্যাপ্তি বিষয়ে জৈন মত

২.১.১ ‘অভিনিবোধ’ বা অনুমানের পরিচয়

২.১.২ ব্যাপ্তি পরিচয়

২.১.৩ ব্যাপ্তিনিশ্চয়-এর উপায়

২.২ বৌদ্ধ মতে অবিনাভাব

২.২.১ অনুমান বিষয়ে দ্বি-প্রমাণবাদী বৌদ্ধ মত

২.২.২ লিঙ্গ-লিঙ্গী সম্বন্ধরূপে অবিনাভাব

২.৩ লিঙ্গ-লিঙ্গী সম্বন্ধ বিষয়ে প্রাচীন ন্যায় মত

২.৩.১ প্রাচীন মতে ব্যাপ্তি

২.৩.২ ব্যাপ্তিগ্রহোপায় বিষয়ে প্রাচীন মত

২.৪ বৈশেষিক মতে ব্যাপ্তি

২.৪.১ লৈঙ্গিক জ্ঞানের পরিচয়

২.৪.২ লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধের পরিচয়

২.৪.৩ ব্যাপ্তিগ্রহ প্রসঙ্গ

২.৫ সাংখ্য-যোগে ব্যাপ্তি

২.৫.১ অনুমান পরিচয়

২.৫.২ ব্যাপ্তি পরিচয় ও ব্যাপ্তিগ্রহ প্রসঙ্গ

২.৬ মীমাংসক মতে ব্যাপ্তি

২.৬.১ মীমাংসা দর্শনে অনুমান

২.৬.২ মীমাংসা মতে ব্যাপ্তি সম্বন্ধের স্বরূপ ও ব্যাপ্তিগ্রহের উপায়

২.৭ ব্যাপ্তি বিষয়ে বেদান্তীর ব্যাখ্যা

২.৭.১ বৈদান্তিক দৃষ্টিতে অনুমান

২.৭.২ ব্যাপ্তি বিষয়ে বেদান্তীর ব্যাখ্যা

২.৭.৩ ব্যাপ্তিগ্রহ প্রসঙ্গ

তৃতীয় অধ্যায় ৯০-১০২

নব্য ন্যায়ে ব্যাপ্তি

৩.১ গঙ্গেশ প্রদত্ত ব্যাপ্তির সিদ্ধান্ত লক্ষণ

৩.১.১ সিদ্ধান্ত লক্ষণের রঘুনাথকৃত ব্যাখ্যা

৩.২ ব্যাপ্তি বিষয়ে ভাষাপরিচ্ছেদকারের মত

৩.৩ অন্নংভট্ট ও কেশব মিশ্রের দৃষ্টিতে ব্যাপ্তি

চতুর্থ অধ্যায় ১০৩-১৫৫

গঙ্গেশ কর্তৃক মীমাংসক সম্মত পঞ্চ ব্যাপ্তিলক্ষণের নিরাকরণ

৪.১ অব্যভিচরিতত্ব পদপ্রতিপাদ্য পঞ্চ লক্ষণের ব্যাখ্যা

৪.১.১ সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্ লক্ষণটির ব্যাখ্যা

৪.১.১.১ লক্ষণটির সমাসার্থ

৪.১.১.২ সাধ্যাভাব পদের অর্থ

৪.১.১.৩ সাধ্যাভাববৎ পদের অর্থ

৪.১.১.৪ বৃত্তিত্বাভাব পদের পারিভাষিক অর্থ

৪.১.২ সাধ্যবদ্ভিন্নসাধ্যাভাববদ্বৃত্তিত্বম্ লক্ষণটির অর্থ

৪.১.২.১ লক্ষণার্থ নিরূপণ

৪.১.২.২ অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যক অনুমিতির ক্ষেত্রে লক্ষণটির সমন্বয়

৪.১.৩ সাধ্যবৎপ্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্যম্ লক্ষণের ব্যাখ্যা

৪.১.৩.১ লক্ষণের অর্থ নিরূপণ

৪.১.৩.২ লক্ষণ ঘটক পদসমূহের ব্যাবৃত্তি প্রদর্শন

৪.১.৪ সকল সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিত্বম্ লক্ষণের ব্যাখ্যা

৪.১.৪.১ লক্ষণটির অর্থ নিরূপণ

৪.১.৪.২ লক্ষণ ঘটক পদসমূহের পারিভাষিক অর্থ

৪.১.৫ সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বম্ লক্ষণ ব্যাখ্যা

৪.১.৫.১ লক্ষণার্থ নিরূপণ

৪.১.৫.২ লক্ষণ ঘটক পদসমূহের পারিভাষিক অর্থ নিরূপণ

৪.২ পঞ্চ লক্ষণে দোষ প্রদর্শন

পঞ্চম অধ্যায় ১৫৬-১৭৭

ব্যাপ্তির সিংহ-ব্যাঘ্র লক্ষণদ্বয় ও তদ্‌বিষয়ে গঙ্গেশের আপত্তি ব্যাখ্যা

৫.১ সিংহ ও ব্যাঘ্রের পরিচয়

৫.২ সিংহ-ব্যাঘ্র লক্ষণ ব্যাখ্যা

৫.২.১ সাধ্যাসামানাধিকরণ্যানধিকরণত্বম্ লক্ষণের ব্যাখ্যা

৫.২.১.১ লক্ষণার্থে অসঙ্গতি নিরাকরণে রঘুনাথ

৫.২.১.২ গৌরবের আশঙ্কা ও তা নিরাশে রঘুনাথের বিকল্প ব্যাখ্যা

৫.২.২ সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যানধিকরণত্বম্ লক্ষণটির ব্যাখ্যা

৫.৩ সিংহ-ব্যাঘ্র লক্ষণের বিরুদ্ধে গঙ্গেশের আপত্তি

ষষ্ঠ অধ্যায় ১৭৮-২১৩

ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন অভাব-ঘটিত চতুর্দশ লক্ষণ বিচার

৬.১ ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন অভাবের পরিচয়

৬.২ তাদৃশ অভাব স্বীকারে কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতির স্থলে লক্ষণ সমন্বয়

৬.৩ সৌন্দড়ীয় ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে মণিকারের আপত্তি

৬.৪ সৌন্দড় অনুসরণে আপত্তি নিরসনের চেষ্টা

৬.৫ প্রমেয়সাধ্যক অনুমিতির স্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা ও তার পরিহার

৬.৬ 'অব্যভিচার' শব্দের রঘুনাথকৃত ব্যাখ্যা এবং পূর্বপক্ষী সম্মত চতুর্দশ লক্ষণের বিস্তার

৬.৬.১ 'অব্যভিচার' পদের সৌন্দড়ীয় অর্থ ও রঘুনাথ কল্পিত ব্যাপ্তির দ্বিবিধ লক্ষণ

৬.৬.২ শ্রীনাথ ভট্টাচার্য (চক্রবর্ত্তী) প্রদত্ত ব্যাপ্তির লক্ষণত্রয়

৬.৬.৩ প্রগল্‌ভ সম্মত ব্যাপ্তির ত্রিবিধ লক্ষণ

৬.৬.৪ পক্ষধর মিশ্র-কৃত ব্যাপ্তির লক্ষণ সমূহ

৬.৬.৫ ব্যাপ্তির লক্ষণ নিরূপণে সার্ব্বভৌম

৬.৭ ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন অভাব-ঘটিত চতুর্দশ লক্ষণ খণ্ডন

উপসংহার ২১৪-২৩১

গ্রন্থপঞ্জী ২৩২-২৪২

ভূমিকা

ভারতীয় ঐতিহ্যে দার্শনিক চিন্তার বিকাশ কাল্পনিক চিন্তা রাজ্যে বিচরণের বিলাসিতা থেকে ঘটেনি; তা ঘটেছে একান্তই ব্যবহারিক প্রয়োজন নির্বাহের তাগিদ থেকে। দৈনন্দিন জীবনে দুঃখ-যন্ত্রণা, তাপ-শোক, ব্যাধি-মৃত্যু মানবকে ক্লিষ্ট করেছে। সেই ক্লেশ মোচনের উপায় সন্ধান করেছেন ভারতীয় মনীষীরা। তাঁরা লক্ষ্য করেছেন লৌকিক বা দৃষ্ট উপায়ের দ্বারা দুঃখ সাময়িক ভাবে তিরোহিত হলেও তার আত্যন্তিক নিমোচন ঘটে না। যাগ-যজ্ঞাদি বৈদিক উপায়গুলি অনুসরণ করেও চিরতরে দুঃখ নিবৃত্তি সম্ভব হয় না। ক্ষয়, অবিশুদ্ধি ইত্যাদির কারণে লৌকিক ও বৈদিক উপায় অনুসরণের দ্বারা দুঃখের চির নিবৃত্তির বাসনা কেবল ব্যর্থই হয়। মৃত্যুতেও এই দুঃখ ভোগের পরম্পরার চির অবসান ঘটে না। কৃত কর্মের ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী হওয়ায় পুনরায় জন্মগ্রহণ ও দুঃখ বরণ করতে হয়। এই উপলব্ধিই ভারতীয় দার্শনিকদের তাড়িত করেছে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির পথ সন্ধানে। তাঁরা প্রায় সকলেই এই উপলব্ধিতে পৌঁছেছেন যে দুঃখের কারণ হল অজ্ঞানতা বা অবিদ্যা। প্রকৃত তত্ত্ব বিষয়ে মিথ্যা জ্ঞানই দুঃখের পঙ্কে নিমজ্জিত হওয়ার কারণ। এই পঙ্ক হতে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় হল প্রকৃত তত্ত্বের জ্ঞান।

এই তত্ত্ব বিষয়ে কোনো সর্ববাদী সম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেনি ভারতীয় মনীষীরা। কারোর মতে ওই তত্ত্ব সংখ্যা এক, কারোর মতে দুই, কারোর মতে বহু। সংখ্যা যাই হোক প্রকৃত তত্ত্ব বিষয়ে নিশ্চয় বুদ্ধি ছাড়া যে মুক্তি বা নিঃশ্রেয়স লাভ হতে পারে না, সেই সার সত্যটি তাদের বুদ্ধিস্থ হয়েছে। তাই প্রতিটি সম্প্রদায়ই গুরুত্ব আরোপ করেছে তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপর। এই তত্ত্বজ্ঞান, একজন অদ্বৈত বেদান্তীর কাছে হল নিষ্প্রপঞ্চ

ব্রহ্মজ্ঞান। একইভাবে সাংখ্যাচার্যের কাছে এই জ্ঞান হল ব্যক্ত, অব্যক্ত, জ্ঞ-বিজ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি তার পরিণাম ও পুরুষের ভেদক জ্ঞান। বৌদ্ধ, জৈন প্রভৃতি নাস্তিক সম্প্রদায়ও তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তি লাভের আশা ব্যক্ত করেন। এই মুক্তির বাচক শব্দ বিষয়ে ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে কোনো মতৈক্য নেই। কারোর মতে দুঃখের এই আত্যন্তিক নিবৃত্তির অবস্থা হল 'নির্বাণ', কারোর মতে 'নিঃশ্রেয়স' বা 'অপবর্গ', কেউ একে বলেন 'কৈবল্য'। নাম নানা হলেও এ যে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তির এক অবস্থা এবং তা যে তত্ত্বজ্ঞান দ্বারাই লাভ করা সম্ভব সে বিষয়ে যেমন ভারতীয় সম্প্রদায়গুলি একমত তেমনই প্রমাণ ব্যতীত যে ওই তত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না সে বিষয়েও তাদের মতৈক্য রয়েছে। এভাবে দুঃখ জিজ্ঞাসা থেকে প্রমাণ জিজ্ঞাসায় উপনীত হয়েছে ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলি।

অন্যান্য ভারতীয় দর্শনের মতো ন্যায় দর্শনও একটি মোক্ষশাস্ত্র। এই দর্শন সম্প্রদায়ের কাছে পরম অভিলোষিত বিষয় হল মোক্ষ বা মুক্তি। মুক্তি বলতে নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ও বোঝেন দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকে। দুঃখের এই আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায় নির্দেশিত হয়েছে অক্ষপাদ দর্শনে। ঐ মুক্তি বা নিঃশ্রেয়সের অধিগম কীভাবে হবে তা নির্দেশ করতে গিয়ে ন্যায়সূত্রকার বলেছেন – "প্রমাণপ্রমেয়সংশয়প্রয়োজনদৃষ্টান্তসিদ্ধান্তাবয়বতর্কনির্ণয়বাদজল্প-বিতণ্ডাহেত্বাভাসচ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানানাংতত্ত্বজ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ"[১] অর্থাৎ প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত, সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি, নিগ্রহস্থান, এই ষোড়শ তত্ত্বের জ্ঞান হতে নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি হয়। এই ষোড়শ তত্ত্বের প্রথম ও প্রধান হল প্রমাণ; যেহেতু এই প্রমাণের দ্বারাই প্রমেয়াদি বিষয়ের তত্ত্বজ্ঞান হয়ে

[১] *ন্যায়সূত্র*, ১/১/১।

থাকে। তাই ন্যায় দর্শনে প্রমাণই প্রথম ও প্রধান পদার্থ। তবে প্রমাণের দ্বারা উৎপন্ন তত্ত্বজ্ঞান সাক্ষাৎভাবে মুক্তিজনক হয় না। প্রমাণ জন্য তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা প্রথমে মিথ্যাজ্ঞান দূরীভূত হয়, মিথ্যাজ্ঞান দূরীভূত হলে রাগাদি দোষ দূর হয়, দোষ নিরাকৃত হলে প্রবৃত্তির নিরোধ হয় আর প্রবৃত্তি না থাকলে কর্ম তথা ফল ভোগের জন্য জন্মগ্রহণ করতে হয় না। জন্মের অপায় হলে দুঃখেরও অপায় হয়। দুঃখের এই আত্যন্তিক নিবৃত্তি হল অপবর্গ। প্রমাণের দ্বারা প্রমেয় বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান ব্যতিরেকে এই অপবর্গ লাভ সম্ভব হয় না। কাজেই অপবর্গ বা নিঃশ্রেয়স লাভে প্রমাণের গুরুত্ব সমধিক।

তবে প্রমাণ শুধু নিঃশ্রেয়সের হেতু নয় তা অভ্যুদয়েরও কারণ। প্রমাণ ছাড়া বস্তুর সিদ্ধি হয় না। বস্তুসিদ্ধি তথা প্রতিপত্তি ব্যতীত ঈপ্সা (লাভের ইচ্ছা) বা জিহাসা (ত্যাগের ইচ্ছা) দেখা দেয় না। আর ঈপ্সা, জিহাসা ছাড়া প্রবৃত্তি তথা ফললাভ সুদূর পরাহত হয়। প্রমাণের দ্বারা প্রমেয় বিষয়ের প্রমিতি বা প্রমাত্ব জ্ঞান লাভের অনন্তরই প্রমাতা বস্তুর অভিপ্সা বা জিহাসা বশত বস্তু লাভে বা ত্যাগে প্রবৃত্ত ও সমর্থ হন। সুতরাং প্রমাণ একাধারে নিঃশ্রেয়স ও অভ্যুদয়ের হেতু।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে শুধু মোক্ষ শাস্ত্র হিসাবেই ন্যায় দর্শনে প্রমাণের আলোচনা প্রসক্ত হয় না। কেননা মোক্ষের পথ বিভিন্ন অধ্যাত্মশাস্ত্রেও নির্দেশিত হয়েছে। ওই সকল আধ্যাত্মশাস্ত্র হতে ন্যায়শাস্ত্রের একটি বৈলক্ষণ্য রয়েছে। ন্যায় মূলত বিচার শাস্ত্র। এই বিচারের প্রয়োজন কেবল নিঃশ্রেয়সের কারণে নয় অভ্যুদয় লাভের ক্ষেত্রেও এই বিচারের গুরুত্ব রয়েছে। এই উপলব্ধি থেকেই প্রাচীন কাল হতে অষ্টাদশ বিদ্যার অন্যতম হিসাবে ন্যায়শাস্ত্রের স্বীকৃতি। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই ন্যায়বিদ্যাকে বাকোবাক্য বলে অভিহিত করা

হয়েছে। ছান্দোগ্য শ্রুতিতে সনৎকুমারের সঙ্গে কথোপকথন কালে নারদ যেসব বিদ্যা তাঁর অধিগত হয়েছে তাদের তালিকা পেশ করতে গিয়ে বাকোবাক্যের কথা বলেছেন। মহাভারতের সভাপর্বে পঞ্চাবয়বী ন্যায়ের ব্যুৎপন্ন বলে নারদের প্রশস্তি করা হয়েছে। মহাভারতের শান্তিপর্বে ধর্ম রক্ষার উপায় হিসাবে ত্রয়ী, বার্তা ও দণ্ডনীতির সঙ্গে সঙ্গে আন্বীক্ষিকীর কথা বলা হয়েছে। মনু কথিত চতুর্থী বিদ্যার মধ্যেও আন্বীক্ষিকীর উল্লেখ রয়েছে। গীতাতেও বলা হয়েছে যে এই চতুর্বিধ শাস্ত্র ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট। বিষ্ণুপুরাণে চতুর্দশ বিদ্যার অন্যতম হিসাবে 'ন্যায়বিস্তর'-এর কথা বলা হয়েছে। কাত্যায়নী সংহিতায় একথা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে যে বাকোবাক্য ইতিহাস ও পুরাণকে আয়ত্ত করার পরেই কোনো ব্যক্তি তর্পণের অধিকারী হতে পারে। গৌতম সংহিতায় দাবি করা হয়েছে যে একজন ব্যক্তিকে জ্ঞানী হিসাবে সমাদর লাভ করতে গেলে তাকে বেদ, বেদাঙ্গ অধিগত করার পাশাপাশি বাকোবাক্য, পুরাণ ও ইতিহাস অধ্যয়ন করতে হবে। এই সমস্ত স্মৃতি, শ্রুতি ও পুরাণে যে বিদ্যাকে বাকোবাক্য, ন্যায়বিস্তর বা আন্বীক্ষিকী বলে অভিহিত করা হয়েছে তা আসলে ন্যায়বিদ্যা। আর এই ন্যায়ের ক্ষেত্রে প্রমাণের গুরুত্ব যে অপরিসীম তা বাৎস্যায়ন প্রদত্ত ন্যায়ের পরিচয় থেকেই স্পষ্ট। ন্যায়সূত্র ভাষ্যে বাৎস্যায়ন বলেছেন ''প্রমাণৈরর্থপরীক্ষণং ন্যায়ঃ''।[২] বাৎস্যায়ন এই ভাষ্য হতেই স্পষ্ট যে, ন্যায় হল প্রমাণের দ্বারা অর্থের পরীক্ষা। বিচার, পরীক্ষা, অন্বীক্ষা এই শব্দগুলি প্রায় সমার্থক। 'অনু' ও 'ঈক্ষা' এই দুই শব্দ যোগে অন্বীক্ষা শব্দটি উৎপন্ন। যার অর্থ পশ্চাৎবর্তী জ্ঞান। প্রত্যক্ষ ও আগমের অবিরোধী যে পদার্থ, প্রমাণের দ্বারা তার জ্ঞানলাভই 'অন্বীক্ষা'। আর এই অন্বীক্ষার উপরে ন্যায়শাস্ত্র গুরুত্ব দেয় বলে এর অন্য নাম 'আন্বীক্ষিকী'। অন্বীক্ষা

[২] শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুর, *ন্যায়দর্শনম্*, ২০১৪, পৃষ্ঠা- ৩।

ও ন্যায় প্রায় একই অর্থের বাচক। "নিয়তে প্রাপ্যতে বিবক্ষিতার্থসিদ্ধিরনেন"[৩] অর্থাৎ যার দ্বারা বাদীর বিবক্ষিত অর্থের সিদ্ধি হয় এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'নি' পূর্বক 'ইন' ধাতুর উত্তর করণ বাচ্যে 'ঘঞ' প্রত্যয় যোগে 'ন্যায়' শব্দটি উৎপন্ন। এই অর্থে ন্যায়, পরীক্ষা, অন্বীক্ষা একই বিষয়কে সূচিত করে।

সুতরাং দেখা যাছে ন্যায়শাস্ত্রে যে তত্ত্ব নির্ণয় বা বিচার গুরুত্ব পায় তা মূলত প্রমাণমূলক। বিচারের অঙ্গ হল পঞ্চাবয়ব বাক্য। এই পঞ্চাবয়ব বাক্যগুলি কোনো না কোনো প্রমাণের উপর নির্ভর যে কারণে তাদের পরমন্যায় বলে অভিহিত করা হয়।[৪] সুতরাং বিচার মাত্রই প্রমাণমূলক। বিচার বা কথার যে ত্রিবিধ রূপ ন্যায় শাস্ত্রে স্বীকৃত তন্মধ্যে বাদ সম্পূর্ণত প্রমাণ ও তর্ক নির্ভর। মধ্যস্থহীন 'বাদ' বিচারে গুরু ও শিষ্যের পঞ্চাবয়ব প্রয়োগ ব্যতীতও প্রমাণ দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় হয়।[৫] জল্প ও বিতণ্ডা রূপ অবশিষ্ট যে দুই প্রকার কথা প্রচলিত সেগুলিতে ছল ও জাতির ব্যবহার অনুমোদিত হলেও তারা প্রমাণ নিরপেক্ষ নয়। তাই এক হিসাবে ন্যায় শাস্ত্র প্রমাণ শাস্ত্রই। আর ষোড়শ তত্ত্বের মধ্যে সর্বাগ্রে প্রমাণের স্বীকৃতি ন্যায় দর্শনে প্রমাণের এই গুরত্বকেই ইঙ্গিত করে।

ন্যায়সম্মত ষোড়শ তত্ত্বে প্রমাণ অগ্রগণ্য হলেও সেই প্রমাণের কোনো লক্ষণ ন্যায়সূত্রে প্রদত্ত হয়নি। উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা এই ক্রমে পদার্থের আলোচনায় ন্যায় পরম্পরা। তাই আপাত দৃষ্টিতে উদ্দেশের অনন্তর প্রমাণের কোনোরূপ লক্ষণ প্রদত্ত না হওয়া অসঙ্গতিপূর্ণ

---

[৩] ফণীভূষণতর্কবাগীশ, *ন্যায়দর্শন,* ২০১৮, পৃষ্ঠা- ৩১।

[৪] "সোহয়ংপরমোন্যায়ইতি", শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুর, *ন্যায়দর্শনম্,* ২০১৪, পৃষ্ঠা- ৪।

[৫] "প্রমাণতর্কসাধনোপালম্ভঃ সিদ্ধান্তাবিরুদ্ধঃ পঞ্চাবয়বোপপন্নঃ পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহো বাদঃ", *ন্যায়সূত্র-* ১/২/৪২।

মনে হতে পারে। কিন্তু এই অসঙ্গতির আশঙ্কা অমূলক। কারণ 'প্রমাণ' শব্দটিই তার লক্ষণের বাচক হতে পারে। 'প্রমাণ' এই সমস্ত পদটির দুইপ্রকার ব্যুৎপত্তি হতে পারে। 'প্রমিয়তে অনেন ইতি' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'প্রমাণ' শব্দটি প্রমার করণকে বোঝায়। আর 'প্রমীয়তে যৎ তৎ' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে প্রমাণ শব্দটি প্রমা জ্ঞানকে বোঝায়।

বৈতণ্ডিক ভিন্ন সকল ভারতীয় সম্প্রদায় প্রমাণবাদী। তবে সেই প্রমাণের স্বরূপ ও সংখ্যা বিষয়ে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য আছে। চার্বাক প্রত্যক্ষৈকমাত্র প্রমাণবাদী, প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণের এই দ্বৈবিধ্য স্বীকৃত হয়েছে বৌদ্ধ ও বৈশেষিক দর্শনে। জৈন ও সাংখ্য সম্প্রদায়ের অতিরিক্ত প্রমাণ হিসাবে আগম বা শব্দকেও মানেন। এইভাবে উপমান, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, ঐতিহ্য, সম্ভব, চেষ্টা, প্রতিভা প্রভৃতি ভেদে নানা প্রমাণ স্বীকৃত হয়েছে প্রাচীন থেকে নবীন, দার্শনিক থেকে বৈয়াকরণ নানা চিন্তাবিদের দ্বারা। ভারতীয় ঐতিহ্যে ন্যায় দার্শনিকদের পরিচয় প্রমাণ চতুষ্টয়বাদী হিসাবে। প্রমাণ সংখ্যা যে প্রত্যক্ষাদি চতুষ্টয়ের অধিক ন্যূন নয় তা স্পষ্ট করে দিয়ে সূত্রকার বলেছেন – ''প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি''।[৬] প্রমাণ মধ্যে প্রত্যক্ষই জ্যেষ্ঠ, অপরাপর প্রমাণগুলি প্রত্যক্ষ ঘটিত। পক্ষান্তরে, প্রত্যক্ষ অনুমানাদি প্রমাণ সাপেক্ষ নয়। এই হিসাবে প্রমাণ বিন্যাসে প্রত্যক্ষই প্রথমে আসে। কিন্তু যৌক্তিক বিচারে অনুমান প্রমাণ সকলের মধ্যে অগ্রগণ্য। কি প্রত্যক্ষ, কি উপমান, কি শব্দ যে কোনো প্রমাণলব্ধ জ্ঞানের সংশয় উপস্থিত হলে অনুমানের দ্বারাই তার নিষ্পত্তি হয়। তাছাড়া জ্ঞানের প্রামাণ্য বিচারের ক্ষেত্রে – প্রত্যক্ষ, অনুমিতি, উপমিতি, শাব্দ যাই হোক না কেন অনুমানেরই শরণাপন্ন হতে হয়।

---

[৬] *ন্যায়সূত্র*, ১/১/৩।

এই অনুমান যে শুধু নৈয়ায়িক বা শাস্ত্রবিদদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তা নয়, সাধারণ্যেও অনুমানের গুরুত্ব সমধিক। লৌকিক জ্ঞান বহুলাংশেই অনুমানমূলক। প্রত্যক্ষ স্থান বিশেষে ও কাল বিশেষে সীমাবদ্ধ। অতীত, অনাগত ও দূরবর্তী বিষয়ে মূলত অনুমানেরই শরণ নিতে হয় আমাদের। শব্দজ্ঞান ও লোকশ্রুতি প্রামাণ্য বিচারের অপেক্ষা রাখে। এই বিচারও অনুমান নির্ভর। তাছাড়া বেদ বা শাস্ত্র বিষয়ে অধিকার সাধারণের নেই। তাই লোক ব্যবহার মূলত অনুমানকে অবলম্বন করেই সম্পন্ন হয়। এহেন অনুমানের গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। এই নিশ্চয় আবার ব্যাপ্তি নিশ্চয়ের উপর নির্ভর। কারণ অনুমান হল জ্ঞাত বিষয়ের সাহায্যে অজ্ঞাতের, দৃষ্ট বিষয়কে অবলম্বন করে অ-দৃষ্টের জ্ঞান। দৃষ্ট থেকে অ-দৃষ্টে উপনীত হওয়ার এই প্রক্রিয়া সার্থক হতে পারে না লিঙ্গ ও লিঙ্গীর অর্থাৎ চিহ্ন ও চিহ্নিতের একটি সার্বিক সম্বন্ধের জ্ঞান ছাড়া। লিঙ্গ-লিঙ্গীর এই সম্বন্ধ আচার্য ভেদে ও সম্প্রদায় ভেদে নানা নাম পেলেও ন্যায় দর্শনে মূলত ব্যাপ্তি নামেই সম্বন্ধটিকে অভিহিত করা হয়।

এই অনুমান তথা ব্যাপ্তির আলোচনা তার নিরতিশয় রূপ লাভ করেছে নব্য নৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের তত্ত্বচিন্তামণির অনুমান খণ্ডে। বর্তমান গবেষণার মুখ্য অভিমুখ গঙ্গেশকৃত তত্ত্বচিন্তামণির অন্তর্গত ব্যাপ্তি বিষয়ক আলোচনা। ন্যায় মত অনুসরণ করে ব্যাপ্তির একটি গ্রহণযোগ্য লক্ষণ সন্ধান করেছেন মণিকার। তাঁর বিচারে যেটি সর্বোৎকৃষ্ট লক্ষণ হতে পারে, তার এক জটিল ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা পেশ করেছেন "সিদ্ধান্তলক্ষণ" শীর্ষক পরিচ্ছেদে। ওই সিদ্ধান্তলক্ষণ উপন্যাসের পূর্বে "ব্যাপ্তিবাদ" নামক পরিচ্ছেদে ব্যাপ্তি বিষয়ে পূর্বপক্ষী প্রদত্ত অনেকগুলি লক্ষণ বিচার করে তাদের অসারতাও প্রদর্শন করেছেন গঙ্গেশ। ওই লক্ষণগুলির ব্যাখ্যা, বিচার এবং তাদের বিরুদ্ধে গঙ্গেশ উত্থাপিত আপত্তি সমূহ পর্যালোচনায় এই

গবেষণাকর্মে স্থান পেয়েছে। ''ব্যাপ্তিবাদ''-এ যে লক্ষণগুলি গঙ্গেশ দ্বারা নিরাকৃত হয়েছে সেগুলির মধ্যে রয়েছে 'অব্যভিচরিতত্ব' পদপ্রতিপাদ্য পঞ্চ ব্যাপ্তিলক্ষণ ও 'সিংহ-ব্যাঘ্র' লক্ষণদ্বয়। এছাড়াও ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবের ধারণাকে মান্যতা দিয়ে সৌন্দড় উপাধ্যায় অব্যভিচাররূপ ব্যাপ্তির লক্ষণগুলিকে সমর্থন করতে গিয়ে যেসব যুক্তির অবতারণা করেছেন, সেই সকল যুক্তির নিরাকরণও স্থান পেয়েছে ওই পরিচ্ছেদে। দীধিতিকার রঘুনাথ 'অব্যভিচার' শব্দটির সৌন্দড়াদি সম্মত নানাবিধ অর্থের কল্পনা করেছেন তাঁর রচনায়। যার ফলস্বরূপ পূর্বপক্ষী সম্মত সপ্তবিধ লক্ষণের অতিরিক্ত চতুর্দশ প্রকার লক্ষণের উদ্ভব হয়েছে। সাকুল্যে ওই একবিংশতি (৭+১৪) লক্ষণের ব্যাখ্যা, বিচার ও মূল্যায়ন বর্তমান গবেষণায় স্থান পাবে।

এই বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে সমগ্র গবেষণা নিবন্ধটিকে নিম্নলিখিত অধ্যায়গুলিতে বিভক্ত করা হয়েছে –

১) অনুমিতিতে ব্যাপ্তিজ্ঞানের ভূমিকা

২) লিঙ্গ-লিঙ্গী সম্বন্ধ বিমর্শ

৩) নব্য ন্যায়ে ব্যাপ্তি

৪) গঙ্গেশ কর্তৃক মীমাংসক সম্মত পঞ্চ ব্যাপ্তিলক্ষণের নিরাকরণ

৫) ব্যাপ্তির সিংহ-ব্যাঘ্র লক্ষণদ্বয় ও তদ্‌বিষয়ে গঙ্গেশের আপত্তি ব্যাখ্যা

৬) ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন অভাব-ঘটিত চতুর্দশ লক্ষণ বিচার

৭) উপসংহার

গবেষণার প্রথম অধ্যায়টির শিরোনাম "অনুমিতিতে ব্যাপ্তির ভূমিকা"। 'শাস্ত্রে নাসঙ্গতং প্রযুঞ্জীতে' অর্থাৎ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা শাস্ত্র অনুমোদন করে না। ব্যাপ্তির আলোচনাও একটি প্রসঙ্গ ও অনুক্রম অনুসারে ঘটে থাকে। প্রমাণের আলোচনা প্রসঙ্গে অনুমানের আলোচনা প্রসক্ত হয়। আর সেই অনুমানের আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যাপ্তির আলোচনা এসে পড়ে। ব্যাপ্তি বিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে অনুমিতির আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যাপ্তির আলোচনা কেন অপরিহার্য তা স্পষ্ট করা প্রয়োজন। অনুমিতির ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি জ্ঞানের ওই ভূমিকাই আলোচিত হয়েছে প্রস্তাবিত গবেষণাপত্রের প্রথম অধ্যায়ে।

গবেষণা নিবন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়টি হল লিঙ্গ-লিঙ্গী সম্বন্ধ বিমর্শ। যে সব ভারতীয় সম্প্রদায় অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন তাঁরা সকলেই (দৃষ্ট যে লিঙ্গকে অবলম্বন করে অ-দৃষ্ট লিঙ্গীর অনুমান হয়ে থাকে সেই) লিঙ্গ-লিঙ্গীর মধ্যে একপ্রকার সার্বত্রিক সম্বন্ধকে মেনে নেন; যে সম্বন্ধের স্বীকৃতি ছাড়া দৃষ্ট থেকে অ-দৃষ্টের অনুমান স্বার্থক হতে পারে না। তবে কিনা লিঙ্গ-লিঙ্গীর ওই সম্বন্ধের লক্ষণ ও স্বরূপ নিরূপণ করতে গিয়ে তাঁরা একমত হতে পারেননি। সম্বন্ধটির নামকরণ করতে গিয়েই বহু বিচিত্র পরিভাষা ব্যবহার করেছেন তাঁরা। সুতরাং ওই লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধটির স্বরূপ ও লক্ষণ নিরূপণের ক্ষেত্রে তাঁরা যে মতৈক্যে উপনীত হতে পারবেন না তা একান্তই প্রত্যাশিত। সম্প্রদায় ভেদে লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধ বিষয়ে যেসব বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয় সেই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গিগুলিকে উপস্থাপন করা বর্তমান অধ্যায়ের লক্ষ্য। আর সেকারণেই অধ্যায়টির নাম "লিঙ্গ-লিঙ্গী সম্বন্ধ বিমর্শ" রাখা হয়েছে।

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, যেহেতু লিঙ্গ-লিঙ্গী সম্বন্ধ বিষয়ে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের বক্তব্য বিশ্লেষণ এই গবেষণার মুখ্য উদ্দেশ্য, তাই লিঙ্গ-লিঙ্গী সম্বন্ধ বিষয়ে নব্য ন্যায়ের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যতীত অপরাপর সকল দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা অধ্যায়টিতে স্থান পেয়েছে। প্রথমে ন্যায়-বৈশেষিক ভিন্ন জৈনাদি সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। পরে প্রাচীন ন্যায় ও বৈশেষিক সম্প্রদায় যেভাবে লিঙ্গ-লিঙ্গী সম্বন্ধকে দেখেছেন তারও একটি রূপরেখা পেশ করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

ব্যাপ্তির আলোচনা সর্বাধিক উৎকর্ষ লাভ করেছে নব্যন্যায়ের গ্রন্থগুলিতে। যদিও পরম্পরাগত ভাবে প্রাচীন থেকে নব্য সব আচার্যই ব্যাপ্তি বিষয়ে একটি অভিন্ন চিন্তাধারা বহন করেন, তথাপি ব্যাপ্তির লক্ষণ নিরূপণে নব্য ন্যায়ে এত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার ও পরিভাষা ব্যবহারের এত জটিল রীতি অনুসৃত হয়েছে, যা পূর্বাচার্যদের রচনায় পরিলক্ষিত হয়নি। এই নব্যন্যায়ের শৈশব উদয়নের রচনায় অতিবাহিত হলেও তা যৌবনের দীপ্তি লাভ করে গঙ্গেশ উপাধ্যায় কৃত "তত্ত্বচিন্তামণিতে"। ওই গ্রন্থে অনুমানচিন্তামণি খণ্ডে "ব্যাপ্তিবাদ" প্রকরণে ব্যাপ্তি বিষয়ে পূর্বপক্ষীর মত নিরাশের অনন্তর গঙ্গেশ তাঁর স্বকৃত লক্ষণটি উপস্থাপন করেছেন সিদ্ধান্তলক্ষণ পরিচ্ছেদে। এই দুরূহ লক্ষণের ব্যাখ্যা সহজ নয়; তথাপি মণিকারকৃত ওই সিদ্ধান্ত লক্ষণটি অধিগত করার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস হয়েছে গবেষণাকর্মের তৃতীয় অধ্যায়ে। ওই সিদ্ধান্ত লক্ষণের বিচারের অনন্তর বিশ্বনাথ, অন্নংভট্ট প্রমুখ নবীনতর আচার্যদের ব্যাপ্তি লক্ষণও এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে। তাই অধ্যায়টির শিরোনাম রাখা হয়েছে "গঙ্গেশ ও নব্যগণের দৃষ্টিতে ব্যাপ্তি"।

স্বমত প্রতিষ্ঠা সর্বত্র পরমত খণ্ডনের দাবি রাখে। বিপক্ষ বাঁধন ছাড়া স্বপক্ষ সাধন হয় না। এই বিবেচনা থেকে ব্যাপ্তির সিদ্ধান্ত লক্ষণ প্রদানের পূর্বে মণিকার তাঁর ব্যাপ্তিবাদে ব্যাপ্তি বিষয়ে প্রতিপক্ষ যে সকল বিকল্প লক্ষণ পূর্বপক্ষী পেশ করেন সেগুলি নিরাশে প্রবৃত্ত হন। তবে লিঙ্গ-লিঙ্গী সম্বন্ধ বিষয়ে যে বহুবিধ লক্ষণ ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রচলিত তাদের সবগুলির আলোচনা বা বিচার তাঁর ব্যাপ্তিবাদে স্থান পায়নি। "অনৌপাধিক সম্বন্ধ", "কাৎর্স্নেন সম্বন্ধ", "স্বাভাবিক সম্বন্ধ", "অবিনাভাব সম্বন্ধ", "সম্বন্ধমাত্র" ইত্যাদি কিছু চিরাচরিত ব্যাপ্তি লক্ষণ বিষয়ে মণিকার তাঁর অনাস্থা জ্ঞাপন করলেও সেসব বিষয়ে বিস্তৃত বিচার বা ব্যাখ্যায় অগ্রসর হননি। বরং পূর্বপক্ষী প্রদত্ত যে সকল লক্ষণ ব্যাপ্তির অত্যন্ত গ্রহণযোগ্য হিসাবে প্রতীয়মান হয় তেমন কিছু লক্ষণ ব্যাখ্যা ও নিরাশ গুরুত্ব লাভ করেছে মণিকারের রচনায়। ওই নিরাকৃত ব্যাপ্তির লক্ষণগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'অব্যভিচরিতত্ব' পদপ্রতিপাদ্য প্রভাকর সম্মত ব্যাপ্তির পাঁচটি লক্ষণ। ওই লক্ষণগুলির বিচার ও খণ্ডন স্থান পেয়েছে এই গবেষণা নিবন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে।

নিবন্ধের পঞ্চম অধ্যায়টি হল "ব্যাপ্তির সিংহ-ব্যাঘ্র লক্ষণ বিষয়ে গঙ্গেশের আপত্তি"। ইতিপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে যে গঙ্গেশ তাঁর রচনায় নির্বাচিত কিছু ব্যাপ্তি লক্ষণ পরিহারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। ওই লক্ষণগুলির মধ্যে যেমন মীমাংসা প্রভৃতি সম্প্রদায় প্রদত্ত লক্ষণ রয়েছে তেমনই এমন কিছু লক্ষণও রয়েছে যেগুলি কোনো কোনো নৈয়ায়িক পূর্বাচার্য দ্বারা প্রদত্ত। এমনই দুটি লক্ষণ হল – ১) সাধ্যাসামানাধিকরণ্যানধিকরণত্বম্, ২) সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যানধিকরণত্বম্। লব্ধ তথ্যপ্রমাণ অনুসারে ওই লক্ষণ দুটি মিথিলার দুই নৈয়ায়িক শশধর ও মণিধরের। প্রবল পরাক্রমশালী বিদ্বান এই দুই নৈয়ায়িক যথাক্রমে 'সিংহ-ব্যাঘ্র' নামে আখ্যায়িত হতেন। তাই

তাদের লক্ষণগুলি ‘সিংহলক্ষণ’ ও ‘ব্যাঘ্রলক্ষণ’ নামে পরিচিতি পায়। এই দুই লক্ষণের ব্যাখ্যা ও বিচার আলোচ্য অধ্যায়ের মুখ্য উপজীব্য।

‘অব্যভিচরিতত্ব’ হিসাবে পরিগণিত ব্যাপ্তির পঞ্চবিধ লক্ষণ এবং ‘সিংহ-ব্যাঘ্র’ লক্ষণদ্বয়ের বিরুদ্ধে গঙ্গেশ একটি সাধারণ আপত্তি পেশ করেন। আপত্তিটি এই যে, কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতির ক্ষেত্রে - যেখানে সাধ্যাভাবাধিকরণ, সাধ্যাসামানাধিকরণ কিংবা সাধ্যবৎপ্রতিযোগিক ভেদের অধিকরণ সিদ্ধ নয়, সেখানে ওই ব্যাপ্তির লক্ষণগুলি অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয়। এরূপ আপত্তির মোকাবিলায় সৌন্দড় উপাধ্যায় একপ্রকার অভাবের কল্পনা পেষ করেন। ওই অভাবটি পণ্ডিতকুলে পরিচিত ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব হিসাবে। সৌন্দড়ের দাবি, ওইরূপ অভাবের সম্ভাবনা স্বীকার করলে কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতির ক্ষেত্রে সাধ্যাভাবাধিকরণ আর অপ্রসিদ্ধ হয় না; ফলে সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্ ইত্যাদি পঞ্চ লক্ষণের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অব্যাপ্তির আপত্তিও অবশ্যম্ভাবী হয় না। বিষয়টিকে স্পষ্ট করতে গিয়ে দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণি সৌন্দড় সম্মত ব্যাপ্তির দুটি লক্ষণের অবতারণা করেন যেগুলি ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন অভাবের ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। সৌন্দড় পণ্ডিতকে অনুসরণ করে ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবের ধারণাকে মান্যতা দিয়ে রঘুনাথ যেমন দুটি লক্ষণের বিস্তার ঘটিয়েছেন তেমনই পরবর্তী আচার্যদের অনেকেই ব্যাপ্তির বিকল্প লক্ষণ পেষ করেছেন। ওই বিকল্প লক্ষণগুলির মধ্যে চক্রবর্ত্তী, প্রগল্‌ভাচার্য, সার্ব্বভৌম ও মিশ্র প্রদত্ত তিনটি করে লক্ষণ রয়েছে। সর্বমোট ওই চতুর্দশ লক্ষণের উল্লেখ বা বিচার অনুমানচিন্তামণিতে দৃষ্ট হয়না। তবে দীধিতিকার রঘুনাথ তাঁর রচনায় এই চতুর্দশ লক্ষণের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। তিনি দেখান যে যুক্তিতে মণিকার গঙ্গেশ সৌন্দড় কল্পিত

ওই ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন অভাবের ধারণাকে খণ্ডন করেন তা গ্রহণ করলে ওই চতুর্দশ লক্ষণের কোনোটিই আর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। দীধিতি গ্রন্থে উল্লিখিত ওই চতুর্দশ লক্ষণ বিচার এবং নিরাশ স্থান পেয়েছে এই ষষ্ঠ অধ্যায়ে।

অন্তিম অধ্যায়টি এই গবেষণা নিবন্ধের উপসংহার। এই উপসংহার অংশে মূলত যে সকল যুক্তিতে গঙ্গেশ উপাধ্যায় পূর্বপক্ষী প্রদত্ত ব্যাপ্তির লক্ষণ সমূহ নিরাকরণ করেছেন সেইসব যুক্তির সারবত্তা খতিয়ে দেখা হয়েছে। উল্লেখ্য যে গঙ্গেশ 'অব্যভিচরি্তত্ব' পদপ্রতিপাদ্য পঞ্চ লক্ষণ ও 'সিংহ-ব্যাঘ্র' লক্ষণদ্বয়ের বিরুদ্ধে একটি সাধারণ আপত্তি করেন। আপত্তিটি হল, কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতিস্থলে ওই লক্ষণগুলির সমন্বয় হয় না। এখন প্রশ্ন হল কেবলান্বয়ীসাধ্যক যে অনুমিতির কথা মণিকার উত্থাপন করেছেন তা কী বৈধ অনুমিতি? এবিষয়ে সংশয়ের যথেষ্ট অবকাশ আছে; কেননা গঙ্গেশ পরবর্তী নব্যদের অনেকে ওই ধরণের অনুমিতির ক্ষেত্রে অনুপসংহারী হেত্বাভাসের সম্ভাবনা মেনে নিয়েছেন। এমতাবস্থায় অসদ্ধেতুক অনুমিতিতে কোনো ব্যাপ্তি লক্ষণের সমন্বয় হয় না বলে আপত্তি তোলা কতখানি সঙ্গত সে প্রশ্ন থেকে যায়। এই আপত্তি যদি যথার্থ না হয় তাহলে গঙ্গেশ কর্তৃক ওই সপ্তবিধ লক্ষণের খণ্ডন এবং বিকল্প হিসাবে সিদ্ধান্তলক্ষণ গঠন দুই-ই নিরর্থক হয়ে দাঁড়ায়। এই উভয় সংকটের সম্যক্ পরিচয় যেমন এই অন্তিম অধ্যায়ে দেওয়া হয়েছে, সেই সঙ্গে সংকটটির সম্ভাব্য সমাধানও সন্ধান করা হয়েছে এই উপসংহার অংশে।

এই গবেষণা প্রসঙ্গে একটি জিজ্ঞাসা স্বাভাবিকভাবেই দেখা দেবে – কি কারণে এমন একটি বিষয়কে গবেষক নির্বাচন করলেন বা এই গবেষণাকর্মের সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের যোগসূত্র কোথায়? মানব সভ্যতা একবিংশ শতকে পদার্পণ করেছে। জ্ঞান বিজ্ঞানের নব নব

ক্ষেত্র উন্মোচিত হয়ে চলেছে প্রতিনিয়ত। প্রযুক্তির উন্নতি ঘটিয়ে যাপিত জীবনকে সহজ ও সমৃদ্ধ করে তুলতে বিজ্ঞানীকুল এখন তৎপর। প্রাযুক্তিক উন্নতির এই মহাযজ্ঞে যখন প্রায় সকলেই সামিল তখন অনুমানের অঙ্গ হিসাবে ব্যাপ্তির আলোচনা বা তার উপর গবেষণাকর্ম একান্ত জীবনবিমুখ অনাকর্ষণীয় একটি চর্চা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। অথচ সামান্য বিবেচনা করে দেখলে ধরা পড়ে যে এই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পথটি আসলে অনুমানের পথ। লৌকিক জীবনযাত্রা থেকে শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্ত, বৈজ্ঞানিক কৃতকৌশল আবিষ্কার থেকে নিত্যনতুন প্রযুক্তির সন্ধান যে পথে পরিচালিত হয় সেটা প্রায় ক্ষেত্রেই অনুমান নির্ভর। বস্তুত মানব জ্ঞানরাজ্যের অধিকাংশটাই দখল করে আছে অনুমান। প্রত্যক্ষ বা নিরীক্ষণের মাধ্যমে যা লব্ধ হয় তার শ্রেষ্ঠত্ব সর্বসম্মত; কিন্তু প্রকৃতির গূঢ় রহস্য অনুসন্ধানে সেই প্রত্যক্ষলব্ধ তথ্য একান্তই অপ্রতুল। প্রকৃতি-রহস্যের অবগুণ্ঠন উন্মোচনের অন্যতম চাবিকাঠি যে অনুমান তা আমাদের মেনে নিতেই হয়। এই অনুমান নির্ভর করে প্রকৃতির রাজ্যে অব্যাহত কিছু সার্বত্রিক নিয়মের জ্ঞানের উপর। এই সার্বত্রিক নিয়মই হল ব্যাপ্তি। অদৈশিক, অকালিক এই নিয়ম বা ব্যাপ্তিকে অবলম্বন করেই দৈশিক, কালিক ঘটনাগুলি সম্পন্ন হয়। তাই বিজ্ঞানীকুল সতত নিয়োজিত থাকেন ওই সার্বিক নিয়মগুলির সন্ধানে। এই সার্বিক, প্রাকৃতিক নিয়মগুলির জ্ঞান তাঁদের প্রশয় দেয় ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্বন্ধে সফল পূর্বাভাস করতে এবং সেইসঙ্গে ভাবী পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি নিতে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ব্যবহারিক জীবনযাত্রা থেকে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সকলই অনুমান তথা তার ঘটক ব্যাপ্তিজ্ঞানের অপেক্ষা রাখে। কাজেই সেই ব্যাপ্তিকে বিষয় হিসাবে নির্বাচন করে গবেষণাকর্মে অগ্রসর হওয়া জীবনবিমুখ চর্চা বলে গবেষকের কাছে বিবেচিত হয়নি।

প্রথম অধ্যায়

অনুমিতিতে ব্যাপ্তিজ্ঞানের ভূমিকা

যে সম্বন্ধকে অবলম্বন করে দৃষ্ট হেতু থেকে অ-দৃষ্ট সাধ্যের অনুমান সম্ভবপর হয় সেই লিঙ্গ-লিঙ্গী সম্বন্ধ এই গবেষণার মুখ্য উপজীব্য। এই লিঙ্গ-লিঙ্গী সম্বন্ধ প্রায়শই অভিহিত হয় ব্যাপ্তি নামে। ব্যাপ্তি অনুমানের যৌক্তিক ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত হয়। একটি অনুমান প্রক্রিয়ার সাফল্য প্রধানত এই ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপরেই নির্ভর। ঠিক কী কারণে অনুমান প্রক্রিয়ায় ব্যাপ্তিজ্ঞানের ভূমিকা এতখানি গুরুত্বপূর্ণ বা অনুমিতির অলোচনায় ব্যাপ্তির আলোচনা কেন প্রাসঙ্গিক তা স্পষ্ট করা হবে এই অধ্যায়ে। অনুমিতি প্রক্রিয়ায় ব্যাপ্তিজ্ঞান ও ব্যাপ্তিনিশ্চয় কেন প্রয়োজন তা বুঝে নিতে গেলে অনুমিতি বলতে ঠিক কী বোঝায় এবং কীভাবে অনুমিতি প্রক্রিয়া অগ্রসর হয় সেই সম্বন্ধে সম্যক্ উপলব্ধি থাকা দরকার।

১.১ অনুমান পরিচয়

'অনুমান' শব্দ 'অনু' উপসর্গ পূর্বক 'মা' ধাতু হতে ভাব অর্থে অথবা করণ অর্থে ল্যুট প্রত্যয় যোগে দুই প্রকার অর্থ প্রকাশ করে। প্রথম অর্থে, 'অনুমিয়তে ইতি অনুমানম্' অথবা 'অনুমিতিঃ অনুমানম' এই ব্যুৎপত্তিতে এর অর্থ হল অনুমিতি রূপ প্রমা। দ্বিতীয় অর্থে 'অনুমীয়তেহনেন ইতি অনুমানম্' এরূপ ব্যুৎপত্তিতে অনুমান পদটি অনুমিতির করণকে বোঝায় অর্থাৎ অনুমিতিরূপ সাধন হচ্ছে অনুমান।

সাধারণত সকল দার্শনিক-ই অনুমিতির করণকে অনুমান বলে স্বীকার করেন। 'অনু' এবং 'মান' এই দুই পদের দ্বারা অনুমান শব্দ সিদ্ধ হওয়ায় 'অনু' পদ 'পশ্চাদ্' অর্থের বোধক এবং 'পশ্চাদ্' পদ হচ্ছে নিয়মিত প্রতিযোগী সাকাঙ্খ। এই পশ্চাদ্ অর্থে লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধ

এবং লিঙ্গজ্ঞান - এই দুইয়েরই প্রতিযোগীরূপে অনুমিতি হয়। 'মান' হচ্ছে জ্ঞানের পরিচায়ক। লিঙ্গ ও লিঙ্গীর এই সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি, অবিনাভাব প্রভৃতি শব্দের দ্বারাও বোঝানো হয়। কাজেই পশ্চাদ্ জ্ঞানকে অনুমান বলে। লিঙ্গের জ্ঞান হলে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধ স্মরণের পর পর্বত প্রভৃতি ধর্মীতে পরোক্ষ বিষয়কে অবলম্বন করে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে অনুমিতি এবং তার করণকে অনুমান বলে। এখানে উল্লেখ করা অসঙ্গত হবে না যে, বৌদ্ধ দার্শনিক ধর্মোত্তরের মতে 'অনুগতং মানং' (=জ্ঞানম) এই বিগ্রহে গতি সমাসে অনুমান শব্দটি নিষ্পন্ন। অব্যয়ীভাব সমাস সমীচীন নয়। অব্যয়ী সমাস স্বীকার করলে মানস্য পশ্চাদ্ এই বিগ্রহ হলে অভীষ্ট অর্থ পাওয়া যাবে না। বৌদ্ধ ন্যায়ে লিঙ্গ দর্শনের এবং সম্বন্ধ স্মরণের পশ্চাদ্ যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই জ্ঞানের বিষয়ের সাথে সারূপ্য (=মান) হলে সেই সারূপ্যকে অনুমান বলে। এ বিষয়ে ধর্মোত্তর টীকায় বলা হয়েছে – "লিঙ্গগ্রহণসম্বন্ধস্মরণস্য পশ্চাৎ মানম্ অনুমানম্"[১] অর্থাৎ অনুমান হল পশ্চাৎবর্তী জ্ঞান, যেখানে লিঙ্গদর্শন বা লিঙ্গগ্রহণ ও সম্বন্ধস্মরণ – এই দুইয়ের পশ্চাৎ বস্তুর সাদৃশ্য নির্ধারিত হয়। তবে প্রত্যক্ষের মতো ভাবার্থে অনুমান শব্দটি অনুমিতিরূপ অর্থ গ্রহণ করা হলে হান, উপাদান ও উপেক্ষা বুদ্ধি অনুমানের ফল বা কার্য হবে। অনুমান শব্দটির করণবাচ্যে ব্যুৎপত্তি স্বীকার করলে সর্বত্র লৈঙ্গিক বিষয়ের প্রবৃত্তিকে অনুমান প্রমাণের ফল বলা হবে।

[১] সঞ্জিত কুমার সাধুখাঁ, *ন্যায়বিন্দু*, ২০০৭, পৃষ্ঠা- ৩২।

১.১.১ অনুমানের লক্ষণ

ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতম স্পষ্টভাবে এই অনুমানের সংজ্ঞা নির্দেশ না করলেও ন্যায়সূত্রে অনুমানের বিভাগ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন "অথ তৎপূর্ব্বকং ত্রিবিধমনুমানম্"।[২] বাৎস্যায়ন এর ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে 'তৎ' শব্দের দ্বারা লিঙ্গ ও লিঙ্গীর (হেতু ও সাধ্য ধর্ম্মের) সম্বন্ধ দর্শন অর্থাৎ ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ এবং লিঙ্গদর্শন (হেতুর প্রত্যক্ষ) উভয়ই অভিপ্রেত।[৩] ব্যাৎসায়ন উক্ত লক্ষণের অতিরিক্ত অনুমানের অন্য এক পরিভাষা দিয়েছেন যে লিঙ্গের দ্বারা লিঙ্গীরূপ বিষয়ের যে জ্ঞান তাকে অনুমান বলে। বাৎস্যায়ন কৃত অনুমানের উক্ত দুই পরিভাষার সমন্বয় করে জয়ন্তভট্ট বলেন যে ব্যাপ্তি স্মরণের সাথে হেতুজ্ঞান বা জ্ঞানমাত্র হেতুকে অনুমান বলে। অনুমানের পরিভাষায় এটি স্পষ্ট যে অনুমিতি পূর্বকত্ব অনুমানের লক্ষণ হতে পারে। তাই তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশ ব্যাপ্তি বিশিষ্ট যে পক্ষধর্মতা জ্ঞান সেই জ্ঞানজন্য জ্ঞানকে অনুমিতি এবং তার করণকে অনুমান প্রমাণ বলেছেন।[৪] পরবর্তী সকল আচার্য অনুমানের উক্ত লক্ষণের অনুসরণ করেছেন। কেশব মিশ্র লিঙ্গ পরামর্শকে অনুমান বলেছেন।[৫] অন্নংভট্ট পরামর্শ হতে উৎপন্ন জ্ঞানকে অনুমিতি এবং তার করণকে অনুমান বলেছেন।[৬] বৈশেষিক দর্শনে বলা হয়েছে কার্য, কারণ, সংযোগী, বিরোধি এবং সমবায়ী এই

---

[২] *ন্যায়সূত্র*, ১/১/৫।

[৩] "তৎপূর্বকমিত্যনেন লিঙ্গলিঙ্গিনোঃ সম্বন্ধদর্শনং। লিঙ্গদর্শনংচাভিসংবধ্যতে", শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুর, *ন্যায়দর্শনম্*, ২০১৪, পৃষ্ঠা- ২৯১।

[৪] "ব্যাপ্তিবিশিষ্ট-পক্ষধর্মতাজ্ঞানজন্যংজ্ঞানমনুমিতিস্তৎকরণমনুমানং", শ্রীকামাখ্যানাথতর্কবাগীশ, *তত্ত্বচিন্তামণি*, ২০১০, পৃষ্ঠা- ২।

[৫] "লিঙ্গপরামর্শোহনুমানম্", গঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য, *তর্কভাষা*, ২০১৩, পৃষ্ঠা-১৪১।

[৬] "অনুমিতিকরনমনুমানম্।। পরামর্শজন্যংজ্ঞানমনুমিতিঃ", শ্রীপঞ্চাননশাস্ত্রী, *তর্কসংগ্রহ*, ১৩৯২, পৃষ্ঠা-১২২।

পাঁচ প্রকার লিঙ্গকে দেখে যে তৎসম্বন্ধী লিঙ্গীর জ্ঞান হয় তাকে অনুমানপ্রমাণ বলে।[৭] প্রশস্তপাদ বলেন যে, যা অনুমেয়ের সাথে সম্বন্ধবিশিষ্ট; সাধ্যধর্ম যুক্ত সপক্ষে প্রসিদ্ধ এবং সাধ্যধর্মের অভাবে থাকে না তাকে অনুমান প্রমাণ বলে।[৮]

১.২ অনুমিতির ঘটকসমূহ

অনুমানের বিভিন্ন লক্ষণ আলোচনায় এই বিষয়টি স্পষ্ট যে, অনুমানের পূর্বশর্ত দুটি। সেগুলি হল - লিঙ্গ দর্শন এবং লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধ জ্ঞান। প্রথমটি পক্ষধর্মতাজ্ঞান এবং দ্বিতীয়টি ব্যাপ্তিজ্ঞান হিসাবে পরিচিত। যেমন কোনো স্থানে, যখন পর্বতে ধূম দেখে বহ্নির অনুমান করা হয়, তখন সেই অনুমানটি দুটি পূর্ব জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। যথা - (১) পর্বতে ধূমের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও (২) যেখানে ধূম সেখানে বহ্নি- এমন পূর্বার্জিত জ্ঞান। কিন্তু এই দুটি জ্ঞান হলেই ন্যায়মতে পর্বতে বহ্নির অনুমিতি সম্পন্ন হয় না। এই দুই জ্ঞানের অনন্তর বহ্নির ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূমই যে পর্বতে বিদ্যমান সে বিষয়ে একটি নিশ্চয়াত্মক প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানটিকে বলা হয় পরামর্শ। আর এই পরামর্শ জ্ঞানের পরেই পর্বতে যে বহ্নি রয়েছে সেই অনুমিতি জ্ঞান সম্ভব হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে অনুমিতি জ্ঞান তিনটি পূর্ব জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে – পক্ষধর্মতা, ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পরামর্শজ্ঞান। এই জ্ঞানগুলির স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে পক্ষ, সাধ্য ও হেতু এই তিনটির পরিচয় প্রদান প্রয়োজন। অনুমিতির ক্ষেত্রে কোনো অধিকরণে একটি দৃষ্ট

---

[৭] ''অস্যেদং কার্য্যং কারণং সংযোগি বিরোধি সমবায়ি চেতি লৈঙ্গিকম্'', *বৈশেষিকসূত্র*, ৯/২/১।

[৮] ''...লিঙ্গং পুনঃ যদনুমেয়েন সম্বদ্ধং প্রসিদ্ধং চ তদন্বিতে। তদভাবে চ নাস্ত্যেব তল্লিঙ্গমনুমাপকম্'', পণ্ডিত দূর্গাধর ঝা শর্মা, *প্রশস্তপাদভাষ্যম্*, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা- ৪৭৮।

বিষয়কে অবলম্বন করে অ-দৃষ্ট বা অপ্রত্যক্ষ কোনো বিষয়ের উপস্থিতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হয়ে থাকে। যে অধিকরণে অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের অস্তিত্ব অনুমিত হয় তাকে বলে পক্ষ। যে অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের অস্তিত্ব অনুমিত হয় তাকে বলে সাধ্য। অন্যদিকে পক্ষে যে চিহ্নের উপস্থিতি লক্ষ্য করে সাধ্যের অস্তিত্ব অনুমিত হয় তা হেতু হিসাবে গণ্য হয়। নৈয়ায়িকগণ নানা ভাবে এই তিনের লক্ষণ করেছেন। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ পক্ষের লক্ষণ প্রকাশ করে বলেছেন "সন্দিগ্ধসাধ্যবান্ পক্ষঃ"[৯] অর্থাৎ যে ধর্মীতে সাধ্যের সন্দেহ হয়, সেই সন্দিগ্ধ সাধ্যবানই হল পক্ষ। যে অধিকরণে কোনো বিষয়ের উপস্থিতি নিশ্চিত সেই অধিকরণ সেই বিষয়ের অনুমানের পক্ষ হতে পারে না। যে বিষয় অজ্ঞাত বা অনুপলব্ধ তার অনুমানেও কোনো কিছুই পক্ষ হতে পারে না। একমাত্র যে অধিকরণে কোনো বিষয় সন্দিগ্ধ সেই অধিকরণেই সেই অনুমানের বিষয়ের পক্ষ হতে পারে। একথাই ভিন্নভাবে ব্যক্ত হয়েছে ন্যায়সূত্রভাষ্যে – "তত্রনানুপলব্ধে ন নির্ণীতেহর্থে ন্যায়ঃ প্রবর্ত্ততে। কিং তর্হি? সংশয়িতেহর্থে"।[১০]

তবে প্রাচীনসম্মত এই ব্যাখ্যা নব্য নৈয়ায়িকরা স্বীকার করেন না। নব্যরা বলেন যে, সাধ্য সিদ্ধি অর্থাৎ পক্ষে সাধ্যের সিদ্ধি বা নিশ্চিত জ্ঞান থাকলেও, যদি সিষাধয়িষা বা অনুমান করার ইচ্ছা থাকে তাহলেও পক্ষে (পর্বতে) সাধ্যের (বহ্নির) অনুমান সম্ভব হতে পারে। এখানে সিদ্ধি হচ্ছে অনুমিতির প্রতি প্রতিবন্ধক আর সিষাধয়িষা অনুমিতির প্রতি উত্তেজক। প্রতিবন্ধক থাক বা না থাক, যদি উত্তেজক থাকে তাহলেই অনুমান সম্ভব হবে। কাজেই নব্য মতে কোনো অধিকরণে যদি সাধ্যের সংশয় (সিদ্ধির অভাব) থাকে অথবা অনুমানের ইচ্ছা

[৯] শ্রী পঞ্চানন শাস্ত্রী, *তর্কসংগ্রহ*, ১৩৯২, পৃষ্ঠা- ১৪১।

[১০] শ্রীঅনন্তলাল ঠাকুর, *ন্যায়দর্শনম্*, ২০১৪, পৃষ্ঠা- ২।

(সিষাধয়িষা) থাকে, তাহলে সেই অধিকরণ বা পদার্থ পক্ষ পদবাচ্য হবে। অন্নংভট্টের ব্যাখায় যা পক্ষতার আশ্রয় তাই পক্ষ।[১১] আর পক্ষতার পরিচয় দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন- "সিষাধয়িষাবিরহসহকৃতসিদ্ধ্যভাবঃ পক্ষতা"[১২] অর্থাৎ অনুমিতির ইচ্ছার অভাব বিশিষ্ট যে সিদ্ধি, তার অভাবই পক্ষতা। আর উক্ত পক্ষতার আশ্রয়ই হল পক্ষ।

পক্ষে যার উপস্থিতি দর্শন করে সাধ্যের অনুমান হয়ে থাকে তাকে হেতু বা লিঙ্গ বলা হয়। "লীনম্ গময়তি যঃ সঃ লিঙ্গঃ"[১৩] বা যা লীনের সাথে গমন করে এবং লীনের জ্ঞাপক চিহ্ন হয় তাকে লিঙ্গ বলে। যেমন ধূম অগ্নির সঙ্গে গমন করে এবং অগ্নির জ্ঞাপক বা পরিচায়ক চিহ্ন হয় তাই ধূম হল বহ্নির হেতু বা লিঙ্গ। আবার ন্যায়বিন্দুর টীকাকার বলেছেন, "লিঙ্গ্যতে গম্যতেহনেনার্থ ইতি লিঙ্গম্।"[১৪] এই অর্থে লিঙ্গতে মানে গম্যতে অর্থাৎ জানিয়ে দেয় বা জ্ঞাত হয়। যার দ্বারা অর্থটি জ্ঞাত হয় অর্থাৎ যার দ্বারা অর্থটি জানা যায় তাকে লিঙ্গ বলে। যেমন ধূম অপ্রত্যক্ষ আগুনকে জানিয়ে দেয় বলে ধূমকে লিঙ্গ বলা হয়। লিঙ্গ শব্দের প্রতিশব্দ হল 'গমক'।

হেতু বা লিঙ্গ যেমন সৎ হতে পারে তেমনি অসৎও হতে পারে। সৎ হেতুর কতকগুলি লক্ষণ থাকে। আর ওই লক্ষণগুলির কোনো একটি না থাকলে হেতু অসৎ হয়ে পড়ে। অন্বয়ব্যতিরেকী লিঙ্গের ক্ষেত্রে সদহেতুর পাঁচটি ধর্ম স্বীকার করেন নৈয়ায়িকরা। সেগুলি হল–

---

[১১] "পক্ষতাশ্রয়ত্বস্য পক্ষলক্ষণত্বাৎ", শ্রী পঞ্চানন শাস্ত্রী, *তর্কসংগ্রহ*, ১৩৯২, পৃষ্ঠা- ১৪২।

[১২] শ্রী পঞ্চানন শাস্ত্রী, *তর্কসংগ্রহ*, ১৩৯২, পৃষ্ঠা- ১২২।

[১৩] শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, *তর্কসংগ্রহ*, ১৪১৩, পৃষ্ঠা- ৩৬৪।

[১৪] ধর্মকীর্তি, *ন্যায়বিন্দু*, সঞ্জিত কুমার সাধুখাঁ দ্বারা সম্পাদিত, ২০০৭, পৃষ্ঠা- ১৫৪।

পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব, বিপক্ষাসত্ত্ব, অসৎপ্রতিপক্ষত্ত্ব ও অবাধিতত্ত্ব। হেতুর পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব ও বিপক্ষাসত্ত্ব এই তিন ধর্মের কথা বৌদ্ধ গ্রন্থ ন্যায়বিন্দুতেও স্বীকৃত হয়েছে।[১৫]

যা সাধিত হয় বা যা সিদ্ধ হওয়ার যোগ্য তাকে সাধ্য বলা হয়। ব্যবহারিক জীবনে সাধ্য, অসাধ্য কথাগুলি যথাক্রমে কর্মে রূপায়ণ যোগ্য আর কর্মে রূপায়ণের অযোগ্য বস্তু বা কাজকে নির্দেশ করে। অনুমানের প্রেক্ষিতে 'সাধ্য' শব্দটি সেই বস্তু বা ধর্মের বাচক হয় যাকে কোনো অধিকরণে সিদ্ধ করা যায় বা যা কোনো অধিকরণে সাধনের যোগ্য। যেহেতু পর্বতে বহ্নির অস্তিত্বের উপস্থিতি প্রমাণের যোগ্য তাই তা হল সাধ্য।

এই আলোচনা থেকে এই বিষয়টি স্পষ্ট যে কোনো অধিকরণ যেমন পক্ষ হতে পারে না তেমনই যে বস্তু বা হেতু যে কোন সাধ্যের অনুমাপক হতে পারে না। সেই বস্তুকে প্রত্যক্ষ করে সেই অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের অস্তিত্বই অনুমিত হতে পারে যাদের মধ্যে ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধ রয়েছে। যেমন- পর্বতে ধূমের উপস্থিতি লক্ষ্য করে সেখানে ভাবী বৃষ্টির অনুমান হতে পারে না কারণ ধূমের সঙ্গে বৃষ্টির সম্বন্ধটি ব্যাপ্যব্যাপক নয়। অথচ পর্বতে ধূম দর্শন করে সেখানে বহ্নির উপস্থিতি অনুমিত হতে পারে কারণ ধূম বহ্নির মধ্যে যে সম্বন্ধ তা ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধ। এই বাপ্যব্যাপক সম্বন্ধের অন্য নাম হল ব্যাপ্তি। যেখানে ব্যাপ্তি সম্বন্ধটি সিদ্ধ বা ব্যাপ্তিনিশ্চয় রয়েছে সেখানে হেতুর সাহায্যে সাধ্যের অনুমান যথার্থ হতে পারে।

---

[১৫] 'ত্রৈরূপ্যং পুনর্লিঙ্গস্যানুমেয়ে সত্ত্বম্ এব, সপক্ষ এব সত্ত্বম্, অসপক্ষে চাসত্ত্বম্ এব নিশ্চিতম্'- *ন্যায়বিন্দু* (স্বার্থানুমান)-৫।

১.৩ অনুমিতির ঘটক হিসাবে ব্যাপ্তিজ্ঞান

অনুমিতির সম্ভাব্যতা ও যথার্থতা উভয়ই ব্যাপ্তির উপর নির্ভর। অনুমিতিকে যদি কার্য ধরা হয় তাহলে তার সমবায়ী কারণ হয় অনুমাতা, অসমবায়ী কারণ ওই অনুমাতার আত্মমনোসংযোগ, অন্যদিকে অনুমিতির নিমিত্ত কারণ হিসাবে যাদের গণ্য করা যায় তাদের মধ্যে রয়েছে পক্ষতা ও ব্যাপ্তি। পক্ষতা অনুমিতির মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি গঠন করে অন্যদিকে ব্যাপ্তি তার যৌক্তিক ভিত্তি গঠন করে। স্বাভাবিক কারণে অনুমিতির অলোচনায় ব্যাপ্তির আলোচনা প্রসক্ত হয়।

অনুমিতির আলোচনায় ব্যাপ্তি জ্ঞানের সঙ্গতি অন্যভাবেও প্রদর্শন করা যায়। অনুমিতি হল পরামর্শজন্য জ্ঞান অর্থাৎ ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট-পক্ষধর্মতা-জ্ঞানজন্য জ্ঞান। পূর্বে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতার জ্ঞান না থাকলে অনুমিতি হতে পারে না। এই ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট-পক্ষধর্মতার জ্ঞান হল একটি বিশিষ্টজ্ঞান। বিশেষণের জ্ঞান ছাড়া বিশিষ্টের জ্ঞান হতে পারে না। ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট-পক্ষধর্মতাজ্ঞানে পক্ষধর্মতা হল বিশেষ্য এবং ব্যাপ্তি হল বিশেষণ। সুতরাং রক্ত ঘটের জ্ঞান যেমন রক্ত বর্ণের জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে তেমনি ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট-পক্ষধর্মতাজ্ঞানও ব্যাপ্তি জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে।

শাস্ত্রে যে ছয় প্রকার সঙ্গতির কথা উল্লেখ আছে এখানে সেই সঙ্গতি মধ্যে উপোদ্‌ঘাত সঙ্গতিই দৃষ্ট হয়। "চিন্তাং প্রকৃতিসিদ্ধ্যর্থামুপোদ্‌ঘাতং বিদুর্বুধাঃ" অর্থাৎ প্রকৃত বিষয়ের উপপাদক বিষয়ে যে চিন্তা তাকে উপোদ্‌ঘাত সঙ্গতি বলে। অনুমিতিলক্ষণের নিরূপণের পর যেহেতু লক্ষণের উপপাদকরূপে ব্যাপ্তির নিরূপণ করা আবশ্যক তাই এখানে উপোদ্‌ঘাত

সঙ্গতি হয়েছে। তাছাড়া ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট-পক্ষধর্মতাজ্ঞানজন্য জ্ঞান হিসাবে অনুমিতির পরিচয় দেওয়ার পর লক্ষণ ঘটক ব্যাপ্তির স্বরূপ অজ্ঞাত থাকলে অনুমিতি লক্ষণের জ্ঞান অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই অনুমিতি লক্ষণের উপপাদকতা ব্যাপ্তিতে থাকায় অনুমিতি লক্ষণের নিরূপণের পর লক্ষণের উপপাদকরূপে ব্যাপ্তির নিরূপণ আসলে উপোদ্‌ঘাত সঙ্গতিকে সূচিত করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

লিঙ্গ-লিঙ্গী সম্বন্ধ বিমর্শ

অনুমিতির ক্ষেত্রে লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তির ভূমিকা যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সে কথা অনুমান প্রমাণে আস্থাশীল ব্যক্তি মাত্রই স্বীকার করেন। তবে লিঙ্গ-লিঙ্গীর ওই সম্বন্ধের স্বরূপ ঠিক কীরকম, কীভাবেই বা ওই সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় সে বিষয়ে ভারতীয় সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মতৈক্য নেই। লিঙ্গ-লিঙ্গীর ওই সম্বন্ধের নামকরণ করতে গিয়ে তাঁরা একমত হতে পারেননি। এমনকি একই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত হয়েও নানা আচার্য নানা নামে অভিহিত করেছেন ওই সম্বন্ধকে। সম্প্রদায় ভেদে ও আচার্যভেদে লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধ বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি কতখানি ভিন্ন তার উপর আলোকপাত এই অধ্যায়ে গুরুত্ব পাবে।

২.১ ব্যাপ্তি বিষয়ে জৈন মত

২.১.১ 'অভিনিবোধ' বা অনুমানের পরিচয়

প্রাচীন জৈন শাস্ত্রে অর্থাৎ আগমসূত্রে অনুমান শব্দটিকে বোঝাতে 'অভিনিবোধ' শব্দটির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। আচার্য বিদ্যানন্দ তাঁর তত্ত্বার্থশ্লোকবার্ত্তিকে বলেছেন প্রত্যক্ষ ছাড়ায় যে হেতুর দ্বারা সাধ্য বিষয়ক নিশ্চিত জ্ঞান জন্মে তাকে অভিনিবোধ বলে।[১] এই বার্ত্তিকের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি আরও বলেছেন যে, যে হেতু সাধ্যের সাথে অবিনাভাব সম্বন্ধে আবদ্ধ সেই হেতুর দ্বারা পক্ষে অসিদ্ধ সাধ্যের জ্ঞানকে বলা হয় অনুমান। আচার্য শ্রুতসাগরের মতে সাধনের দ্বারা সাধ্যবিজ্ঞানরূপ স্বার্থানুমানই অভিনিবোধরূপ বিশিষ্টজ্ঞান। এইভাবে তিনিও অনুমানকে

[১] "মতিঃ স্মৃতি সংজ্ঞা চিন্তাভিনিবোধ ইত্যনর্থান্তরম্", *তত্ত্বার্থশ্লোকবার্ত্তিক*- ১/১৩।

বোঝাতে 'অভিনিবোধ' শব্দের ব্যবহার করেছেন। আবার ষটখণ্ডাগমসূত্রের ব্যাখ্যাকার বীরসেন 'অভিনিবোধ' শব্দের দ্বারা মতিজ্ঞান সামান্যকে বুঝিয়েছেন। যেখানে অকলঙ্ক, বিদ্যানন্দ আদি আচার্য অনুমানকে মতি জ্ঞানের এক বিশেষ প্রকার বলে স্বীকার করেছেন।

ষটখণ্ডাগমসূত্রে বীরসেন শ্রুত জ্ঞানের ৪১টি পর্যায় শব্দের কথা বলেছেন তার মধ্যে একটি হল হেতুবাদ। এই হেতুবাদ শব্দের ব্যাখা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন– যেটি সাধ্যের অবিনাভাবী লিঙ্গ যাকে অন্যথানুপপত্তি লক্ষণের দ্বারা সূচিত করা হয় সেখানে তার সমর্থনে যে হেতুকে প্রয়োগ করা হয় তাকে সাধন হেতু বলে। অন্যদিকে পরপক্ষ প্রতিষেধ বা খণ্ডনের উদ্দেশ্যে যে হেতু প্রয়োগ করা হয় তা হল দূষণ হেতু। এককথায় যা নিজের অথবা অন্যের অর্থকে প্রমাণ করে বা যা পঞ্চ প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তাই হেতু। আগমে শ্রুত জ্ঞানের দুটি প্রকারের কথা বলা হয়েছে– প্রথমটি শব্দ লিঙ্গজ ও দ্বিতীয়টি অশব্দ লিঙ্গজ। যাকে আমরা অনুমান বলি তা জৈন শাস্ত্রে অশব্দ লিঙ্গজ জ্ঞান হিসাবে পরিচিত।

প্রাচীন জৈন গ্রন্থগুলিতে এভাবে অনুমানের আলোচনা করা হলেও স্পষ্টভাবে অনুমানের লক্ষণ ও প্রক্রিয়ার বর্ণনা পাওয়া যায় সিদ্ধসেনের ন্যায়াবতার গ্রন্থে। সিদ্ধসেনের মতে সাধ্যের অবিনাভাবী লিঙ্গের দ্বারা সাধ্য বিষয়ে নিশ্চয়াত্মক ও অভ্রান্ত যে জ্ঞান হয়, তাকেই অনুমান বলে।[২] সিদ্ধসেনকৃত ওই লক্ষণ অনুসরণ করেই লঘীয়স্ত্রয়ী ও ন্যায়বিনিশ্চয় গ্রন্থে অনুমানের লক্ষণ করতে গিয়ে অকলঙ্ক বলেছেন- সাধ্যের অবিনাভূত লিঙ্গের দ্বারা সাধ্য

[২] "সাধ্যাবিনাভুতে লিঙ্গাৎসাধ্যনিশ্চায়কং স্মৃতম্।
অনুমানং তদভ্রান্তং প্রমাণত্বাৎসমক্ষবত্।।" *ন্যায়াবতার-* ৫।

বিষয়ে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাই অনুমান।[৩] সেখানে হান, উপাদান ইত্যাদিকে অনুমানের ফল বলা হয়েছে। অকলঙ্কের এই লক্ষণই প্রায় হুবহু অনুসৃত হয়েছে বিদ্যানন্দ, মানিক্যনন্দী, বাদিরাজ, প্রভাচন্দ্র, হেমচন্দ্র, ধর্মভূষণ প্রমুখ পরবর্তী জৈন আচার্যদের দ্বারা। 'লিঙ্গ পরামর্শজন্য অনুমান' ন্যায় সম্মত এই অনুমিতির লক্ষণের সমালোচনা করেছেন আচার্য ধর্মভূষণ। তিনি মনে করেন, যদি লিঙ্গপরামর্শকে অনুমান মানা হয়, তাহলে তার দ্বারা সাধ্যের সিদ্ধি সম্ভব নয়। কারণ লিঙ্গপরামর্শের অর্থ হল লিঙ্গ বিষয়ক জ্ঞান। যার দ্বারা লিঙ্গবিষয়ক অজ্ঞতা দূর হলেও সাধ্য বিষয়ক অজ্ঞানতা দূর হয় না। এই বিবেচনা থেকে আচার্য ধর্মভূষণ ন্যায়দীপিকায় বলেছেন- ''সাধনাৎ সাধ্যবিজ্ঞানম্ অনুমানম্''[৪] অর্থাৎ সাধন বা লিঙ্গ থেকে উৎপন্ন সাধ্য বা লিঙ্গীর বিজ্ঞান বা সম্যক্ অর্থ নির্ণয়ই অনুমান। সাধ্যবিজ্ঞানই সাধ্যবিষয়ক অজ্ঞানের নিরাকরণ করতে পারে। কাজেই এভাবে দেখলে অনুমান হয়ে দাঁড়ায় অনুমেয় সম্বন্ধীয় অজ্ঞানের নিবৃত্তিপূর্বক অনুমেয়ের জ্ঞান। অনুমেয় সম্বন্ধীয় অজ্ঞান নিবৃত্তি কেবল সাধ্যের জ্ঞান দ্বারাই হতে পারে কিন্তু হেতু বা পরামর্শের দ্বারা নয়। এই হিসেবে অনুমিতির সাক্ষাৎকারণও সাধ্যবিষয়ক জ্ঞানই হয়।

যদিও অপরাপর জৈন আচার্যরা স্বার্থ ও পরার্থ উভয় ক্ষেত্রেই অনুমান লক্ষণের সমন্বয় মানেন। তথাপি বাদীদেবসূরি ধর্মকীর্তির মতোই একই লক্ষণের দ্বারা স্বার্থ ও পরার্থ অনুমানকে সূচিত করা যায় না বলে মনে করেন। তিনি স্বার্থ ও পরার্থের পৃথক পৃথক লক্ষণের পক্ষপাতী। এই মতপার্থক্য থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় জৈন পরম্পরায় সাধ্যবিষয়ক বিজ্ঞানই

---

[৩] ''লিঙ্গাৎসাধ্যাবিনাভাবাভিনিবোধৈকলক্ষণাৎ'', *লঘীয়স্ত্রয়ী*-১২।

[৪] ব্যাকরণশাস্ত্রী শ্রীশ্রীলাল, *ন্যায়দীপিকা*, ১৯১৫, পৃষ্ঠা- ২০।

প্রকৃত পক্ষে অনুমান। এই অনুমানই অনুমিতিরূপ ফলের জনক। তবে জৈন মতে, প্রমাণের ফল দুইপ্রকার হয়– সাক্ষাৎ বা প্রত্যক্ষ ফল ও পরোক্ষ ফল। বস্তুসম্বন্ধে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হল সাক্ষাৎ ফল, অন্যদিকে হান-উপাদানাদি হল পরোক্ষ ফল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার বৌদ্ধ মতে, প্রমিতি রূপ ফল যেখানে প্রমাণের সাথে অভিন্ন সেখানে ন্যায় মতে প্রমাণ প্রমাণফল হতে ভিন্ন। অন্যদিকে, জৈন মতে প্রমাণ ও প্রমাণফল ভিন্ন ও অভিন্ন দুইই। আচার্য বাদীরাজ 'অনুমান' শব্দের ব্যুৎপত্তি করেছেন এইভাবে– অনু অর্থাৎ ব্যাপ্তি নির্ণয়ের অনন্তর উৎপন্ন হয় যে জ্ঞান তাই অনুমান। মাণিক্যনন্দী অনুমানের লক্ষণ দিতে গিয়ে বলেছেন – "সাধনাৎসাধ্যবিজ্ঞানমনুমানম্"।[৫] যশোবিজয়ও মাণিক্যনন্দীর এই লক্ষণকে হুবুহু গ্রহণ করে বলেছেন– "সাধনের দ্বারা সাধ্য বিষয়ে যে বিজ্ঞান উৎপন্ন হয় তাই অনুমান"।[৬] তিনি স্বার্থ ও পরার্থ অনুমানের এই ভেদ স্বীকার করে স্বার্থানুমানকে হেতুগ্রহণ ও সম্বন্ধস্মরণ জনিত বলে দাবি করেছেন।[৭]

২.১.২ ব্যাপ্তি পরিচয়

অন্যান্য দর্শনের মতো জৈন দর্শনেও ব্যাপ্তিকে অনুমানের ভিত্তি হিসেবে মানা হয়। দুটি বিষয়ের নিয়ত সাহচর্যের অনুভব ছাড়া একটিকে অবলম্বন করে অপরটির অনুভব হতে পারে না। ব্যাপ্তি = বি+আপ্তি = বিশেষরূপে সম্বন্ধ। বৌদ্ধের মতো জৈন তার্কিকরাও ব্যাপ্তিকে অবিনাভাব বলেছেন। মানিক্যনন্দী ব্যাপ্তির স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন - এই বস্তু

---

[৫] "সাধনাৎসাধ্যবিজ্ঞানমনুমানম্", *পরীক্ষামুখসূত্র-* ৩/১০।

[৬] "সাধনাৎসাধ্যবিজ্ঞানমনুমানম্", পণ্ডিত শোভাচন্দ্র ভারিল্ল, *জৈন তর্কভাষা,* ১৯৬৪, পৃষ্ঠা- ৬৪।

[৭] "তৎ দ্বিবিধং স্বার্থং পরার্থ চ। তত্র হেতুগ্রহণসম্বন্ধস্মরণকারণকং সাধ্যবিজ্ঞানং স্বার্থম্", তদেব।

থাকলে এই বস্তু থাকে, ওটি না থাকলে এটি থাকে না - এইরূপ সম্বন্ধই ব্যাপ্তি।[৮] এই বর্ণনা থেকে স্পষ্ট যে, মানিক্যনন্দী অন্বয় ব্যতিরেককেই ব্যাপ্তি হিসেবে মেনেছেন।[৯] ফলে অবিনাভাবই যে জৈন মতে ব্যাপ্তি এই বর্ণনা থেকে তা স্পষ্ট হয়। এছাড়া সহভাব নিয়ম ও ক্রমভাব নিয়মকেও ব্যাপ্তি বলেছেন মানিক্যননন্দী।[১০] সহচারী বা ব্যাপ্যব্যাপকীভূত পদার্থের মধ্যে সহভাব নিয়ম বা পূর্বাপর্ নিয়ম থাকে। আর উত্তরোত্তর অর্থাৎ কার্যকারণ পদার্থের মধ্যে ক্রমভাব নিয়ম থাকে। 'ন্যায়বিনিশ্চয়' গ্রন্থে ব্যাপ্তির স্বরূপ নির্দেশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে– যে এখানে ওখানে অসিদ্ধ হলেও যাকে ছাড়া যার জ্ঞান সম্ভব হয় না তাকেই গমক বলা হয়। আসলে এখানে 'গমক' শব্দের দ্বারা ব্যাপ্তিকেই সূচিত করা হয়েছে।

সহভাব নিয়মের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আচার্য অনন্তবীর্য বলেছেন রূপ-রসাদি, বৃক্ষত্ব-শিংশপাত্ব ইত্যাদি ব্যাপ্যব্যাপক পদার্থদের মধ্যে যে ক্রমভাব নিয়ম তাই ব্যাপ্তি বা অবিনাভাব।[১১] যেমন এটি রসবান হওয়ার কারণে রূপবান। এখানে এই অনুমানের ক্ষেত্রে যেখানে যেখানে রস থাকে সেখানে সেখানে রূপ থাকে, এটি ব্যাপ্তি। কিন্তু যেখানে রূপ আছে সেখানে রস আছে এটি ব্যাপ্তি নয়। যেমন তেজে রূপ থাকলেও রস নেই এবং তাদের সম্বন্ধ ব্যাপ্তিও নয়। একইভাবে 'বৃক্ষত্বং শিংশপাত্ব' এই অনুমানের ক্ষেত্রে শিংশপাত্ব ব্যাপ্য আর বৃক্ষত্ব ব্যাপক হওয়ার কারণে যেখানে যেখানে শিংশপাত্ব থাকে সেখানে সেখানে বৃক্ষত্ব থাকে। এই ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি বলা হয়। কিন্তু যেখানে যেখানে বৃক্ষত্ব থাকে সেখানে

---

[৮] "ইদমস্মিন্ সত্যেব ভবতি অসতি তু ন ভবত্যেবেতি", *পরীক্ষামুখসূত্র-* ৩/৮।

[৯] "উপলম্ভানুপলম্ভনিমিত্তং ব্যাপ্তিজ্ঞানমূহঃ", তদেব- ৩/৭।

[১০] "সহক্রমভবনিয়মোহবিনাভাব", তদেব- ৩/১২।

[১১] "সহক্রমভাবনিয়মোহবিনাভাব", *প্রমেয়রত্নমালা-* ২/১২।

সেখানে শিংশপাত্ব না থাকার কারণে অর্থাৎ তাদের মধ্যে ব্যাপ্যব্যাপকভাব না থাকায় তাদের সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি বলা যায় না। জৈন মতে এই ব্যাপ্যব্যাপকভাবই হল সহভাব নিয়ম। কাজেই বৌদ্ধরা যেখানে সহভাবের কারণ হিসাবে তাদাত্ম্যের কথা বলে থাকেন সেখানে জৈনরা সহভাবের আধার হিসাবে স্বীকার করেন ব্যাপব্যাপক ভাবকে।

ক্রমভাবের উদাহরণ দিতে গিয়ে জৈন তার্কিকরা বলেন যেমন কৃত্তিকা নক্ষত্রের উদয়ের উত্তরোত্তর শকট নক্ষত্রের উদয় হয় সেরূপ ধূম ও বহ্নির মধ্যেও কার্য-কারণের ক্রমভাব নিয়ম বা ব্যাপ্তি দৃষ্ট হয়। কৃত্তিকা ও শকটের উদয়ের মধ্যে ক্রমভাব নিয়ম এইজন্যই থাকে যেহেতু কৃত্তিকা নক্ষত্রের উদয় হওয়া মাত্রই শকট নামক নক্ষত্রের উদয় হয়। পূর্বে ও পরে উদয় হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে ক্রমভাব দৃষ্ট হয়। আর এই প্রকার নিয়মিত পূর্ব ও পশ্চাৎভাব হতেই তাদের মধ্যে ক্রমভাব নিয়ম সিদ্ধ হয়। একইভাবে ধূম অগ্নি জন্য হওয়ার কারণে তাদের মধ্যে ক্রমভাব দৃষ্ট হয়। ধূম কার্য ও অগ্নি কারণ হওয়ায় যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেখানে সেখানে বহ্নি থাকে এইরূপ ক্রমভাব নিয়ম সিদ্ধ হয়।

আচার্য ধর্মভূষণের মতে সাধ্য ও সাধনের মধ্যে গম্য-গমক ভাব সিদ্ধকারী ব্যভিচার শূন্য যে সম্বন্ধ তাকেই অবিনাভাব বলে। এখানে সহভাব ও ক্রমভাবের যে নিয়মের কথা জৈনরা বলেন তা গৌতম ও কণাদের মত থেকে খুব একটা ভিন্ন কিছু না। প্রায় সব সম্প্রদায়ই ব্যাপ্তি বিষয়ে এই ধারণাটি সমর্থন করেন।

জৈন নৈয়ায়িকরা ব্যাপ্তিকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন – অন্বয় ব্যাপ্তি ও ব্যতিরেক ব্যাপ্তি। তাঁদের এই ভেদ মূলত হেতুর তথোপপত্তি ও অন্যথানুপপত্তি এর ভিত্তিতে। আচার্য হেমচন্দ্র আবার ব্যাপ্তির দুটি রূপের কথা বলেছেন। যার প্রথমটি হল অযোগব্যবচ্ছেদরূপ ব্যাপ্তি আর

দ্বিতীয়টি হল অন্যযোগব্যবচ্ছেদরূপ ব্যাপ্তি। যদিও ব্যাপ্তির এই দুটি রূপ অন্য কোনো জৈন নৈয়ায়িক দ্বারা সমর্থিত হয়নি। আচার্য প্রভাচন্দ্র ব্যাপ্তির তিনটি প্রকারের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা – বর্হিব্যাপ্তি, সাকল্যব্যাপ্তি ও অন্তর্ব্যাপ্তি।

২.১.৩ ব্যাপ্তিনিশ্চয়-এর উপায়

ব্যাপ্তিগ্রহ বিষয়ে নানা মত পরিলক্ষিত হয়। ন্যায় মতে অন্বয়, ব্যতিরেক, ব্যভিচারাগ্রহ, উপাধিনিরাশ, তর্ক ও সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষ দ্বারা ব্যাপ্তি গৃহীত হয়। বৌদ্ধ মতে, তাদাত্ম্য ও তদুৎপত্তির দ্বারাই ব্যাপ্তির গ্রহণ হয়। কিন্তু জৈনরা কেবলমাত্র তর্কের দ্বারা ব্যাপ্তিগ্রহের কথা বলে থাকেন। আচার্য অকলঙ্কের মতে, অন্বয় অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও তর্কের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েই অবিনাভাব সম্বন্ধটি সম্পূর্ণরূপে সিদ্ধ হতে পারে। জৈন নৈয়ায়িকরা তর্ককে শুরু থেকেই ব্যাপ্তিগ্রহের উপায় বলেছেন। জৈন আগমে অনুমানের কারণ হিসাবে চিন্তার কথা বলা হয়েছে। এখানে বলা দরকার চিন্তা, তর্ক, ঊহ ইত্যাদি হল পর্যায় শব্দ। আচার্য বিদ্যানন্দ তর্ককে অবিনাভাব ব্যাপ্তি গ্রাহক বলে মেনেছেন। যে প্রত্যয়ের জ্ঞান দ্বারা সাধ্য ও সাধনের ব্যাপ্তির নিশ্চয় হওয়ার ফলে অনুমিতির প্রবৃত্তি স্বার্থক হয় সেই তর্ককে সংবাদী বা সফল হওয়ার কারণে প্রমাণ বলে মানেন জৈনরা।

প্রমেয়রত্নমালাকার তর্ককেই ব্যাপ্তির গ্রাহক বলেছেন। অকলঙ্ক তর্কের লক্ষণ করতে গিয়ে বলেছেন প্রত্যক্ষ ও অনুপলম্ভের দ্বারা উৎপন্ন সম্ভবাপন্ন জ্ঞান হল তর্ক। সাধ্য ও সাধনের সম্বন্ধ বিষয়ে অজ্ঞানের নিবৃত্তিরূপ সাক্ষাৎ নিশ্চয়াত্মক ফলের জনক হল তর্ক। মানিক্যনন্দীও তর্কের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে – যার উপলব্ধির কারণে ব্যাপ্তিজ্ঞান হয় তাকেই ঊহ

বা তর্ক বলে।[১২] যেমন- অগ্নির উপস্থিতিতে ধূম উৎপন্ন হওয়া যেমন একটি উপলব্ধি তেমনই অগ্নির অনুপস্থিতিতে ধূমের না হওয়ায় একপ্রকার অনুপলব্ধি। এই অনুপলব্ধি ও উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে ব্যাপ্তির যে জ্ঞান তাই তর্ক। এরই ভিত্তিতে বহ্নি ধূমের সর্বকালিক, সর্বদৈশিক এবং সার্বত্রিক গ্রহণ হয়। আচার্য সিদ্ধর্ষিগণি, প্রভাচন্দ্র, অনন্তবীর্য, হেমচন্দ্র, ধর্মভূষণ, যশোবিজয় আদি সকল জৈন তার্কিকগণও তর্ককে ব্যাপ্তি গ্রাহক বলে স্বীকার করেছেন। এমনকি অন্য তার্কিকদের দ্বারা প্রতিপাদিত ব্যাপ্তিগ্রহের উপায়গুলির প্রতিষেধ করেছেন।

২.২ বৌদ্ধ মতে অবিনাভাব

২.২.১ অনুমান বিষয়ে দ্বি-প্রমাণবাদী বৌদ্ধ মত

বৌদ্ধ দর্শনের নানা সম্প্রদায় তন্মধ্যে শূন্যবাদী মাধ্যমিক কোনোরূপ প্রমাণ স্বীকার করেন না। প্রমাণ ও প্রমেয়ের মধ্যে কোনোরূপ সম্বন্ধই মাধ্যমিক মতে সিদ্ধ নয়। প্রমাণের বিরুদ্ধে ত্রৈকাল্যাসিদ্ধির আপত্তি উত্থাপন করে একপ্রকার অপ্রামাণ্যবাদকেই সমর্থন করেন শূন্যবাদীরা। তবে দিঙ্‌নাগ, ধর্মকীর্তি প্রমুখ পরবর্তী আচার্যরা প্রমাণের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেননি। প্রমাণ বা সম্যক জ্ঞান ছাড়া পুরুষার্থ সিদ্ধি সম্ভব নয় সেকথা উপলব্ধি করেই পরবর্তী আচার্যরা প্রমাণ স্বীকার করেছেন এবং প্রমাণের দ্বৈবিধ্যের কথা বলেছেন। স্বলক্ষণ বস্তুর জ্ঞানে প্রত্যক্ষকে প্রমাণ হিসাবে মেনেছেন তাঁরা। পক্ষান্তরে, সামান্য লক্ষণের জ্ঞান লাভের উপায় হিসাবে মেনেছেন অনুমানকে।

---

[১২] "উপলম্ভানুপ্লম্ভনিমিত্তং ব্যাপ্তিজ্ঞানমূহ", *পরীক্ষামুখসূত্র-* ৩/৭।

অনুমানের কোনো সামান্য লক্ষণ ন্যায়বিন্দুকার বা কোনো বৌদ্ধ আচার্য দেননি এই বিবেচনা থেকে যে অনুমিতির এমন কোনো লক্ষণ হতে পারে না যা স্বার্থ ও পরার্থ উভয়বিধ অনুমানকে অন্তর্ভূক্ত করে। স্বার্থানুমান জ্ঞানাত্মক, আর পরার্থানুমান শব্দাত্মক। উভয় অনুমানের অত্যন্ত ভিন্নতার কারণে কোনো সামান্য লক্ষণের দ্বারা উভয়কে সূচিত করা সম্ভব নয় বলে ন্যায়বিন্দুকার মনে করেন। তবে প্রত্যক্ষ শব্দটির মতো অনুমান শব্দটির অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন ধর্মোত্তর। সেখানে তিনি বলেছেন "মীয়তেহনেনেতি মানম্"[১৩] অর্থাৎ কিনা যার মাধ্যমে পরিমাপ করা যায় বা পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় তাই মান। একটি প্রমেয় বিষয়ে পরিমাপ করা যায় বা বস্তুর স্বারূপ্য নিরূপণ করা যায় যার দ্বারা তাকে বলা হয় প্রমাণ। এই প্রমাণ সাক্ষাৎ ভাবে হতে পারে আবার পরোক্ষ ভাবে হতে পারে। ইন্দ্রিয়কে আশ্রয় করে সরাসরিভাবে যেখানে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে প্রত্যক্ষ বলে।[১৪] আর অনুমান হল পশ্চাৎবর্তী জ্ঞান, যেখানে লিঙ্গদর্শন বা লিঙ্গগ্রহণ ও সম্বন্ধস্মরণ – এই দুইয়ের পশ্চাৎ বস্তুর সাদৃশ্য নির্ধারিত হয়।[১৫] অর্থাৎকিনা পক্ষধর্মের জ্ঞান ও ব্যাপ্তিজ্ঞান এই দুটি জ্ঞানের অনন্তর যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় আক্ষরিক অর্থে তাকেই অনুমান বলেছেন ধর্মোত্তর এখানে একটি বিষয় স্পষ্ট যে বৌদ্ধ মতে পক্ষধর্মতার জ্ঞান ও ব্যাপ্তিস্মরণ এই দুটি হতেই অনুমান উৎপন্ন হতে পারে। এর অতিরিক্ত ব্যাপ্তি-বিশিষ্ট-পক্ষধর্মতাজ্ঞান বা পরামর্শ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না।

অনুমিতির কোনো সামান্য লক্ষণ উল্লেখ না করলেও পৃথকভাবে স্বার্থানুমান ও পরার্থানুমানের লক্ষণ করেছেন ধর্মকীর্তি। স্বার্থানুমানের লক্ষণ প্রদান করতে গিয়ে তিনি

---

[১৩] সঞ্জিত কুমার সাধুখাঁ, *ন্যায়বিন্দু*, ২০০৭, পৃষ্ঠা- ৩২।

[১৪] "প্রত্যক্ষমিতি প্রতিগতমাশ্রিতম্ অক্ষম্", তদেব।

[১৫] "লিঙ্গগ্রহণসম্বন্ধস্মরণস্য পশ্চাৎ মানম্ অনুমানম্", তদেব।

বলেছেন– ''স্বার্থং ত্রিরূপাল্লিঙ্গাৎ যদনুমেয়ে জ্ঞানং তদ্ অনুমানম্''[১৬] অর্থাৎ ত্রিরূপ লিঙ্গ থেকে যেখানে অনুমেয় বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাই হল স্বার্থানুমান। এখানে 'অনুমেয়' শব্দটির অর্থ সাধ্য বিশিষ্ট পক্ষ। যেখানে ত্রিরূপ লিঙ্গের সাহায্যে অনুমেয় বিষয়ে অর্থাৎ সাধ্য বিশিষ্ট পক্ষের জ্ঞান হয় তাকে বলা হয় স্বার্থানুমান। এখানে যে ত্রিরূপ লিঙ্গের কথা বলা হয়েছে লিঙ্গের সেই তিনটি রূপ হল অনুমেয় বা পক্ষে সাধ্যের উপস্থিতি (অনুমেয় সত্ত্বম্ এব), কেবল সপক্ষে সাধ্যের উপস্থিতি (সপক্ষ এব সত্ত্বম্) এবং অসপক্ষ বা বিপক্ষে সাধ্যের অনুপস্থিতি (অসপক্ষে অসত্ত্বম্)।[১৭] হেতুর এই তিনধর্ম পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব ও বিপক্ষাসত্ত্বকে সূচিত করে।

এই অনুমান যে ত্রিরূপ লিঙ্গের উপর নির্ভর এবং ত্রিরূপ লিঙ্গ তথা অনুমেয় লিঙ্গীর সঙ্গে তার সম্বন্ধ জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল সে বিষয়টি স্বীকার করেন বৌদ্ধরা। তবে কিনা ওই লিঙ্গ ও লিঙ্গীর সম্বন্ধকে তাঁরা ব্যাপ্তি না বলে বলেন অবিনাভাব। 'বিনা ন ভবতি' এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে যাকে ছাড়া যার ভাব বা সত্তা হয় না তার সঙ্গে তার সম্বন্ধই অবিনাভাব। যেমন- ধূম বহ্নি ছাড়া থাকে না, ধূমের ওই বহ্নিকে ছেড়ে না থাকাই হল অবিনাভাব। ধর্মোত্তর তাঁর ন্যায়বিন্দু টীকায় অব্যভিচারী নিয়মকে অবিনাভাব নিয়ম বলেই সম্বোধন করেছেন। আবার কেউ কেউ অনৌপাধিক সম্বন্ধকে অবিনাভাব বলেছেন।

এই অবিনাভাব বা ব্যাপ্তি অসম্ভব বলে দাবি করেন চার্বাকরা। প্রত্যক্ষৈকমাত্র প্রমাণবাদী হওয়ার কারণে চার্বাকরা প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত প্রমাণ স্বীকার করেন না। তাঁদের

---

[১৬] *ন্যায়বিন্দু* (স্বার্থানুমান)– ৩।

[১৭] 'ত্রৈরূপ্যং পুনর্লিঙ্গস্যানুমেয়ে সত্ত্বম্ এব, সপক্ষ এব সত্ত্বম্, অসপক্ষে চাসত্ত্বম্ এব নিশ্চিতম্', তদেব- ৫।

মতে ব্যাপ্তি হল সন্দিগ্ধোপাধিশূন্য বা নিশ্চিতোপাধিশূন্য সম্বন্ধ; যে সম্বন্ধটি জ্ঞাততারূপে কারণ, সত্তারূপে বা স্বরূপতয়ারূপে নয়। অন্তঃকরণ বাহ্য বিষয়ে বাহ্য ইন্দ্রিয়ের অধীন হয়েই প্রবৃত্ত হয় বলে আন্তর প্রত্যক্ষ ব্যাপ্তিজ্ঞানের জনক হয়। বর্তমান জ্ঞানবিষয়ের জনক হলেও অতীত ও ভাবী বিষয়ে তা সম্ভব না হওয়ায় সর্বোপসংহার সম্ভব হয় না। ফলে ব্যাপ্তি দুর্জ্ঞেয় হওয়ায় তার ব্যাপ্তির জ্ঞানোপায় সম্ভব নয় বলে চার্বাকগণ দাবি করেন। এমনকি তাঁদের মতে যদি সামান্যভাবে ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্ভব বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়ও তথাপি বিশেষ বিশেষ বহ্নি ও ধূমের মধ্যে ব্যাপ্তি নিশ্চয় সম্ভব নয়। আর ব্যাপ্তি জ্ঞানের উপায় হিসাবে অনুমানকেও গ্রহণ করা যায় না। কারণ ওই অনুমানের ভিত্তি যে ব্যাপ্তিজ্ঞান তা যে উপাধিশূন্য বস্তুদ্বয়ের সম্বন্ধের জ্ঞান তা নির্ধারণের জন্য অন্য আরেক অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়। ফলে অনবস্থা প্রসঙ্গ হয়। শব্দকেও ব্যাপ্তিগ্রহের উপায়রূপে স্বীকার করেন না চার্বাকরা। এইভাবে চার্বাক আপত্তি তোলেন যে ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠার উপায় না থাকায় অনুমান প্রমাণ হতে পারে না।

বৌদ্ধ মতে এই চার্বাক মত সঙ্গত নয়। কারণ তাঁদের মতে 'তাদাত্ম্য' ও 'তদুৎপত্তি' এই দুইয়ের দ্বারা অবিনাভাব বা ব্যাপ্তির জ্ঞান সম্ভব। একথাই প্রমাণবার্ত্তিকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন ধর্মকীর্তি। সেখানে তিনি বলেছেন সাধ্য ও হেতুর অব্যভিচারের সাধক কার্য-কারণ-ভাব ও স্বভাব হতে অবিনাভাবের নিশ্চয় হয়।[১৮] বৌদ্ধমতে সাধ্যাভাবের অধিকরণে হেতুর অদর্শন হতে বা সাধ্য ও সাধনের সহভাব দর্শনমাত্র হতে অবিনাভাবের নিশ্চয় হয় না বরং কার্য-কারণভাব থেকে বা স্বভাব থেকেই ব্যাপ্তির নিশ্চয় হয়। যেমন- ধূম কার্য থেকে বহ্নিরূপ

[১৮] "কার্য্যকারণভাবাদ্ বা স্বভাবাদ্ বা নিয়ামকাৎ।
অবিনাভাবনিয়মোহদর্শনান্ন ন দর্শনাৎ।।" *প্রমাণবার্ত্তিক* (স্বার্থানুমান)– ৩১।

কারণের নির্ণয় হয়। বহিনিরূপিত ধূমনিষ্ঠ ব্যাপ্তি ধূম ও বহ্নির কার্যকারণ ভাব থেকে জানা যায়। আবার স্বভাব থেকেও ব্যাপ্তির নিশ্চয় হয়। 'স আত্মা যস্য, স তদাত্ম্য' - আর ওই তদাত্মের ভাবই তাদাত্ম্য। আলোচ্যক্ষেত্রে 'স' শব্দের অর্থ সাধ্য। 'আত্মা' শব্দের অর্থ - স্বরূপ। সাধ্য বিষয়টি আত্মা যার অর্থাৎ যে হেতুর, সেই হেতুটি হল তাদাত্ম্য। আর তার ধর্মই হল তাদাত্ম্য। এই ব্যুৎপত্তি অনুসারে 'তাদাত্ম্য' শব্দের অর্থ - সাধ্য ও হেতুর ঐক্য বা অত্যন্ত অভেদ। বৌদ্ধমতে ধর্ম ও ধর্মী মূলত অভিন্ন। যখন বলা হয় শিংশপা বৃক্ষবিশেষ তখন অভেদ জ্ঞানবশতই শিংশপাত্ব হেতুর দ্বারা শিংশপাতে বৃক্ষত্বের অনুমান হয়ে থাকে। শিংশপাত্ব ও বৃক্ষত্বের মধ্যে তাদাত্ম্য রয়েছে। শিংশপা হল বৃক্ষবিশেষ। বস্তুত শিংশপা বৃক্ষস্বরূপ না হয়ে পারে না। কাজেই উভয়ের তাদাত্ম্য হেতু অবিনাভাব নিয়মের ক্ষেত্রে ব্যভিচার সংশয় অমূলক।

'তস্মাৎ উৎপত্তিঃ' - এইরূপ সমাসে নিষ্পন্ন তদুৎপত্তি শব্দের অর্থ - কার্য-কারণ-ভাব। 'সাধ্যং বিনা ন ভবতি' এই ব্যুৎপত্তিতে নিষ্পন্ন অবিনাভাব শব্দের অর্থ - সাধ্য বিনা যা হয় না অর্থাৎ সাধ্যের নিবৃত্তিতে যার নিবৃত্তি হয় তাই অবিনাভাব। এই তাদাত্ম্য ও তদ্যুৎপত্তির নিশ্চয় হতেই অবিনাভাবের নিশ্চয় হয়। বৃক্ষত্ব ছাড়া শিংশপার শিংশপাত্ব এবং কারণ বহ্নি ছাড়া ধূমের কার্যত্ব অন্য কোনরূপে উপপন্ন হয় না বলে বৃক্ষ ও শিংশপা এবং বহ্নি ও ধূমের সম্বন্ধ হল অবিনাভাব। এই অবিনাভাবই হল নিয়ম বা ব্যাপ্তি। আর তাদাত্ম্য ও কার্য-কারণ-ভাবের নিশ্চয়টি অবিনাভাব নিশ্চয়ের হেতু।

২.২.২ লিঙ্গ-লিঙ্গী সম্বন্ধরূপে অবিনাভাব

বৌদ্ধ মতে যাদের মধ্যেই কার্য-কারণ-ভাব ও তাদাত্ম্য সম্বন্ধ আছে তাদের মধ্যেই অবিনাভাব আছে এবং ওই কার্য-কারণ-ভাব ও তাদাত্মের নিশ্চয় হতেই অবিনাভাবের নিশ্চয় হয়। সাধ্যাভাবের অধিকরণে হেতুর অদর্শনমাত্র হতে অবিনাভাবের নিশ্চয় হয় না। তা যদি হত তাহলে বহ্নিও ধূমের অবিনাভাবী বা ব্যাপ্য হত এবং বহ্নি হেতুর সাহায্যে ধূমেরও যথার্থ অনুমিতি হত। জলহ্রদে সাধ্য ধূমের অভাব থাকে আবার হেতু বহ্নিও সেখানে থাকে না। কাজেই সাধ্যাভাব সহকৃত হেতুর অদর্শন হতেই বহ্নি ও ধূমের অবিনাভাবের নিশ্চয় হয়ে থাকে। কিন্তু বহ্নি ধূমের অবিনাভাবী নয় কারণ উত্তপ্তলৌহপিণ্ডে ধূম ছাড়া বহ্নি থাকায় ব্যভিচার পরিলক্ষিত হয়।

আবার সাধ্য ও সাধনের সহভাব দর্শনমাত্র হতেও অবিনাভাবের নিশ্চয় হয় না। কারণ তা যদি হত তবে সহভাবী চৈত্র ও মৈত্র অবিনাভাবী হয়ে উভয়েই যথার্থ অনুমিতির হেতু হত। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। সর্বত্র চৈত্র ও মৈত্রের সহভাব দর্শন হলেও রাত্রিতে স্ত্রীর শয্যায় উভয়ের ব্যভিচার পরিলক্ষিত হয়। সুতরাং সাধ্যাভাব সহকৃত হেতুর অদর্শন বা সাধ্য ও সাধনের সহভাব দর্শন অবিনাভাবের নিশ্চায়ক নয়। বরং তাদাত্ম্য ও তদুৎপত্তির নিশ্চয়ই অবিনাভাবের নিশ্চায়ক।

অবিনাভাব নিশ্চয়ের অন্যতম উপায় হল অন্বয় ও ব্যতিরেক। 'তৎ সত্ত্বে তৎ সত্তই' হল অন্বয়। যেমন- কারণ থাকলে কার্য থাকে - এটি হল অন্বয়। অপরদিকে 'তদাসত্ত্বে তদাসত্তই' হল ব্যতিরেক। যেমন- কারণ না থাকলে কার্য্য থাকে না- এটি ব্যতিরেক। একইভাবে বৃক্ষ থাকলে শিংশপা থাকে বৃক্ষ না থাকলে শিংশপা থাকে না যেহেতু শিংশপা

বৃক্ষস্বরূপ। ওই বৃক্ষস্বরূপকে পরিত্যাগ করে শিংশপা বৃক্ষ হতে পারে না। কারণ নিজ স্বরূপকে পরিত্যাগ করে কখনই কেউ থাকতে পারে না। এটিই স্বভাব বা তাদাত্ম্যেরর অন্বয়ব্যতিরেক। এর দ্বারা বোঝা যায় বৃক্ষ ও শিংশপার অবিনাভাব আছে। দিঙ্‌নাগ তাঁর প্রমাণসমুচ্চয়ে এই অন্বয়ব্যতিরেককে অবিনাভাবের নিশ্চায়ক বলেছেন।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে এই অন্বয়ব্যতিরেককে অবিনাভাবের নিশ্চায়ক বললে হেতুতে সাধ্যের অব্যভিচার নিশ্চয় দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। কারণ এর দ্বারা হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার সংশয়ের নিবৃত্তি হয় না। সন্নিহিত ও বর্তমান সাধ্য ও সাধনের অন্বয় ও ব্যতিরেক দ্বারা অব্যভিচার নিশ্চয় হয় সত্য; কিন্তু তার দ্বারা অতীত, অনাগত বা অসন্নিহিত বর্তমান সাধ্য ও সাধনের অব্যভিচার নিশ্চয় হয় না, যেহেতু এইসব ক্ষেত্রে ব্যভিচার পরিলক্ষিত হয়। এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে ন্যায়বিন্দুর টীকাকার ধর্মোত্তর বলেছেন - তর্ক উপস্থিত হলেই এইরূপ ব্যভিচার শঙ্কার নিবৃত্তি হয়ে যায় কারণ তর্ক ব্যাভিচার শঙ্কার নির্বতক। কারণ ছাড়া কার্যের উৎপত্তি হোক, এইরূপ ব্যভিচার সন্দেহ সক্রিয় ব্যঘাতক তর্ক দ্বারা নিবৃত্ত হয়। যেমন ধূম যদি বহ্নির ব্যভিচারী হয়, তবে তা বহ্নি জন্য না হোক এইরূপ তর্ক উপস্থাপিত করা হয়। এই প্রসঙ্গে যদি কেউ বলেন ধূম বহ্নিজন্য নয়, অন্যজন্য। তাহলে বহ্নিপ্রার্থী ব্যক্তির ধূম দেখে বহ্নির আনয়নে প্রবৃত্তি হবে না। কারণ সে জানে ধূম বহ্নি জন্য নয়, অন্যজন্য এবং যেখানে ধূম আছে, সেখানে বহ্নি নাই বরং সেখানে অন্য কিছু আছে। সুতরাং এখন বহ্নিপ্রার্থী ব্যক্তির ধূম দেখে বহ্নির আনয়নে প্রবৃত্তি না হোক অথচ বাস্তবে তা হয় না। ওই প্রার্থী ব্যক্তির প্রবৃত্তি হতেই দেখা যায়। সুতরাং এটি সক্রিয় ব্যাঘাতক। এই সক্রিয় ব্যাঘাতক তর্কই ব্যাভিচার শঙ্কা নিবৃত্তির উপায়। একথা ন্যায়াচার্য উদয়নের দ্বারাও স্বীকৃত হয়েছে। তিনি বলেছেন

''ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা''।[১৯] অর্থাৎকিনা ব্যভিচার শঙ্কা ব্যাঘাতাবধি বা ব্যাঘাত নিবর্ত্তক। তাঁর মতে ধূম যদি বহ্নি জন্য না হত, তবে বহিপ্রার্থী ব্যক্তির ধূম দেখে বহ্নির আনয়নে প্রবৃত্তি হত না। অথচ তা হয়। অতএব স্বীকার করতে হয় যে ধূম বহ্নিজন্য। কাজেই এই সক্রিয় ব্যাঘাতক তর্কের দ্বারা সাধ্য ও সাধনের ব্যাভিচার শঙ্কার নিবৃত্তি হলে কার্য-কারণ-ভাবের নিশ্চয় হয় এবং তার দ্বারা অবিনাভাবেরও নিশ্চয় হয়।

সুতরাং বৌদ্ধ মতে তদুৎপত্তি বা কার্য-কারণ-ভাবের নিশ্চয়ের দ্বারাই অবিনাভাবের নিশ্চয় হয়, এটি প্রমাণসিদ্ধ। এছাড়াও তাঁদের মতে কার্য ও কারণের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও প্রত্যক্ষ অনুপলব্ধি পাঁচটি বা পঞ্চকারণীর দ্বারাও তদুৎপত্তির নিশ্চয় স্বীকার করেন বৌদ্ধরা। এই পঞ্চকারণী যথাক্রমে - ১) উৎপত্তির পূর্বে কার্যের অনুপলব্ধি, ২) কারণের উপলব্ধি, ৩) কার্যের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, ৪) কারণের অনুপলব্ধি, ৫) কার্যের অনুপলব্ধি। জ্ঞানশ্রীও 'কার্যকারণভাবসিদ্ধি' নিবন্ধে আনুপূর্বীক এই পাঁচটিকে তদুৎপত্তি নিশ্চয়ের হেতু বলেছেন। সেই অনুসারে শ্রীধর ভট্টও তার ন্যায়কন্দলীতে বৌদ্ধ মত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ওই পাঁচটিকে গ্রহণ করেছেন।[২০] কাজেই যে দুটির মধ্যে আনুপূর্বীক এই পাঁচটি থাকে না, তাদের মধ্যে অবিনাভাবের নিশ্চায়ক কার্য-কারণ-ভাবও থাকতে পারে না। যেমন, দণ্ড ও ঘট। দণ্ড ঘটের কারণ। ঘট দণ্ডের কার্য। ঘটের উৎপত্তির পূর্বে ঘটের প্রত্যক্ষ অনুপলব্ধি হয়। কিন্তু উৎপত্তির পরে দণ্ড ও ঘটের, বহ্নি ও ধূমের ন্যায় নিয়মিত উভয়ের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয় না। কারণ ঘটের উৎপত্তির পরক্ষণে দন্ডের বিনাশ হয়ে যায়। যেহেতু বিদ্যমান বস্তুরই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি

---

[১৯] *ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ-* ৩/৭।

[২০] ''তদুৎপত্তিবিনিশ্চয়োহপি কার্যহেতুঃ পঞ্চপ্রত্যক্ষোপলম্ভানুপলম্ভসাধনঃ। কার্যস্যোৎপত্তেঃ প্রাগনুপলম্ভঃ...কারণস্য চোপলম্ভানুপলম্ভাবিতি''- *ন্যায়কন্দলী*, দূর্গাধর ঝা, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা- ৪৬২।

হয়ে থাকে। কিন্তু দণ্ড তখন বিদ্যমান থাকে না বলে তার প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং দণ্ড-ঘট স্থলে পূর্বোক্ত আনুপূর্বীক পঞ্চকারণী না থাকায় দন্ড-ঘটের কার্য-কারণ-ভাব অবিনাভাবের জ্ঞাপক হতে পারে না।

বৌদ্ধমতে এই কার্য-কারণ-ভাব আবার দুই প্রকার - (১) শুদ্ধ কার্য-কারণ-ভাব ও (২) অবিনাভাবের নিশ্চয় জনক কার্য-কারণ-ভাব। উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি পঞ্চক নিবন্ধন কার্য-কারণ-ভাবের নিশ্চয়ই অবিনাভাবের নিশ্চয় জনক কার্য-কারণ-ভাব। আর তদভিন্ন কার্য-কারণ-ভাবই শুদ্ধ কার্য-কারণ-ভাব। যেমন, দণ্ড ও ঘটের কার্য-কারণ-ভাব। দণ্ড ও ঘটের মধ্যে শুদ্ধ কার্য্য-কারণ-ভাব থাকলেও উক্ত উপলব্ধি ও অনুপলব্ধি পঞ্চক নিবন্ধন অবিনাভাবের নিশ্চায়ক কার্য-কারণ ভাব থাকে না। তাই সেখানে অবিনাভাবের নিশ্চয় হয় না। কিন্তু বহ্নি ও ধুমের মধ্যে উক্ত পঞ্চক নিবন্ধন অবিনাভাবের নিশ্চয় জনক কার্য-কারণ-ভাব বিদ্যমান থাকে। তাই সেখানে উক্ত পঞ্চকারণী দ্বারা তদুৎপত্তি বা কার্য-কারণ-ভাবের নিশ্চয় হয়।

এই তাদাত্ম্য নিশ্চয়ের হেতু হিসাবে বৌদ্ধদর্শনে পঞ্চকারণী ছাড়াও আরও দুই প্রকার সামানাধিকরণ্যের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যার দ্বারা তার নিশ্চয় হয়। ওই দুই প্রকার সামানাধিকরণ্য হল- (১) অর্থ-সামানাধিকরণ্য ও (২) শব্দ-সামানাধিকরণ্য।

২.৩ লিঙ্গ-লিঙ্গী সম্বন্ধ বিষয়ে প্রাচীন ন্যায় মত

২.৩.১ প্রাচীন মতে ব্যাপ্তি

ন্যায়সূত্রে ব্যাপ্তির উদ্দেশ বা লক্ষণ কোনটিই পরিলক্ষিত হয়নি। সংক্ষিপ্ত বাক্যে মহর্ষি কেবল এটুকুই ব্যক্ত করেছেন যে অনুমান হল ‘তৎপূর্বক’ জ্ঞান যা পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট

ভেদে তিন প্রকার হতে পারে।[২১] তবে অনুমানের এই বিভাজন সূত্র থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে লিঙ্গজ্ঞান তথা ব্যাপ্তিজ্ঞান ভেদেই অনুমানের এই ভেদ। যেখানে কারণটি লিঙ্গ হয় সেখানে কার্যের সঙ্গে তার ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধটি অনুমিতির ঘটক হয়। যেখানে কার্যটি লিঙ্গ হয় সেখানে কারণের সঙ্গে তার সম্বন্ধটি ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধ হয়। আর কার্য কারণ ভিন্ন ক্ষেত্রেও ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধের ভিত্তিতে কোনো বিষয় লিঙ্গ হতে পারে তার পরিচয় দিতে গিয়ে সামান্যতোদৃষ্ট অনুমানের কথা বলা হয়েছে। সরাসরিভাবে 'ব্যাপ্তি' শব্দের উল্লেখ ন্যায় ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও করেননি। তবে সূত্রকার ব্যবহৃত তৎপূর্বক কথাটির অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধ দর্শনের কথা বলেছেন। এই বর্ণনায় 'সম্বন্ধ' শব্দটি ব্যাপ্তির পরিচায়ক তবে এই সম্বন্ধ যে কোনো সম্বন্ধ নয়, সম্বন্ধ বিশেষ। এ হল লিঙ্গ ও লিঙ্গীর মধ্যেকার সম্বন্ধ। লিঙ্গ বলতে চিহ্নকে বোঝায়। একটি বিষয় অন্যনিরপেক্ষ ভাবে লিঙ্গ হতে পারে না, অন্য একটি পদার্থের সাপেক্ষেই তা লিঙ্গ হয়; যাকে বলা হয় লিঙ্গী বা চিহ্নিত। দুটি বিষয় যখন এমন সম্বন্ধে আবদ্ধ হয় যে প্রথমটি দ্বিতীয়টির চিহ্ন হিসাবে গণ্য হয়– প্রথমটি উপস্থিত থাকলেই দ্বিতীয়টি উপস্থিত থাকে তাদের যথাক্রমে লিঙ্গ ও লিঙ্গী বলা যায়। যেহেতু দ্বিতীয়টি প্রথমটিকে ব্যাপ্ত করে থাকে তাই প্রথমটিকে ব্যাপ্য ও দ্বিতীয়টিকে ব্যাপক বলা হয়। লিঙ্গ-লিঙ্গীর এই সম্বন্ধই পরবর্তীকালে ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধ বা 'ব্যাপ্তিসম্বন্ধ' নাম পেয়েছে। ব্যাপ্তিবিশিষ্ট লিঙ্গের জ্ঞানের দ্বারাই যে অনুমান উৎপন্ন তা স্পষ্ট করতে গিয়ে বাৎস্যায়ন অনুমানের লক্ষণে বলেছেন – "মিতেন লিঙ্গেন লিঙ্গিনোহর্থস্য পশ্চান্মানমনুমানম্"।[২২] অর্থ এই মিত বা সাধ্যের সঙ্গে নিশ্চিত সম্বন্ধে আবদ্ধ লিঙ্গের দ্বারা লিঙ্গীরূপ অর্থের যে পশ্চাৎবর্তী জ্ঞান

---

[২১] "অথ তৎপূর্বকং ত্রিবিধমনুমানাং পূর্ববচ্ছেষবৎসামান্যতো দৃষ্টং চ"- *ন্যায়সূত্র*, ১/১/৫।

[২২] অনন্তলাল ঠাকুর, *ন্যায়দর্শনম্*, ২০১৪, পৃষ্ঠা- ১৮২।

হয় তাই অনুমান। লিঙ্গীর সঙ্গে সংবদ্ধ লিঙ্গের জ্ঞানের দ্বারাই যে এই জ্ঞান হয় তা স্পষ্ট। অন্যত্র বাৎস্যায়ন অবয়বের আলোচনা প্রসঙ্গে উদাহরণের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 'সাধ্যসাধন সম্বন্ধে'র[২৩] কথা বলেছেন। এই সাধ্যসাধন সম্বন্ধ কার্যত ব্যাপ্তি সম্বন্ধই।

ন্যায়বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকরও লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধ দর্শন এবং সাধ্য-সাধন ভাবের কথা বলেছেন কিন্তু ব্যাপ্তি বা ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধের উল্লেখ করেননি। তবে ব্যাপ্তির নাম উল্লেখ না করলেও উদ্দ্যোতকর 'নান্তরীয়কার্থ দর্শনে'র কথা বলেছেন। বার্ত্তিকে তিনি বলেছেন – "যোহর্থো যমর্থমন্তরেণ ন ভবতি, স ভবতি নান্তরীয়কঃ"।[২৪] বক্তব্য এই যে অর্থ যা ছাড়া হয় না তাই তার নান্তরীয়ক। যেমন– ধূম বহ্নি ছাড়া থাকে না তাই বহ্নি ধূমের নান্তরীয়ক। এই অর্থে নান্তরীয়ক সম্বন্ধ 'অবিনাভাবে'রই সদৃশ। অন্যভাবেও লিঙ্গ লিঙ্গীর সম্বন্ধের পরিচয় দিয়েছেন উদ্দ্যোতকর। যেমন তিনি বলেছেন– "অনুমানেহথ তৎতুল্যে সদ্ভাবো নাস্তিতাসতি"।[২৫] এর অর্থ যেখানে অনুমেয় পক্ষ এবং সপক্ষ অর্থাৎ দৃষ্টান্তে লিঙ্গের সৎভাব থাকে এবং সাধ্যের অসদ্ভাবে লিঙ্গের অসদ্ভাব থাকে সেখানে অনুমিতি হতে পারে। এতদ্বারা অনুমিতির অনুমাপক লিঙ্গে যে পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব ও বিপক্ষাসত্ত্ব তিনটিই থাকা প্রয়োজন তা স্পষ্ট হয়ে যায়। আর এই বর্ণনা থেকে লিঙ্গীর সঙ্গে লিঙ্গের সামানাধিকরণ্য এবং লিঙ্গীর অভাবে লিঙ্গের অসামানাধিকরণ্য রূপ সম্বন্ধই যে ব্যাপ্তি তা স্পষ্ট হয়ে যায়।

---

[২৩] "...সাধ্যসাধনভাবঃ সাধর্ম্যাদ্ ব্যস্থিত উপলভ্যতে", তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৬১।

[২৪] তদেব, পৃষ্ঠা- ৩০০।

[২৫] তদেব, পৃষ্ঠা-৩০১।

তাৎপর্য টীকাকার বাচস্পতিও কণ্ঠত ব্যাপ্তি কথাটির উল্লেখ করেননি। তবে লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধকে তিনি 'অনুমানাঙ্গ সম্বন্ধ' নামে অভিহিত করেছেন। এপ্রসঙ্গে তাৎপর্যের একটি সন্দর্ভের উল্লেখ করা চলে– "লিঙ্গলিঙ্গিসম্বন্ধদর্শনমাদ্যং প্রত্যক্ষম্ ইত্যত্র সম্বন্ধপদেনানুমানাঙ্গং সম্বন্ধং বিবক্ষন্ পরোক্তান্ সম্বন্ধবিকল্পান্ অনুমানাঙ্গভূতান্ প্রতিক্ষিপতি"।[২৬] তবে এপ্রসঙ্গে অপরাপর বাদীরা যে সব সম্বন্ধকে অনুমানাঙ্গ সম্বন্ধ বলেছেন তাদের নিরাকরণ করেছেন বাচস্পতি। বৌদ্ধরা লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধকে অবিনাভাব সম্বন্ধ বা প্রতিবন্ধ-প্রতিবদ্ধ ভাব বলে উল্লেখ করেছেন। লিঙ্গীর অভাবের সঙ্গে লিঙ্গের অদর্শন এবং লিঙ্গের সদ্ভাবের সঙ্গে লিঙ্গীর সদ্ভাব দ্বারা এই সম্বন্ধের নিশ্চয় হয় না বলে বৌদ্ধরা দাবি করেছেন। বাচস্পতি বৌদ্ধ আচার্যদের এই দাবি খণ্ডন করেছেন এই যুক্তিতে যে রসের দ্বারা রূপের যে অনুমান হয় সেখানে দুইয়ের মধ্যে তদুৎপত্তি বা কার্য-কারণ ভাব যেমন থাকে না তেমনই তাদাত্ম্য সম্বন্ধও থাকে না। সুতরাং ব্যতিরেক এবং অন্বয় দ্বারাই এরূপ ক্ষেত্রে অবিনাভাব গৃহীত হয় বলে মানতে হবে এবং একথা স্বীকার করতে হবে যে রূপের অভাবের সঙ্গে রসের অদর্শন ও রসের দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে রূপের দর্শন এখানে লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উপায় হয়।

তাৎপর্যে বৈশেষিক স্বীকৃত লিঙ্গ-লিঙ্গীর চারসম্বন্ধী এবং সাংখ্য স্বীকৃত সপ্তভঙ্গীর সমালোচনা করা হয়েছে এই বলে যে, 'সম্বন্ধী' পদের দ্বারা অন্য সম্বন্ধ অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাওয়ায় পৃথক শব্দের দ্বারা অনুমানের লক্ষণ করা অযৌক্তিক হয়ে দাঁড়ায়। 'ইদম্ মিত্যম্' রূপে পৃথকভাবে লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধের সন্ধান নিরর্থক। সম্বন্ধ যাই হোক না কেন দেখানো দরকার যে তা নিয়ত, স্বাভাবিক এবং উপাধিশূন্য। যেমন – ধূমের সঙ্গে বহ্নির সম্বন্ধ স্বাভাবিক কিন্তু

---

[২৬] তদেব, পৃষ্ঠা-৩০৪।

বহ্নির সঙ্গে ধূমের সম্বন্ধ স্বাভাবিক নয়, বরং তা ঔপাধিক। 'তৎপূর্বক' শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অনুমানাঙ্গ সম্বন্ধকে 'প্রতিবন্ধ' ও 'ব্যাপ্তি' এই দুটি নামে অভিহিত করেছেন বাচস্পতি।

তাৎপর্যের উপর পরিশুদ্ধি গ্রন্থেও 'ব্যাপ্তি', 'অব্যভিচার', 'প্রতিবন্ধ' ইত্যাদি নানা শব্দের দ্বারা অনুমানাঙ্গ লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধকে অভিহিত করা হয়েছে। অনুমানের লক্ষণ নিরূপণ প্রসঙ্গে পরিশুদ্ধিকার বলেছেন– "ন হি ব্যাপ্তিস্মরণমাত্রাদনুমিতিঃ, নাপি লিঙ্গদর্শনমাত্রাৎ। কিং তর্হি? ব্যাপ্তিবিশিষ্টলিঙ্গদর্শনাৎ"।[২৭] বক্তব্য এই শুধুমাত্র ব্যাপ্তির স্মরণ হতে বা শুধুমাত্র লিঙ্গ দর্শন হতে অনুমিতি উৎপন্ন হয় না পরন্তু ব্যাপ্তিবিশিষ্ট যে লিঙ্গ তার দর্শন দ্বারাই অনুমিতি হয়। 'ব্যাপ্তি' শব্দটির পুনরোল্লেখ দৃষ্ট হয় পরিশুদ্ধিতে– "পক্ষধর্মতা হি ব্যাপ্ত্যা সহ প্রতিসংহিতানুমানোপযোগিনী"[২৮] অর্থাৎ ব্যাপ্তির সঙ্গে প্রতিসঙ্গী হয়েই পক্ষধর্মতা অনুমিতির উপযোগী হয়। এই সকল সন্দর্ভ প্রমাণ করে যে কেবল ব্যাপ্তিজ্ঞান ও পক্ষধর্মতাজ্ঞান হতে অনুমিতির উৎপত্তি ন্যায় মতে স্বীকৃত নয়, পরন্তু ব্যাপ্তি সহিত যে পক্ষধর্মতাজ্ঞান অর্থাৎ পরামর্শ তা অনুমিতির উৎপত্তিতে অবশ্যই স্বীকার্য। ব্যাপ্তি যে অব্যভিচার, উপাধিশূন্য স্বাভাবিক সম্বন্ধ সে কথাও সূচিত হয় পরিশুদ্ধির নিম্নলিখিত সন্দর্ভে– "তস্মাদুপাধাশ্যাং ব্যভিচারোহনুপাধৌ অবশ্যমব্যভিচারঃ। ব্যভিচারেহবশ্যমুপাধিরব্যভিচারেহবশ্যমুপাধ্যভাবঃ"[২৯] অর্থাৎ উপাধি যুক্ত হল ব্যভিচার আর উপাধিশূন্য হল অব্যভিচার। যেখানে ব্যভিচার হয় সেখানে উপাধি অবশ্যই থাকে আর যেখানে অব্যভিচার থাকে তা অবশ্যই উপাধিশূন্য হয়।

---

[২৭] তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৩২।

[২৮] তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৩৮।

[২৯] তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৩৪।

এভাবে লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধকে উপাধি শূন্য হিসাবে ব্যাখ্যা করে তাকে অব্যভিচার বলে অভিহিত করেছেন উদয়ন।

লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধ যে প্রতিবন্ধ সম্বন্ধ সে কথারও ইঙ্গিত করেছেন পরিশুদ্ধিকার – "...ব্যভিচার এব প্রতিবন্ধাভাবঃ। উপাধেরেব ব্যভিচারাশঙ্কা"।[৩০] বক্তব্য এই যেখানে ব্যভিচার থাকে সেখানে প্রতিবন্ধের অভাব থাকে, আর যেখানে উপাধি থাকে সেখানে ব্যভিচার শঙ্কা দেখা দেয়। পরিশুদ্ধিকারের এই উক্তি প্রমাণ করে যে ব্যভিচার যেমন প্রতিবন্ধের অভাবকে নির্দেশ করে তেমনই অব্যভিচার প্রতিবন্ধের উপস্থিতিকে নির্দেশ করে। কার্যত যা ব্যাপ্তি তা যেমন অব্যভিচার হয়ে দাঁড়ায়, তেমনই যা অব্যভিচার তা প্রতিবন্ধ হয়ে দাঁড়ায়। ব্যাপ্তিকে বোঝাতে প্রতিবন্ধ শব্দের প্রয়োগ তাঁর ন্যায়কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থেও করেছেন উদয়ন। সেখানে গ্রন্থকার প্রতিবন্ধই যে অনুমানের বীজ সে কথাই স্পষ্ট করেছেন।[৩১] ওই একই গ্রন্থে অবশ্য লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধের পরিচয় দিতে গিয়ে 'অবিনাভাব' শব্দের প্রয়োগও পরিলক্ষিত হয়।[৩২] যাইহোক লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধের বর্ণনায় প্রতিবন্ধ শব্দের প্রয়োগ পরিশুদ্ধি, ন্যায়কুসুমাঞ্জলি ছাড়াও তাঁর আত্মতত্ত্ববিবেক গ্রন্থেও পরিলক্ষিত হয়। ক্ষণিকত্ববাদী বৌদ্ধের 'যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকম্' সিদ্ধান্তের বিরোধীতা করে সত্ত্বে ক্ষণিকত্বের ব্যাপ্তি যে অসিদ্ধ এবং সে কারণে সত্ত্ব থেকে ক্ষণিকত্বের অনুমান হতে পারে না সে দাবি পেশ করতে গিয়ে উদয়ন বলেছেন – "যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকম্ যথা ঘটঃ, সশ্চ বিবাদাধ্যাসিত শব্দাদিরিতি চেৎ ন, প্রতিবন্ধা সিদ্ধেঃ"।[৩৩]

---

[৩০] তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৩৬।

[৩১] "...অনুমানবীজপ্রতিবন্ধাসিদ্ধেঃ", শ্রীমোহন ভট্টাচার্য, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলিঃ*, ২০১৫, পৃষ্ঠা- ২৪৩।

[৩২] "ননু তর্কোহপ্যবিনাভাবমপেক্ষ্য প্রবর্ততে, ততোহনবস্থয়া ভবিতব্যম্", তদেব, পৃষ্ঠা-২৫১।

[৩৩] আচার্য কেদারনাথ ত্রিপাঠী, *আত্মতত্ত্ববিবেকঃ*, ১৯৯২, পৃষ্ঠা- ৪।

এই প্রতিশব্দগুলির প্রয়োগ দ্বারা পরিশুদ্ধিকার একথা বোঝাতে চেয়েছেন যে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ অব্যভিচার সম্বন্ধ এবং তা উপাধিশূন্য বা অনৌপাধিক। যেমন- ধূম ও বহ্নির যে সম্বন্ধ তা ঔপাধিক নয় স্বাভাবিক। ঔপাধিক সম্বন্ধ মাত্রই ব্যভিচারী সম্বন্ধ। যেখানে উপাধি থাকে সেখানে ব্যভিচার অবশ্যই থাকে। যেমন- বহ্নি ধূমের সম্বন্ধের ক্ষেত্রে আদ্রের্ন্ধন সংযোগ উপাধি থাকায় ওই সম্বন্ধ ব্যভিচারী।

জয়ন্ত ভট্টের মতে পঞ্চলক্ষণ যুক্ত হেতু তথা ব্যাপ্তিস্মরণের দ্বারা উৎপন্ন পরোক্ষ সাধ্য বিষয়ে যে জ্ঞান তাই হল অনুমান।[৩৪] জয়ন্ত পঞ্চলক্ষণ যুক্ত জ্ঞানলিঙ্গ অথবা লিঙ্গজ্ঞানকে ব্যাপ্তিস্মরণ সহকৃতভাবে প্রমাণ মেনেছেন এবং লিঙ্গজ্ঞানকে বলেছেন তার ফল। তাঁর বক্তব্য হল লিঙ্গজ্ঞানকে যদি অনুমান প্রমাণ হিসাবে মানা হয় তাহলে হেয় উপাদেয় বুদ্ধিকে তার ফল বলে মানতে হবে। জয়ন্ত পঞ্চলক্ষণ যুক্ত হেতুর প্রমাণের পূর্বে একটি ক্রম প্রতিপাদন করেছেন। সেখানে তিনি তৃতীয় লিঙ্গপরামর্শের উল্লেখ করেননি। 'তৎপূর্বক'– এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে 'তে দ্বে প্রত্যক্ষ পূর্ব যস্য' এই বিগ্রহবাক্য অনুসারে প্রথমে ব্যাপ্তিদর্শন ও পরে লিঙ্গদর্শন হওয়ার পর এই দুই প্রত্যক্ষকে কেন্দ্র করে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে অনুমান বলেছেন। কারণ 'তৎপূর্বক কারণং যস্য তৎপূর্বকম্' – এইরকম অর্থ করলে নির্ণয় ও উপমানাদিতে অতিব্যাপ্তি হয়। অনুমানাভাসেও প্রত্যক্ষ পূর্বকত্ব থাকে। এই জন্য অনুমিতির লক্ষণে পঞ্চলক্ষণ যুক্ত হেতুর প্রয়োগ স্বার্থক।

---

[৩৪] "পঞ্চলক্ষণকাল্লিঙ্গাৎ গৃহীতান্নিয়মে স্মৃতেঃ। পরোক্ষে লিঙ্গিনি জ্ঞানমনুমানং প্রচক্ষতে।।"- সূর্যনারায়ণ শর্মা শুক্লা, *ন্যায়মঞ্জরী*, ১৯৩৬, পৃষ্ঠা-১০১।

এভাবে অনুমান যে প্রত্যক্ষপূর্বক জ্ঞান তা সকলেই মানেন। কিন্তু প্রত্যক্ষপূর্বকত্বকে অনুমানের লক্ষণ ধরলে স্মৃতি, ভাবনা, সংস্কার থেকে শুরু করে সংস্কার ও প্রত্যক্ষজন্য নির্ণয়াদিতে অতিব্যাপ্তি দেখা দেয়। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য উদ্যোতকর 'তৎপূর্বক' কথাটিকে শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় পূর্বক না বুঝে, ইন্দ্রিয় পূর্বক বিজ্ঞান হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কারণ বিজ্ঞান হল বিশিষ্টজ্ঞান যা স্মৃত্যাদি জ্ঞান থেকে আলাদা। আর নির্ণয় প্রসঙ্গে বার্ত্তিকারের ব্যাখ্যা হল তা কদাচিৎ ক্ষেত্রে প্রমাণ ফলের অন্তর্ভূক্ত হওয়ায় লক্ষণান্তর্গত হয়। তবে জয়ন্তভট্ট ব্যাপ্তির স্মরণকে অনুমিতির অন্যতম পূর্বাঙ্গ হিসাবে দেখেছেন। এই ব্যাপ্তিকে তিনি অবিনাভাব বা নিত্য সাহচর্য বলে অভিহিত করেছেন।[৩৫] এই সাহচর্য জ্ঞানের স্মৃতি যে অনুমানের পূর্বাঙ্গ তা অন্যান্য আচার্যের মতো জয়ন্তও স্বীকার করেন। জয়ন্তের মতে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর অর্থাৎ হেতু ও সাধ্যের সম্বন্ধই সাহচর্যের সম্বন্ধ। তবে এই সাহচর্যের নিয়মের গ্রহণ হলেই যে অনুমিতি হয় তা নয়। অনুমিতির পূর্বে সাহচর্যের দর্শন না হলেও তার স্মরণ উৎপন্ন হয় এবং সেই সাহচর্যের স্মরণ থেকেই অনুমিতি হয়ে থাকে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অনুমিতির ক্ষেত্রে তৃতীয় লিঙ্গদর্শনের অপেক্ষা থাকে না বলে মনে করেন জয়ন্ত।

ভাসর্বজ্ঞ অনুমানের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন- "সম্যগবিনাভাবেন পরোক্ষানুভব-সাধনমনুমানম্"[৩৬] অর্থাৎ অবিনাভাব জনিত পরোক্ষানুভবের যে সম্যক সাধনরূপ লিঙ্গেরজ্ঞান তাই অনুমান। লক্ষণটিকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ হতে ব্যবচ্ছেদের জন্য লক্ষণে 'পরোক্ষ' পদটি সংযোজিত হয়েছে। কিন্তু শব্দ প্রমাণও পরোক্ষ অনুভবের সাধন হয়, তাই পরোক্ষ অনুভবের

---

[৩৫] "নিয়মস্মৃতেরিতি বিব্রিয়তাং কোহয়ং নিয়মো নাম, ব্যাপ্তিরিবিনাভাবো নিত্যসাহচর্যমিত্যর্থঃ"- তদেব, পৃষ্ঠা-১০৩।

[৩৬] ললিতা চক্রবর্তী, *ন্যায়সার*, ২০১২, পৃষ্ঠা-৩৫।

সাধনরূপ অনুমিতি লক্ষণের শব্দ প্রমাণে অতিব্যাপ্তি হয়। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য লক্ষণে 'অবিনাভাব' শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে। অবিনাভাব থেকে সংশয় এবং বিপর্যয় সম্ভব হয়, তাই সংশয় ও বিপর্যয়াত্মক অবিনাভাবঘটিত জ্ঞানকে ব্যাবৃত্ত করার জন্য লক্ষণে 'সম্যগ্' পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। অতএব অবিনাভাব রূপ অসাধারণ কারণ থেকে যে পরোক্ষানুভব জন্মায় তার করণই অনুমান। এই অবিনাভাবের স্বরূপ প্রসঙ্গে গ্রন্থকার বলেছেন – "স্বভাবতঃ সাধ্যেন সাধনস্য ব্যাপ্তিরবিনাভাব"[৩৭] অর্থাৎ সাধ্যের সঙ্গে সাধনের স্বাভাবিক বা উপাধিরহিত অবিনাভাব সম্বন্ধই ব্যাপ্তি। এখানে সাধ্য হল গম্য এবং সাধন হল গমক। সাধ্যবহ্নির ব্যাপকত্ব এবং সাধন ধূমের ব্যাপ্যত্ব সর্বদর্শনস্বীকৃত। যত্র যত্র ধূমঃ তত্র তত্র অগ্নি - এর অন্যথা দৃষ্ট হয় না। এইজন্য এদের সম্বন্ধই অবিনাভাব এবং স্বাভাবিক সম্বন্ধ। যাকে অবিনাভাব বা ব্যাপ্তি বলা হয়। অনুমান প্রকরণে পক্ষধর্মতার লক্ষণ করতে গিয়েও ভাসর্বজ্ঞ বলেছেন সাধ্যধর্মবিশিষ্ট ধর্মীই হল পক্ষ। আর সেখানে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হেতুর উপস্থিতি হল পক্ষধর্মতা। সাধ্যধর্মবিশিষ্ট ধর্মী – যেখানে সাধ্য আশ্রিত হয় – ওই ধর্মীই হল পক্ষ। সেই পক্ষে ব্যাপ্যত্বরূপে হেতু থাকাই পক্ষধর্মতা। এইভাবে ব্যাপ্য শব্দের ব্যবহার দ্বারা ভাসর্বজ্ঞ ব্যাপ্তিকে ইঙ্গিত করেছেন।

প্রসঙ্গান্তরে উপনয়ের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ভাসর্বজ্ঞ বলেছেন – দৃষ্টান্তে যে হেতুতে সাধ্যের অবিনাভাব দৃষ্ট হয় দৃষ্টান্তের সঙ্গে সাদৃশ্যের ভিত্তিতে পক্ষতে ওই হেতুর সাধ্যের সঙ্গে ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠাকারী যে বচন তাই উপনয়। এই বর্ণনা থেকে তিনি অবিনাভাবকেই যে ব্যাপ্তি বলতে চেয়েছেন তা বোঝা যায়। এই সমস্ত উক্তি প্রমাণ করে যে ভাসর্বজ্ঞের সময়কালে

---

[৩৭] স্বামী যোগীন্দ্রানন্দ, *ন্যায়সার*, ১৯৮৪, পৃষ্ঠা- ৩৬।

ব্যাপ্তিসম্বন্ধ প্রসিদ্ধই ছিল এবং তাকে অবিনাভাব সম্বন্ধ হিসাবেই দেখা হত। অন্তত তিনি নিজে অবিনাভাব হিসাবেই ব্যাপ্তিকে দেখতেন বলে মনে হয়।

২.৩.২ ব্যাপ্তিগ্রহোপায় বিষয়ে প্রাচীন মত

লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধ নিশ্চয়ের উপায় কি হবে বা হেতু সাধ্যের সম্বন্ধটি যে স্বাভাবিক তা কীভাবে জানা যায় সে প্রশ্নের উত্তরে ন্যায়সূত্রকার বা ভাষ্যকার কিছু বলেননি। পূর্ববৎ অনুমানের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বার্ত্তিককার লিঙ্গ-লিঙ্গীর অবিনাভাব সম্বন্ধের আলোচনা করলেও তার মীমাংসা বাচস্পতির টীকাতেই প্রথম লক্ষ্য করা যায়। ব্যাপ্তি সম্বন্ধের নিশ্চয় কীভাবে হয় তা ব্যাখ্যা করতে দিঙ্‌নাগাদি পূর্বপক্ষের অবতারণা করে তর্কের দ্বারা ওই মতে অব্যাপ্তি দোষ প্রদর্শন করেছেন। তারপর ব্যাপ্তিগ্রহের উপায় সম্বন্ধে স্বমত ব্যক্ত করেছেন। দিঙ্‌নাগাদি বৌদ্ধ আচার্য তাদাত্ম্য ও তদুৎপত্তিকে অবিনাভাব প্রতিষ্ঠার উপায় বলে দাবি করেন। উদ্দ্যোতকরকে অনুসরণ করে বাচস্পতি দেখান যে কার্যকারণ ভাব অন্বয়ব্যতিরেক থেকে ভিন্ন কিছু নয়। এটি থাকলে এটি থাকে, এটি উপস্থিত না থাকলে ওইটি উপস্থিত থাকে না – এইরূপ অন্বয়ব্যতিরেক দ্বারাই ধূম বহ্নির কার্যকারণভাব প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। একইভাবে বাধক প্রমাণের অভাবেই তাদাত্ম্য নিশ্চয় হয়। যেমন – 'যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকম্' – এখানে সত্ত্ব ও ক্ষণিকত্বের তাদাত্ম্য অক্ষণিক পদার্থের ক্রমে ও অক্রমে উপলব্ধি না হওয়া থেকেই নিশ্চিত হয়। বাচস্পতি বৌদ্ধের তদুৎপত্তি বিষয়ক তর্কের খণ্ডন করতে গিয়ে বলেছেন, যদি বৌদ্ধ ধূমোৎপত্তির অর্থ অগ্নির পশ্চাৎ ধূমের উপস্থিতি বলে মানেন তাহলে বলা চলে রাসভ বা গর্দভাদি দর্শনের পশ্চাতেও তার দর্শন হতে পারে। সেক্ষেত্রে ধূমকে রাসভের ব্যাপ্য বলতে হয়। অথচ লৌকিক অভিজ্ঞতা বলে ধূম রাসভের ব্যাপ্য হতে পারে না। অনন্তরভাবই যদি

কার্যত্ব হয় তাহলে পিশাচের পরে ধূমের উৎপত্তি হলে ধূমকে পিশাচের কার্য তথা অনুমাপক বলতে হয়। অথচ ধূমের দর্শন থেকে পিশাচের অনুমান হয় না তা সর্বজন স্বীকৃত।

বাচস্পতির বিচারে যে সম্বন্ধ স্বাভাবিক ও নিয়ত তা যেকোনো ভাবেই সিদ্ধ হতে পারে। অতএব সেই উপায় গণনা করা বৃথা। যাদের নিয়ত স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে তাদের মধ্যে গম্যগমকভাব আছে। যেকোনো উপায়ে সম্বন্ধটি যে স্বাভাবিক ও উপাধিরহিত সে জ্ঞানই ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠার উপায় হয়। এই স্বাভাবিক সম্বন্ধের গ্রহণ কোন প্রমাণের দ্বারা হয়; সে বিষয়ে বাচস্পতির বক্তব্য হল– ভূয়োদর্শন হতে উৎপন্ন যে সংস্কারঃ; ওই সংস্কার সহিত ইন্দ্রিয়ই ধূম অগ্নির মধ্যে স্বাভাবিক সম্বন্ধের গ্রাহক হয়।[৩৮] জয়ন্ত ভট্টের মতে অন্বয় ও ব্যতিরেক জ্ঞানই সহচার সম্বন্ধের ভিত্তি। এটি থাকলে ওটি থাকে, ওটি না থাকলে এটি থাকে না – এইভাবে দুইয়ের সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় বলে এটি 'অবিনাভাব' নাম পেয়েছে বলে জয়ন্ত মনে করেন। স্বাভাবিক সম্বন্ধের গ্রহণের উপায় হিসাবে উদয়ন স্বভাব বা ভূয়োদর্শন কোনোটিকেই গ্রহণ করেননি। উপাধি দর্শনের দ্বারা ব্যভিচার এবং উপাধি শূন্যতার জ্ঞানের দ্বারা অব্যভিচারনিশ্চয় হয় – এমন কথাও তিনি মানেন না। ব্যভিচার শঙ্কার নিরাশের মাধ্যমে তর্কই ব্যাপ্তিগ্রাহক হয় বলে উদয়ন মনে করেন।[৩৯]

---

[৩৮] "...ভূয়োদর্শনজনিতসংস্কারসহায়মিন্দ্রিয়মেব ধূমাদীনাং বহ্ন্যাদিভিঃ স্বাভাবিকসংবন্ধগ্রাহীতি যুক্তমুৎপশ্যামঃ"- অনন্তলাল ঠাকুর, *ন্যায়দর্শনম্*, ২০১৪, পৃষ্ঠা- ৩১০।

[৩৯] "শঙ্কা চেদনুমাহস্ত্যেব ন চেচ্ছঙ্কা ততস্তরাম্।
ব্যাঘাতাবধিরাশঙ্কা তর্কঃ শঙ্কাবধির্মত।।"- *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি* – ৩/৭।

২.৪ বৈশেষিক মতে ব্যাপ্তি

২.৪.১ লৈঙ্গিক জ্ঞানের পরিচয়

ভারতীয় দর্শনে যাদের প্রমা ও অপ্রমা বলে অভিহিত করা হয়, বৈশেষিক ঐতিহ্যে তাদের যথাক্রমে বিদ্যা ও অবিদ্যা নামে অভিহিত করা হয়েছে। মহর্ষি কণাদ এই বিদ্যার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন- "অদুষ্টং বিদ্যা"।[৪০] যা দুষ্ট বা ভ্রম জ্ঞান নয় - যে জ্ঞান সর্বাংশে যথার্থ তাই হল বিদ্যা। যে জ্ঞানে ভ্রম বা দোষ রয়েছে তা যেমন অবিদ্যা (অপ্রমা) তেমনই যে জ্ঞান সকল প্রকার দোষমুক্ত তা বিদ্যা (প্রমা)। কণাদ সূত্রের ব্যাখ্যায় শঙ্কর মিশ্র বলেছেন, অদুষ্ট ইন্দ্রিয় হতে যা উৎপন্ন হয় সেই যত্র যৎ অস্তি অর্থাৎ যে স্থানে যা আছে সেখানে তার জ্ঞানই বিদ্যা। এই বিদ্যাকে প্রত্যক্ষ ও লৈঙ্গিক ভেদে দুপ্রকার বলা হয়েছে। লিঙ্গ থেকে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাই লৈঙ্গিকজ্ঞান, যা অনুমিতিরই নামান্তর। কণাদের মতে এটি এর কার্য, কারণ, সংযোগী, বিরোধী বা সমবায়ী - এরূপেই লৈঙ্গিকজ্ঞান হয়ে থাকে।[৪১] এই লৈঙ্গিকজ্ঞান বা অনুমিতি জ্ঞানের পরিচয় দিতে গিয়ে পদার্থ ধর্মসংগ্রহে বলা হয়েছে – "লিঙ্গদর্শনাৎ সঞ্জায়মানং লৈঙ্গিকম্"[৪২] অর্থাৎ লিঙ্গ দর্শন থেকে উৎপন্ন যে জ্ঞান তাই লৈঙ্গিকজ্ঞান। এখানে 'লিঙ্গদর্শন' কথার অর্থ লিঙ্গের বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান। 'দর্শন' শব্দটি সচরাচর প্রত্যক্ষেরই বাচক হয়, তবে এখানে লিঙ্গদর্শন লিঙ্গের প্রত্যক্ষ কিংবা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকে সূচিত করে না। কারণ বৈশেষিক মতে লিঙ্গের প্রত্যক্ষ থেকে যেমন অনুমিতি হয় তেমনই লিঙ্গ বিষয়ক অনুমান থেকেও

---

[৪০] *বৈশেষিক সূত্র-* ৯/২/১২।

[৪১] "অস্যেদং কার্য্যং কারণং সংযোগি বিরোধি সমাবায়ি চেতি লৈঙ্গিকম্"- তদেব- ৯/২/১।

[৪২] পণ্ডিত দূর্গাধর ঝা-শর্মা, *প্রশস্তাপাদভাষ্যম্,* ১৯৭৭, পৃষ্ঠা- ৪৭৬।

অনুমিতি হয়। এমনকি লিঙ্গের স্মৃতিজ্ঞান থেকেও অনুমিতির সম্ভাবনা স্বীকার করেছেন উদয়নাচার্য। স্মৃত লিঙ্গ থেকে অনুমিতির সম্ভাবনার কথাও উদয়ন তাঁর কিরণাবলীতে ব্যক্ত করেছেন। এখানে বলা দরকার জ্ঞায়মান লিঙ্গকে অনুমিতির করণ হিসাবে মানেন উদয়নাচার্য। তাঁর মতে এই জ্ঞায়মান লিঙ্গ যেমন দৃষ্ট হতে পারে, অনুমিত হতে পারে, তেমনই স্মৃত হতে পারে। কি দৃষ্ট, কি অনুমিত, কি স্মৃত – সকল প্রকার জ্ঞায়মান লিঙ্গ অনুমিতির জনক হতে পারে বলে কিরণাবলীকার বিশ্বাস করেন। তবে কিরণাবলীকারের এই ব্যাখ্যা শ্রীধর সমর্থন করেন না। তাঁর মতে লিঙ্গদর্শনাৎ এই ভাষ্যের অন্তর্গত দর্শন শব্দটি উপলব্ধিকেই সূচিত করে। আর উপলব্ধি স্মৃতি হতে ভিন্ন। তাই লিঙ্গস্মৃতি হতে অনুমিতি সমর্থন করেন না কন্দলীকার। তবে অনুমিতলিঙ্গ হতেও সাধ্যানুমিতি সম্ভব বলে শ্রীধর মনে করেন।

"লিঙ্গদর্শনাৎ সঞ্জায়মানং লৈঙ্গিকম্" অর্থাৎ হেতুরজ্ঞান হতে সম্যক্‌ভাবে উৎপন্ন হয় যে জ্ঞান তাই লৈঙ্গিকজ্ঞান। এখানে প্রশ্ন উঠবে ভাষ্যকারের এই লক্ষণে 'জ্ঞায়মান' শব্দের পরিবর্তে 'সঞ্জায়মানং' বর্ণনাটির ব্যবহারের উপযোগিতা কী? উত্তরে বলা যায় 'সং' শব্দটি ব্যবহারের দ্বারা ভাষ্যকার আসলে সম্যক্ রূপে উৎপদ্যমান জ্ঞানকে বোঝাতে চেয়েছেন। সংশয়, বিপর্যয় ও স্মৃতিজ্ঞান থেকে লৈঙ্গিকজ্ঞান বা অনুমিতিজ্ঞান যে পৃথক 'সঞ্জায়মানং' শব্দের দ্বারা সে কথাই সূচিত হয়। লিঙ্গদর্শন থেকে সংশয়াত্মক, ভ্রমাত্মকজ্ঞান যেমন উৎপন্ন হতে পারে তেমনই স্মৃত্যাত্মকজ্ঞানও উৎপন্ন হতে পারে। কিন্তু তাদের কোনোটিকেই অনুমিতির পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। কারণ বিদ্যা হিসাবে অনুমিতি একপ্রকার প্রমাত্মকজ্ঞান। "যথার্থপরিচ্ছিত্তিই প্রমা"[৪৩] এবং তা স্মৃত্যাদি জ্ঞানে থাকে না কেননা অর্থ বা বিষয়টি যেরূপ

[৪৩] "তস্য চ জ্ঞানস্য সম্যগজাতীয়স্য যথার্থপরিচ্ছেদকতয়োৎপাদঃ...", তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৭৭।

তার সেরূপে পরিচ্ছেদক সংশয় বা বিপর্যয় হতে পারে না। সংশয়ে একই ধর্মীতে যে সব বিরুদ্ধ ধর্মের জ্ঞান হয় সেগুলি অর্থের স্বাভাবিক ধর্ম হতে পারে না। আর বিপর্যয় যেটি যেরূপ নয় তাকে সেরূপেই প্রকাশ করে। তাই দুটি জ্ঞানই দুষ্ট বা অপ্রমা। এমনকি স্মৃতিও অনুভবাশ্রিত হওয়ায় অর্থের পরিছেদক হতে পারে না। স্মৃত্যাদি জ্ঞান হতে লৈঙ্গিক জ্ঞানের এই বৈলক্ষণ্য 'সং' শব্দের দ্বারাই সূচিত হয়। উদয়ন এভাবেই ভাষ্যকারের অবস্থানকে সমর্থন করেছেন।

অনুমিতিকে লৈঙ্গিকজ্ঞান বলার দ্বারা এই জ্ঞানে লিঙ্গের গুরুত্ব যে অপরিসীম তা সূচিত হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল, লিঙ্গ কী? বা কোন বৈশিষ্ট্য উপস্থিত থাকলে একটি বিষয় লিঙ্গ হতে পারে? এ বিষয়ে প্রশস্তপাদ বলেছেন- "লিঙ্গং পুনঃ যদনুমেয়েন সম্বদ্ধং প্রসিদ্ধং চ তদন্বিতে। তৎভাবে চ নাস্ত্যেব তল্লিঙ্গমনুমাপকম্।।"[৪৪] সহজ কথায় যা অনুমেয়ের সাথে সম্বন্ধযুক্ত, অনুমেয় বিশিষ্টে প্রসিদ্ধ এবং সেই অনুমেয়ের অভাব স্থলে যা থাকে না সেই হেতুই অনুমাপক বা লিঙ্গ। এই লক্ষণে 'অনুমেয়' শব্দটি সাধ্যের বাচক। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে অনুমেয় শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে নানা গ্রন্থে। প্রায় ক্ষেত্রেই সাধ্য অর্থেই অনুমেয় শব্দের ব্যবহার হয়ে থাকে। অর্থাৎ যেটি সাধন করার ইছায় হেতুর প্রয়োগ হয় সেই সাধ্যই অনুমেয় হিসাবে গণ্য হয়। ধর্মকীর্তি তাঁর ন্যায়বিন্দু গ্রন্থে 'অনুমেয়' শব্দটিকে সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষ অর্থে ব্যবহার করেছেন। বিশেষত লিঙ্গের ত্রৈরূপ্য নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি যখন 'অনুমেয় সত্ত্বম্ এব' এইভাবে লিঙ্গের প্রথম বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন তখন পক্ষ অর্থেই অনুমেয় শব্দের ব্যবহার করেন তিনি। প্রশস্তপাদও এই অর্থে অনুমেয় শব্দটিকে গ্রহণ করেছেন। তাঁর কাছে

[৪৪] তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৭৮।

যে পদার্থকে সাধনের ইচ্ছা করা হয়, সেই সাধ্য ধর্মের ধর্মীই হল অনুমেয়। অর্থাৎকিনা সাধ্য ধর্ম বিশিষ্ট যে ধর্মী বা পক্ষ, সেই ধর্মী বা পক্ষই হল অনুমেয়। 'যদ্ অনুমেয়ন সম্বদ্ধং' – পদার্থধর্মসংগ্রহকৃত এই বর্ণনার অর্থ হল, যা সাধ্যধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর বা পক্ষের সঙ্গে সম্বদ্ধং বা সম্বন্ধযুক্ত অর্থাৎ সংযোগ, সমবায় কিংবা বিশেষণতা সম্বন্ধে আবদ্ধ। তাৎপর্য এই যা সাধ্যধর্ম বিশিষ্ট ধর্মীরূপ সকল পক্ষেই সংযোগাদি সম্বন্ধে থাকে, তাই লিঙ্গ। যা পক্ষের একদেশে থাকে তা লিঙ্গ হতে পারে না। লিঙ্গকে সকল পক্ষে অর্থাৎ পক্ষের সকল দেশে থাকতে হবে। লিঙ্গের এই পক্ষসত্ত্ব বৈশিষ্ট্যই ব্যক্ত হয়েছে 'অনুমেয়েন সম্বদ্ধম্' এই বর্ণনার দ্বারা। এটি 'অনুমেয়ে সত্ত্বম' ন্যায়বিন্দুর এই বর্ণনার সঙ্গে অনেকখানি সদৃশ।

'প্রসিদ্ধং চ তদন্বিতে' অর্থাৎ অনুমেয়ের সঙ্গে অন্বিত যে সব বস্তু সেই সকল বস্তুতে লিঙ্গ প্রসিদ্ধ হবে। এখানে 'তদ' অনুমেয়ের বাচক হলেও তা সাধ্যধর্মের ধর্মীকে সূচিত করে না, করে সাধ্যধর্মকে। সাধ্যধর্মের সঙ্গে যা অন্বিত বা সম্বন্ধযুক্ত অর্থাৎ সাধ্যধর্ম যেখানে বর্তমান সেখানে লিঙ্গ যে প্রসিদ্ধ হবে সেকথাই বিবক্ষিত হয়েছে এই দ্বিতীয় বর্ণনার দ্বারা। এতদ্বারা লিঙ্গের সপক্ষসত্ত্ব বৈশিষ্ট্যই সূচিত হয়। তবে সকল সপক্ষে লিঙ্গ প্রসিদ্ধ হয় না। যেমন- 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এই অনুমিতির ক্ষেত্রে সাধ্যধর্ম বহ্নির সঙ্গে অন্বিত যে অয়োগোলক তাতে ধূম প্রসিদ্ধ নয়। সুতরাং সপক্ষ মাত্রে লিঙ্গ প্রসিদ্ধ এমন দাবি করলে অব্যাপ্তি দোষ হতে পারে। একথাই বিবেচনায় রেখে প্রশস্তপাদ লিঙ্গের দ্বিতীয় ধর্মের বর্ণনা করতে গিয়ে 'চ' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। বক্তব্য এই যে লিঙ্গ যেমন অনুমেয় বা পক্ষে সম্বদ্ধ হবে তেমনই সপক্ষেও প্রসিদ্ধ হবে। এভাবে 'চ' বা 'অপি' শব্দ দ্বারা সপক্ষ মাত্রে লিঙ্গসম্বদ্ধ হবে এমন দাবি যে ভাষ্যকার করছেন তা স্পষ্ট হয়। একই উদ্দেশ্যে ধর্মকীর্তিও 'সপক্ষে এব সত্ত্বম্'

এইভাবে লিঙ্গের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। সপক্ষের একদেশে প্রসিদ্ধ হলেও কোনো লিঙ্গ যে সৎ হতে পারে এই সকল বর্ণনার দ্বারা সেকথাই বিবক্ষিত হয়েছে।

সপক্ষসত্ত্বের ন্যায় বিপক্ষাসত্ত্বও হেতুর অন্যতম একটি ধর্ম হিসাবে স্বীকৃত হয়। এই ধর্মটির বর্ণনায় ন্যায়বিন্দুকার বলেছেন– 'অসপক্ষে অসত্ত্বম্ এব'। প্রশস্তপাদও এই বিপক্ষাসত্ত্বকে লিঙ্গের একটি ধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে বলেছেন– "তদ্ভাবে চ নাস্ত্যেব"। এখানে 'তৎ' শব্দটি সাধ্যধর্ম বা অনুমেয়ের সূচক। 'তদভাবে' অর্থাৎ সাধ্যের অভাবে, 'তদ নাস্ত্যেব' অর্থাৎ সেই লিঙ্গ থাকে না। সহজ অর্থ এই যেখানে সাধ্যধর্মের অভাব থাকে সেখানে লিঙ্গ বর্তমান থাকে না। যেখানে সাধ্যধর্মের অভাব থাকে তা হল বিপক্ষ। সেই বিপক্ষে যে হেতু থাকে না, হেতুর সেই বিপক্ষাসত্ত্ব বৈশিষ্ট্যই সূচিত হয়েছে আলোচ্য অংশের দ্বারা।

এ পর্যন্ত প্রশস্তপাদ অনুসরণে লিঙ্গের লক্ষণ আলোচনা করা হয়েছে। উদয়নাচার্য তাঁর কিরণাবলীতে লিঙ্গের পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে বলেছেন– "নিরূপাধিকসাধ্য-সম্বন্ধশালি লিঙ্গমিতি"।[৪৫] এর অর্থ হল- যা কোনোরূপ উপাধি বা শর্ত ছাড়াই সাধ্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয় অর্থাৎ সাধ্যের সঙ্গে যার সম্বন্ধ অনৌপাধিক হয় তাই হল লিঙ্গ। প্রশস্তপাদকৃত লিঙ্গের লক্ষণে যে 'যদনুমেয়েন সম্বন্ধং' বর্ণনাটি রয়েছে কিরণাবলীকারের মতে তার দ্বারা এটাই সূচিত হয় যে লিঙ্গ অনুমিতিরূপ প্রমার অনুমাপক হয়। আর এর দ্বারা এটাও সূচিত হয় যে পরামৃশ্যমান লিঙ্গই অনুমান বা অনুমিতির করণ। অন্যদিকে পরামর্শ হল তার অবান্তর ব্যাপার। যদিও অধিকাংশ নৈয়ায়িক লিঙ্গ পরামর্শকে অনুমিতির করণ বলেন, তথাপি উদয়ন

[৪৫] নরেন্দ্র চন্দ্র বেদান্ততীর্থ, *কিরণাবলী*, ২০০২, পৃষ্ঠা- ৫৫৬।

পরামর্শ ব্যাপারবিশিষ্ট যে লিঙ্গ সেই জ্ঞায়মান লিঙ্গকেই অনুমান প্রমাণ বলে মানেন। কনাদরহস্যতে শঙ্কর মিশ্রও উদয়নকেই সমর্থন করেছেন।[৪৬]

২.৪.২ লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধের পরিচয়

ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অনুমিতির ভিত্তি হিসাবে প্রায় সকল সম্প্রদায় স্বীকার করে। বৈশেষিক দর্শনও তার ব্যতিক্রম নয়। যদিও ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অনুমিতির করণ হিসাবে অধিকাংশ বৈশেষিক আচার্য মানেন না। পরিবর্তে পরামৃশ্যমানলিঙ্গকে তাঁরা অনুমিতির করণ হিসাবে মানেন; তথাপি অনুমিতি যে ব্যাপ্তিজ্ঞানের অপেক্ষা রাখে সে বিষয়ে নৈয়ায়িক ও অন্যান্য দার্শনিকদের মতো বৈশেষিকও একমত। এই ব্যাপ্তি সম্বন্ধের ইঙ্গিত বা আভাস আমরা পায় কনাদের বৈশেষিক সূত্রে। সেখানে প্রকৃতলিঙ্গ বা অনুমাপকের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে– "প্রসিদ্ধিপূর্ব্বকত্বাদপদেশস্য"।[৪৭] এখানে অপদেশ হল অনুমাপকলিঙ্গ বা সৎলিঙ্গ। একটি লিঙ্গ প্রকৃতলিঙ্গ বা সৎলিঙ্গ বলে বিবেচিত যদি তা প্রসিদ্ধি পূর্বক হয় অর্থাৎ সাধ্যের সঙ্গে তার ব্যাপ্তি প্রসিদ্ধ হয়। যদি সাধ্যের সঙ্গে তার ব্যাপ্তি সিদ্ধ না হয় তাহলে তা প্রকৃত লিঙ্গ হতে পারে না এবং তা থেকে অনুমান হতেও পারে না। লিঙ্গজ্ঞান ব্যাপ্তিজ্ঞান পূর্বক হয়েই হতে পারে। যে পর্যন্ত ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষ সিদ্ধ নয় সেই পর্যন্ত একটি হতে অন্যটির অনুমানও সিদ্ধ হতে পারে না। অন্যভাষায়, যেখানে কোনো বিষয় ব্যাপ্তিবিশিষ্ট না হয়েই লিঙ্গ হিসাবে উপস্থাপিত হয় সে লিঙ্গ মিথ্যালিঙ্গ যাকে অনপদেশ বলা বলা হয়। এইরকম দুষ্টলিঙ্গ দ্বারা অনুমান করলে সেই অনুমানও দোষযুক্ত হয়। যেমন ধূম থেকে বহ্নির অনুমান অদুষ্ট কারণ

---

[৪৬] "...পরামৃশ্যমানং বা তদেবানুমিতিকরণম্", পণ্ডিত বিন্দেশ্বরী প্রসাদ, *কণাদরহস্য,* ১৯১৭, পৃষ্ঠা- ৯৩।

[৪৭] *বৈশেষিকসূত্র-* ৩/১/১৪।

বহ্নির সঙ্গে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হয়েই ধূম এখানে অনুমাপক হয়। কিন্তু ধূম থেকে জলের অনুমান দুষ্ট। কারণ জলের সঙ্গে ধূম ব্যাপ্তিবিশিষ্ট নয়। একমাত্র গৃহীতব্যাপ্তিকলিঙ্গই প্রকৃতলিঙ্গ। একমাত্র প্রসিদ্ধপূর্বক বা গৃহীতব্যাপ্তিকলিঙ্গই সৎ লিঙ্গ।

অপ্রসিদ্ধলিঙ্গ অর্থাৎ যা গৃহীতব্যাপ্তিক নয় তা যে প্রকৃতলিঙ্গ নয় তা স্পষ্ট করতে গিয়ে কণাদ আরও বলেছেন – "অপ্রসিদ্ধহোনপদেশোহসন্ সন্ধিগ্ধশ্চানপদেশঃ"।[৪৮] বক্তব্য এই যে ব্যাপ্তি প্রসিদ্ধি নেই অর্থাৎ প্রত্যক্ষের দ্বারা ব্যাপ্তি সিদ্ধ নয় যে হেতুর তা হল অনপদেশ অর্থাৎ হেত্বাভাস। ব্যাপ্তির সিদ্ধি একমাত্র প্রত্যক্ষের দ্বারাই হতে পারে। যেখানে প্রত্যক্ষের দ্বারা ব্যাপ্তি সিদ্ধ নয় সেখানে হেতু হেতু হিসাবে প্রমাণিত নয় এবং সেই হেতুর দ্বারা অনুমান ব্যর্থ হতে বাধ্য। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে লিঙ্গ কেবল প্রসিদ্ধপূর্বক বা গৃহীতব্যাপ্তিক হওয়ায় যথেষ্ট নয়, তাকে স্মর্য্যমাণ হতে হবে। এই বিষয়ে উপস্কার টীকাকার শঙ্কর মিশ্র বলেছেন "প্রসিদ্ধিঃ স্মর্য্যমাণা ব্যাপ্তিঃ....."[৪৯] অর্থাৎ সেই হেতুই প্রসিদ্ধ যে হেতুর ব্যাপ্তি স্মর্য্যমাণ। পূর্বে ব্যাপ্তি গৃহীত হওয়ার সত্ত্বেও যদি তা স্মৃতিজ্ঞানের বিষয় না হয় তাহলে উপনয়াদি ব্যাহত হবে এবং অনুমিতি জ্ঞান উৎপন্ন পারে না। সুতরাং যা গৃহীত ব্যাপ্তিক হয়েও স্মর্য্যমাণ হয় বা স্মৃতিজ্ঞানের বিষয় হয় তাই প্রকৃত লিঙ্গ।

অনুমানকে লৈঙ্গিক জ্ঞান এবং লিঙ্গকে প্রসিদ্ধপূর্বক বলার দ্বারা অনুমিতি জ্ঞানে ব্যাপ্তির আবশ্যকতা নির্দেশ করলেও বৈশেষিক স্পষ্টভাবে ব্যাপ্তির পরিচয় প্রদান করেননি বা ব্যাপ্তি বাচক কোনো শব্দের উল্লেখ করেননি। প্রশস্তপাদই বৈশেষিক পরম্পরায় প্রথম ব্যাপ্তি বাচক

---

[৪৮] তদেব, ৩/১/১৫।

[৪৯] আচার্য দুণ্ডিরাজ শাস্ত্রী, *বৈশেষিকসূত্রোপস্কারঃ*, ২০০২, পৃষ্ঠা- ২০৬।

শব্দের প্রয়োগ করেছেন। ব্যাপ্তিকে বোঝাতে পদার্থধর্মসংগ্রহে 'বিধি', 'সময়', ও 'সহচারী' শব্দের প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেছেন যথায় ধূম তথায় অগ্নি, অগ্নির অভাবে ধূমও থাকে না এইরূপ বিধি বা প্রসিদ্ধ সময় (অর্থাৎ ব্যাপ্তি) নিশ্চয় যার হয়েছে সেই পুরুষের ধূমের অসন্ধিগ্ধরূপে জ্ঞান এবং ধূম ও বহ্নির সাহচর্য অনুসরণ করে অধ্যবসায় হয়। এইভাবে সর্বত্র এক পদার্থে অপর যে পদার্থের দৈশিক বা কালিক সম্বন্ধ থাকে তাদের মধ্যে এক পদার্থ অন্য পদার্থের লিঙ্গ হয়।

প্রতিবন্ধ ব্যাপ্তির লক্ষণ নিরূপণ করতে গিয়ে উদয়নাচার্য তাঁর কিরণাবলীতে 'অনৌপাধিক সম্বন্ধে'র কথা বলেছেন।[৫০] যে সম্বন্ধ সকল প্রকার উপাধিমুক্ত (Unconditional) তাই অনৌপাধিক সম্বন্ধ। যে সম্বন্ধ কাল, দেশ বা অন্য কোনো শর্তের উপর নির্ভর করে না সেই সম্বন্ধই অনৌপাধিক বা ব্যাপ্তি। কণাদরহস্যকার 'অব্যভিচরিত সম্বন্ধ'কে ব্যাপ্তি বলেছেন। তবে কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতির স্থলে সাধ্যাভাবযুক্ত ব্যভিচারের প্রদর্শন সম্ভব না হওয়ায় অব্যভিচরিত নিশ্চয় হয় না। সে কারণে কেবলান্বয়ীসাধ্যক স্থলে কেবল সম্বন্ধকেই ব্যাপ্তি বলেন তিনি। কিরণাবলীকার প্রদত্ত অনৌপাধিক সম্বন্ধের অন্তর্গত উপাধির পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে রহস্যকার বলেছেন যা সাধ্যের ব্যাপক এবং সাধনের অব্যাপক তাকেই উপাধি বলে।[৫১]

---

[৫০] "ননু কোহয়ং প্রতিবন্ধৌ নাম? অনৌপাধিকঃ সম্বন্ধঃ ইতি ব্রূমঃ"- নরেন্দ্রচন্দ্র বেদান্ততীর্থ, *কিরণাবলী*, ২০০২, পৃষ্ঠা- ৫৫৬।

[৫১] "যদ্বা অনৌপাধিকঃ সম্বন্ধো ব্যাপ্তিঃ। ননুপাধিঃ সাধ্যব্যাপকত্বে সতি সাধনাব্যাপকঃ"- পণ্ডিত বিন্দেশ্বরী প্রসাদ, *কণাদরহস্য*, ১৯১৭, পৃষ্ঠা- ৯৭।

উপস্কার টীকাকার শঙ্কর মিশ্র ব্যাপ্তি কী তা বলতে গিয়ে ব্যাপ্তি কী নয় তা স্পষ্ট করেছেন। প্রথমেই তিনি স্পষ্ট করে দেন যে মীমাংসা সম্মত ব্যভিচার রহিত সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি বলা যায় না। 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' স্থলে বহ্নির অত্যন্তাভাব স্থলে অর্থাৎ জলাশয়ে বর্তমান যে মীন, শৈবালাদি তার আশ্রয়ত্ব ধূমে থাকে না এই হল অব্যভিচার। সহজকথায় সাধ্যের অভাবের অধিকরণে হেতুর না থাকাই অব্যভিচার। কিন্তু 'ঘটঃ বাচ্যং প্রমেয়ত্বাৎ' ইত্যাদি স্থলে সাধ্য বাচ্যত্বের অভাবের অধিকরণ কোনো পদার্থই হতে পারে না। সহজকথাই কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতির স্থলে এই লক্ষণ প্রযুক্ত হয় না। একইভাবে সিংহ-ব্যাঘ্র ব্যাপ্তি লক্ষণেরও খণ্ডন করেন শঙ্কর মিশ্র। "সাধ্যাসামানাধিকরণ্যানধিকরণত্বম্"[৫২] এবং "সাধ্যবৈয়ধি-করণ্যানধিকরণত্বম্"[৫৩] উভয় ক্ষেত্রেই সাধ্যের অনধিকরণ বা বৈয়ধিকরণ থাকা দরকার। কিন্তু উভয় লক্ষণই কেবলান্বয়ী সাধ্যের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়। সাধ্য বহ্নির অনাশ্রয় বা অনধিকরণ জলাশয়ে ধূম না থাকায় সাধ্যানধিকরণতানধিকরণত্ব ধূমে থাকে কিন্তু কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতির ক্ষেত্রে সাধ্যানধিকরণ বা সাধ্যাবৈয়ধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় লক্ষণদ্বয়ের সমন্বয় হয় না। এমনকি 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' স্থলেও কোনো এক মহানসীয় বহ্নির অনাধার পর্বতে ধূম উপস্থিত থাকাই অব্যাপ্তি দোষ হয়। কারণ মহানসীয় বহ্নি মহানসে থাকে তা পর্বতে থাকে না তাই পর্বত সাধ্য মহানসীয় বহ্নির অনধিকরণ। অথচ তা কিন্তু হেতু ধূমের অধিকরণ অর্থাৎ কিনা সাধ্যাসামানাধিকরণ নিরূপিত অধিকরণত্বই ধূমে থাকার ফলে লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ায় অব্যাপ্তি দোষ হয়।

---

[৫২] শ্রী কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, *তত্ত্বচিন্তামণি*, ২০১০, পৃষ্ঠা-৪৯।

[৫৩] তদেব।

বৌদ্ধ সম্মত অবিনাভাব ব্যাপ্তি লক্ষণও খণ্ডন করেছেন 'উপস্কার' টীকাকার। তাঁর প্রশ্ন অবিনাভাব কথার অর্থ কী? এটি কি - ১) সাধ্য ছাড়া হেতুর অনুপস্থিতিকে বোঝায়, নাকি ২) অবিনা-সাধ্যের সম্বন্ধ যেখানে রয়েছে সেখানে হেতুর উপস্থিতিকে? এমন অনেক ক্ষেত্রেই গর্ধভ না থাকলে ধূম থাকে না, আবার গর্ধভ থাকলে ধূম থাকে। এমতাবস্থায় বৌদ্ধ মত মানলে ধূম ও রাসভের মধ্যে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ স্বীকার করতে হবে। এই আপত্তি দূর করতে যদি বৌদ্ধ নিয়মিত ব্যতিরেক ও নিয়মিত অন্বয়কে অবিনাভাবের অর্থ করেন, তাহলে গাভি ও ধূমের স্বতন্ত্রভাবে অন্বয়ব্যতিরেক না থাকায় তাদের ব্যাপ্তি নেই বলতে হয়। কিন্তু তা বৌদ্ধ বলতে পারে না কারণ, সেকথা বলতে গেলে প্রথমেই নিয়ম বা ব্যাপ্তি কী তা বলতে হবে। সহজকথায় পূর্বে নিয়ম বা ব্যাপ্তি নির্ধারণ না করে অবিনাভাব এর ব্যাখ্যা হতে পারে না।

শুধু যে পরতন্ত্রের ব্যাপ্তি লক্ষণ শঙ্কর মিশ্র দ্বারা খণ্ডিত হয়েছে তাই নয়, এমনকি সমানতান্ত্রিক নৈয়ায়িক আচার্যদের বহু লক্ষণও খণ্ডন করেছেন তিনি। যেমন ন্যায়লীলাবতীকার বল্লভাচার্য ব্যাপ্তিকে "কাৎর্স্ন্যেন সম্বন্ধ"[৫৪] বলে অভিহিত করেন। কাৎর্স্ন্যেনের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে সম্বন্ধ থাকে। এর দ্বারা যদি সম্পূর্ণ সাধ্যের সঙ্গে সাধনের সম্বন্ধ বিবক্ষিত হয়, তাহলে তা ধূমের ক্ষেত্রে পাওয়া যাবে না। কারণ ধূম বহ্নির ব্যাপ্তি হল বিষমব্যাপ্তি। এখানে বহ্নির সকল অধিকরণে ধূম উপস্থিত থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, বহ্নির অধিকরণ যে অয়োগোলক তার সঙ্গে ধূমের সম্বন্ধ নেই। আর যদি এর দ্বারা সম্পূর্ণ সাধন বা হেতুর সাধ্যের সাথে সম্বন্ধ সূচিত হয় তাহলেও তাও পাওয়া সম্ভব নয়। কেননা, একটি সাধ্যের সম্পূর্ণ হেতুর সাথে সম্বন্ধ থাকতে পারে না। যেমন মহানসীয় যে বহ্নি সকল ধূমের

[৫৪] হরিহর শাস্ত্রী, *ন্যায়লীলাবতী*, ১৯৯১, পৃষ্ঠা- ৪৯৬।

সঙ্গে তার সম্বন্ধ নেই। পর্বতীয় ধূম বা চত্বরীয় ধূমের সঙ্গে মহানসীয় বহ্নির সম্বন্ধ থাকে না। আর যদি সম্পূর্ণ সাধ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ হেতুর সম্পর্ক 'কৃৎস্ন' শব্দের দ্বারা সূচিত হয় তাহলে কোনো ক্ষেত্রেই ওই সম্বন্ধ সম্ভব হবে না। বিশেষত বিষম ব্যাপ্তির কোনো ব্যাখ্যা সেক্ষেত্রে দেওয়া যাবে না। একইভাবে ''স্বাভাবিকসম্বন্ধ ব্যাপ্তি''[৫৫]- বাচস্পতির এই মতও খণ্ডন করেছেন উপস্কারকার। সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ বহ্নি নিরূপিত ধূমে স্বাভাবিক – একথাই বলতে চেয়েছেন বাচস্পতি। আর বহ্নিতে ধূমের সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ স্বাভাবিক না হওয়ায় (কারণ সেখানে আর্দ্রেন্ধন সংযোগটি উপাধি) অতিব্যাপ্তির আশঙ্কাও থাকে না। উপস্কারকার প্রশ্ন তোলেন এখানে স্বাভাবিক কথার অর্থ কী? স্বাভাবিক – স্বভাব থেকে উৎপন্ন । এই স্বভাবের অর্থ নিজ ভাব হতে পারে আবার স্বসরূপভাবও হতে পারে। এখানে যদি 'স্বভাব' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হিসাবে জন্যতা বা উৎপত্তি অর্থকে গ্রহণ করা যায়, তাহলে নিত্য ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে ওই লক্ষণ যাবে না। আর যদি স্বভাবকে আশ্রিত অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে সমবায়ের ক্ষেত্রে অব্যাপ্তি দোষ দেখা দেবে কারণ সমবায় কোথাও আশ্রিত হয় না।

এমনকি অনৌপাধিক সম্বন্ধ হিসাবে ব্যাপ্তির যে লক্ষণ কিরণাবলীকার উদয়ন প্রদান করেছেন সেটিও খণ্ডন করেছেন শঙ্কর মিশ্র। তাঁর যুক্তি প্রথমত উপাধির স্বরূপই নির্দেশ করা যায় না। কারণ উপাধি বলতে তাকেই বোঝায় যার নিজের অধিকরণে সাধ্যের অধিকরণতা আছে (যা সাধ্যের অধিকরণে বর্তমান) কিন্তু সাধনের যতগুলি অধিকরণ আছে ততগুলি অধিকরণে যা নেই। স্বঃ পদ ঘটিত হওয়ার কারণে এবং অনুগত না হওয়ার কারণে এরকম উপাধি দূর্বচ বা বচনের অযোগ্য বলে উপস্কারকার মনে করেন। যদি কোনো প্রকার তাকে

[৫৫] *ন্যায়বার্ত্তিকতাৎপর্যটীকা* – ১/১/৫।

অনুগত বলে মানা হয় তাহলে 'দ্রব্যং সত্ত্বাৎ' এইরকম অনুমিতির ক্ষেত্রে গুণবত্বকে উপাধি বলতে গেলে দ্রব্যত্বের যতগুলি আশ্রয় আছে ততগুলি আশ্রয়ে যে গুণবত্ব আছে তা প্রমাণ করতে হবে (তা না হলে তাকে সাধ্যের ব্যাপক বলা যাবে না)। কিন্তু গুণবত্ব আছে কিনা তার নিশ্চয় সহস্র বছরেও নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। এজন্য শঙ্কর মিশ্র মনে করেন, উপাধি স্বরূপ যদি গ্রহণ করা হয়ও তথাপি অন্যোন্যাশ্রয় দেখা দেয়। কারণ সাধ্যের ব্যাপক হয়ে কোনো কিছু সাধনের অব্যাপক কিনা তার নির্ধারণও ব্যাপ্তিজ্ঞান সাপেক্ষ। একইভাবে অনৌপাধিক তত্ত্বের জ্ঞান উপাধিজ্ঞানের অধীন।

কোনো কোনো নৈয়ায়িক 'সম্বন্ধ' মাত্রকে[৫৬] ব্যাপ্তি বলে বর্ণনা করেছেন। এই একদেশী নৈয়ায়িক মতও খণ্ডন করেছেন শঙ্কর মিশ্র। তিনি মনে করেন সম্বন্ধ মাত্রকে ব্যাপ্তি বললে 'দ্রব্যং সত্ত্বাৎ' ইত্যাদি ক্ষেত্রে সত্ত্বাবত্বের সঙ্গে দ্রব্যের সম্বন্ধ থাকায় তাকে ব্যাপ্তি বলতে হয়। এবং সেক্ষেত্রে ব্যভিচারী হেতুতে ব্যাপ্তি লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়। এমনকি সাধনের আশ্রয়ে অত্যন্তাভাব অপ্রতিযোগী সাধ্যের অধিকরণে উপস্থিতিও ব্যাপ্তি হতে পারে না বলে মনে করেন উপস্কার টীকাকার। কারণ তাঁর মতে ধূমের অধিকরণে বর্তমান অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী না হয়ে বহ্নি তার প্রতিযোগীও হতে পারে না। যেমন মহানস ও পাকশালা ধূমের অধিকরণ হলেও তাতে পর্বতীয় বহ্নির প্রতিযোগী হতে বাধা নেই। অবশ্য এই লক্ষণের সংশোধিত রূপটি যে দোষ শূন্য হতে পারে সেকথাও স্বীকার করেন তিনি।

---

[৫৬] "তৎপূর্বকমিত্যনেন লিঙ্গলিঙ্গিনোঃ সম্বন্ধদর্শনং। লিঙ্গদর্শনংসংবধ্যতে"- অনন্তলাল ঠাকুর, *ন্যায়দর্শনম্*, ২০১৪, পৃষ্ঠা- ২৯১।

এইভাবে পূর্বপক্ষীর মত খণ্ডনের অনন্তর শঙ্কর মিশ্র ব্যাপ্তির নিজকৃত লক্ষণ প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন "উপাধি রহিত সম্বন্ধই ব্যাপ্তি"।[৫৭] আপাত দৃষ্টিতে এই লক্ষণ উদয়নকৃত লক্ষণের সঙ্গে অভিন্ন। আর কিরণাবলীকারের সেই লক্ষণ যে সঠিক নয় সেকথা উপস্কারকার পূর্বেই বলেছেন। সুতরাং তাঁর এই অভিমত স্ববিরোধী বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে 'অনৌপাধিক' শব্দটি একটি স্বতন্ত্র অর্থে ব্যবহার করেছেন তিনি। হেতুর ব্যভিচারী যতগুলি পদার্থ আছে তাদের ব্যভিচারী সাধ্যের সঙ্গে এক আশ্রয়ে বা সামানাধিকরণ্যই এখানে অনৌপাধিকত্ব।[৫৮] 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' ইত্যাদি অসদ্ধেতুর ক্ষেত্রে হেতু বহ্নির ব্যভিচারী আর্দ্রেন্ধন সংযোগ সাধ্য ধূমের সঙ্গে ব্যভিচারী না হওয়ার কারণে অনৌপাধিক হয় না। তাই অনৌপাধিকত্বকে ব্যাপ্তির লক্ষণ হিসাবে গণ্য করলে 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' অনুমিতির স্থলে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। তা সত্ত্বেও যদি কেও 'দ্রব্যং বিশিষ্ট সত্তাত্বাদ্' এই জাতীয় অনুমিতির ক্ষেত্রে অব্যাপ্তির আশঙ্কা করেন তাহলে অনৌপাধিকত্বের দ্বিতীয় একটি অর্থ করবেন গ্রন্থকার। এই অর্থে "হেতুর যত গুলি অত্যন্তাভাব আছে সেইসব অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগীগুলি যেখানে প্রতিযোগী হয় ওই অত্যন্তাভাবের অধিকরণগুলিতে বর্তমান যে সাধ্যের উপস্থিতি তাই অনৌপাধিকত্ব"।[৫৯] যেমন– ধূমের অধিকরণে বর্তমান ঘটাদির অভাবের প্রতিযোগী হল ঘটাদি; সেই ঘটাদি যেখানে থাকে তার অত্যন্ত্যাভাবের আশ্রয় পর্বতাদিতে বর্তমান বহ্নিরূপ সাধ্যের অধিকরণে ধূম বর্তমান থাকে। এইরকম পক্ষে নিরূপক ধর্ম ও

---

[৫৭] "অনৌপাধিকঃ সম্বন্ধো ব্যাপ্তিঃ", তদেব, পৃষ্ঠা- ২১২।

[৫৮] "অনৌপাধিকত্বন্তু যাবৎস্বব্যভিচারিব্যভিচারিসাধ্যসামানাধিকরণ্যং", তদেব।

[৫৯] "যাবৎস্বসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিপ্রতিযোগিকাত্যন্তাভাবসমানাধিকরণসাধ্যসামানাধিকরণ্যং", তদেব।

নিয়ামক ধর্ম ভিন্ন হওয়ায় ওই ব্যাপ্তি লক্ষণে কোনো দোষ আসেনা। এই দ্বিবিধ লক্ষণের নিষ্কৃষ্ট অর্থ এই হেতুর অব্যাপক যতগুলি পদার্থ আছে তাদের অব্যাপ্য সাধ্যের অধিকরণে থাকাই অনৌপাধিকত্ব।[৬০]

'উপস্কারে'র ন্যায় 'কণ্ঠাভরণে'ও 'কাৎর্স্নেন সম্বন্ধ', 'স্বাভাবিক সম্বন্ধ', 'অনৌপাধিক সম্বন্ধ', 'অবিনাভাব সম্বন্ধ', 'অব্যভিচারি সম্বন্ধ' যে ব্যাপ্তি নয় তা স্পষ্ট করার পর শঙ্কর মিশ্র ''সাধনসমানাধিকরণ যাবদ্ ধর্ম নিরূপিত বৈয়ধিকরণ্য সাধ্যসামানাধিকরণ্যম্''[৬১] এই ব্যাপ্তির লক্ষণও পরিহার করেছেন। পূর্বপক্ষীর মত খণ্ডনের অনন্তর ব্যাপ্তির তিনটি লক্ষণ প্রদান করেছেন শঙ্কর মিশ্র। ওই লক্ষণগুলি যথাক্রমে –

১) সাধনসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিসাধ্যসামানাধিকরণত্বম্,[৬২]

২) সাধনবন্নিষ্ঠান্যোহন্যাভাবাপ্রতিযোগিসাধ্যবতকত্বম্,[৬৩]

৩) সাধনসমানাধিকরণধর্মনিরূপিতবৈয়াধি-করণ্যানধিকরণসাধ্যসামানাধিকরণ্যম্।[৬৪]

ন্যায়লীলাবতীতে বল্লভাচার্য লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধকে বোঝানোর জন্য 'নিয়ম', 'প্রতিবন্ধ', 'ব্যাপ্তি' এই তিনটি শব্দই ব্যবহার করেছেন। অনুমানের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠার অনন্তর ন্যায়লীলাবতীকার বল্লভাচার্য 'কা ব্যাপ্তিঃ' এইভাবে ব্যাপ্তি বিষয়ে জিজ্ঞাসার অবতারণা করে

---

[৬০] "সাধনসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিসাধ্যসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ", তদেব পৃষ্ঠা- ২১৩।

[৬১] হরিহর শাস্ত্রী, *ন্যায়লীলাবতী*, ১৯৯১, পৃষ্ঠা- ৪৯৭।

[৬২] তদেব, পৃষ্ঠা – ৫০১।

[৬৩] তদেব।

[৬৪] তদেব।

ব্যাপ্তির নিরূপণ করেছেন এইভাবে – "সাধনস্য সাধ্যসাহিত্যং কাৎর্স্ন্যেন ন পুনরনুপাধিত্বং..."[৬৫] অর্থাৎ সাধন হেতুর সঙ্গে সমগ্র সাধ্যের সহচর্যই ব্যাপ্তি। সেই সঙ্গে যুগপৎ তিনি অনৌপাধিকত্ব ও উপাধিরহিতত্ব ইত্যাদি ব্যাপ্তি লক্ষণের খণ্ডনও করেছেন। ব্যোমশিবাচার্য ব্যাপ্তির লক্ষণ করতে গিয়ে প্রশস্তপাদ ব্যবহৃত 'বিধি' শব্দটিকে গ্রহণ করেছেন। পদার্থধর্মসংগ্রহে প্রশস্তপাদ বলেছেন "বিধিস্তু যত্র ধূমস্তত্রাগ্নিরগ্ন্যভাবে..."।[৬৬] এখানে 'বিধি' শব্দটির দ্বারা 'অবিনাভাব' সম্বন্ধ সূচিত হয় বলে দাবি করেছেন ব্যোমশিবাচার্য।

২.৪.৩ ব্যাপ্তিগ্রহ প্রসঙ্গ

ব্যাপ্তিগ্রহের উপায় স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়নি কণাদ সূত্রে তবে এটি এর কার্য বা কারণ, সংযোগী, বিরোধী, সমবায়ী– এইভাবে লৈঙ্গিকজ্ঞান হতে পারে এই কথা ব্যক্ত করে কার্য-কারণ, সংযোগ, বিরূদ্ধভাব, সমবায় ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার দ্বারা যে ব্যাপ্তিজ্ঞান হয় এবং তদ্‌জন্য যে অনুমিতি জ্ঞান হয় তার একটা সুচনা সূত্রকার করেছেন। তবে কার্য কারণাদির উল্লেখ শুধুমাত্র লিঙ্গ-লিঙ্গীকের কয়েকটি দৃষ্টান্তকে নির্দেশ করে মাত্র। এতদ্বারা যে সকল ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিগ্রহণ ও লৈঙ্গিক সম্পন্ন হয় না সেকথা প্রশস্তপাদও স্বীকার করেন। এমন ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে কার্য-কারণাদির দ্বারা ব্যাপ্তি গৃহীত হয় না, তা সত্ত্বেও অনুমিতি হয় অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে যে কার্যকারণাদির দ্বারাই ব্যাপ্তিগ্রহ হবে তার কোনো নিয়ম নেই। এ বিষয়ে প্রশস্তপাদের বক্তব্য– "ব্যতিরেকদর্শনাৎ"[৬৭] অর্থাৎ কার্যাদির ব্যতিরেকেও ব্যাপ্তি দর্শনের

---

[৬৫] তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৯৬।

[৬৬] পণ্ডিত দূর্গাধর ঝা-শর্মা, *প্রশস্তাপাদভাষ্যম্*, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা- ৪৯১।

[৬৭] তদেব, পৃষ্ঠা- ৫০৪।

অনুমান হয়। যেমন – অধ্বর্যু শ্রবণ করিয়ে দূরস্থিত হোতার অনুমান হয় অর্থাৎ সোমযাগের সময় অধ্বর্যু উচ্চারণ করলে তারপর হোতা দেবতার গুণকীর্তন করেন। অধ্বর্যু ও শ্রাবণ হোতাকেই নির্দেশ করে এই জ্ঞান যার আছে তিনি ব্যবধানে থাকা হোতার অনুমান অধ্বর্যু থেকেই করতে পারেন। এখানে অধ্বর্যু হোতার কার্য কারণাদি কোনটিই নয়। একইভাবে চন্দ্রের উদয় দেখে সমুদ্রের বৃদ্ধির বা কুমুদের দলগুলির প্রসারিত হওয়া অনুমান; যদিও এদের কোনটি অন্যটির কার্য বা কারণ, সংযোগী বা বিরোধী বা সমবায়ী নয়। সুতরাং শুধুমাত্র কার্য কারণাদির দ্বারা প্রসিদ্ধি বা ব্যাপ্তির গ্রহণ হতে পারে না ।

ব্যাপ্তিগ্রহণ কীভাবে হবে তার স্পষ্ট নির্দেশ প্রশস্তপাদ করেছেন " বিধিস্তু যত্র ধূমস্তত্রাগ্নিরগ্ন্যভাবে ধূমোহপি ন ভবতীত্যেবং প্রসিদ্ধসময়স্যাসন্দিগ্ধধূমদর্শনাৎ সাহচর্যা-নুস্মরণাৎ তদনন্তরমগ্ন্যধ্যবসায়ো ভবতীতি"[৬৮] ইত্যাদি সন্দর্ভে। এর দ্বারা ভাষ্যকার একথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে ব্যাপ্তিজ্ঞানের উপায় হল 'বিধি' বা 'নিয়ম'। এই নিয়ম আসলে যেখানে হেতু সেখানে সাধ্য এবং যেখানে সাধ্যাভাব সেখানে হেতুর অভাব এই অন্বয়ব্যতিরেক সহচারদর্শন বা ভূয়োদর্শন। যেমন– যেখানে ধূম সেখানে বহ্নি বহ্নির অভাবে ধূমেরও অভাব– এইরূপ যে প্রসিদ্ধি বা প্রত্যক্ষ তার দ্বারাই ব্যাপ্তি সিদ্ধ হয়।

অনৌপাধিক সম্বন্ধের প্রতিষ্ঠা কীভাবে হয় তা নির্দেশ করতে গিয়ে বৌদ্ধের তাদাত্ম্য ও তদুৎপত্তির দ্বারা যে তা হয় না সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন উদয়নাচার্য। সহচারজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে তদুৎপত্তি ও তাদাত্ম্যের ভূমিকা রয়েছে তা অস্বীকার করেননি তিনি। কিন্তু উপাধি দর্শনবশত বা উপাধি শঙ্কার কারণে ব্যভিচার শঙ্কা দেখা যেতেই পারে। তাছাড়া তদুৎপত্তি

---

[৬৮] তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৯১।

ছাড়াই ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ দ্বারাই সহচারজ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে। আর ব্যভিচারের আশঙ্কাও যোগ্যানুপলব্ধির দ্বারা দূর হতে পারে। স্বাভাবিক সম্বন্ধের জ্ঞান হলে এবং বিপক্ষের কাছে কোনো প্রমাণ না থাকলে ব্যভিচার শঙ্কার সমাপ্তি হয়ে যায়। স্বাভাবিক সম্বন্ধ একটি ব্যাপক সম্বন্ধ যার তুলনায় তদুৎপত্তি, তাদত্ম্য এগুলি অব্যাপক। তাদাত্ম্য ও তদুৎপত্তির উপযোগিতা অস্বীকার না করেও সেগুলি যে সর্বত্র ব্যাপ্তি সম্বন্ধের ব্যাখ্যা দিতে পারে না তার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে রসের দ্বারা রূপের অনুমানের উল্লেখ করেছেন। এখানে দুইয়ের মধ্যে তাদত্ম্য ও তদুৎপত্তি কোনটিই নেই অথচ একটির দ্বারা অপরটির অনুমান সম্ভব হয়। এভাবে ব্যাপ্যব্যাপ্যক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠায় যে তাদাত্ম্য ও তদুৎপত্তি সম্ভব নয় তা উল্লেখের পর নিরুপাধিকরণ বা উপাধিনিরাশকেই ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠার উপায় বলে মেনেছেন উদয়ন।

ন্যায়কন্দলীকার শ্রীধর ব্যাপ্তিগ্রহের উপায় হিসাবে তদুৎপত্তি ও তাদাত্ম্যের অপর্যাপ্ততা প্রদর্শনের পর স্বভাব দ্বারা কোনো বস্তুর অন্য বস্তুর যে সম্বন্ধ স্থাপিত তা উপাধিশূন্য হওয়ার জন্যই নিয়ম হয়– এ অভিমত প্রকাশ করেছেন। উপাধির অপসারণ ঘটলে ঔপাধিক সম্বন্ধের অবসান হয় কিন্তু স্বাভাবিক সম্বন্ধে কখনই সম্বন্ধের অবসান হয় না। সহভাব অর্থাৎ সহচার প্রত্যক্ষ থেকে উৎপন্ন সংস্কারের সাহায্যেই ব্যভিচার শঙ্কা রহিত চরম প্রত্যক্ষের দ্বারা ধূম সামান্যে বহ্নি সামান্যের স্বাভাবিক সামানাধিকরণ্যের নিশ্চয় হয়। এইভাবেই এই ধূম এই বহ্নির সঙ্গে নিয়ত – এইরূপ ব্যাপ্তি নিয়মের জ্ঞান হয়।

২.৫ সাংখ্য-যোগে ব্যাপ্তি

২.৫.১ অনুমান পরিচয়

ন্যায় দর্শনের মতো সাংখ্য দর্শনেও পাঁচটি অবয়ব বাক্যের বা ন্যায়বাক্যের কথা বলা হয়েছে। সাংখ্য মতে এই পঞ্চ অবয়বাক্যের দ্বারাই আমরা সুখাদি পদার্থের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে থাকি।[৬৯] এই ন্যায়বাক্য তথা অনুমানের লক্ষণ দিতে গিয়ে মহর্ষি কপিল তাঁর সাংখ্যসূত্রে বলেছেন- "প্রতিবন্ধদৃশঃ প্রতিবদ্ধজ্ঞানমনুমানম্"।[৭০] সূত্রস্থ 'প্রতিবন্ধ' শব্দের অর্থ ব্যাপ্তি আর 'দৃশ' শব্দের অর্থ জ্ঞান। কাজেই সূত্রের সমগ্র অর্থ এইরূপ- ব্যাপ্তিজ্ঞান সম্পন্ন পুরুষের যে ব্যাপ্ত দর্শনের পর ব্যাপকের জ্ঞান হয় তাই অনুমান। আবার সাংখ্য দর্শনে যে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব স্বীকৃত হয়েছে সেই পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের জ্ঞান লাভের উপায় নির্দেশ করতে গিয়ে ঈশ্বরকৃষ্ণ ত্রিবিধ প্রমাণের কথা বলেছেন – প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্তবচন।[৭১] যেহেতু অনুমান প্রত্যক্ষ পূর্বক তাই প্রথমেই দৃষ্ট প্রত্যক্ষের উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর বহুবাদী সম্মত অনুমানের কথা বলা হয়েছে। প্রথমে অনুমানের ত্রৈবিধ্যের কথা বললেও বিশেষের জ্ঞান যেহেতু সামান্য জ্ঞানের অধীন তাই অনুমান বিশেষের পরিচয় পূর্বে অনুমান সামান্যের পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেছেন– "তৎ লিঙ্গলিঙ্গিপূর্বকম্"[৭২] অর্থাৎ অনুমান হল লিঙ্গ-লিঙ্গী পূর্বক জ্ঞান। সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদিকারও লিঙ্গলিঙ্গি পূর্বক জ্ঞান হিসাবে অনুমানের পরিচয়

---

[৬৯] "পঞ্চাবয়বযোগাৎ সুখসংবিত্তিঃ"- সাংখ্যসূত্র- ৫/২৭।

[৭০] তদেব, ১/১০০।

[৭১] সাংখ্যকারিকা- ৪।

[৭২] তদেব- ৫।

দিয়েছেন।[৭৩] লিঙ্গ হল জ্ঞাপক চিহ্ন যা অপ্রত্যক্ষ অর্থে অনুমাপক হয়। সহজ কথায় যা লিনের জ্ঞাপক তাই লিঙ্গ। পক্ষান্তরে লিঙ্গ যে লিনের জ্ঞাপক তা হল লিঙ্গী। যেমন– ধূম ও বহ্নির সম্বন্ধের ক্ষেত্রে ধূম হল লিঙ্গ এবং বহ্নি হল লিঙ্গী। লিঙ্গীকে বাদ দিয়ে লিঙ্গ কখনই থাকে না। তাই লিঙ্গ-লিঙ্গী হল লিঙ্গের ব্যাপক আর লিঙ্গ হল লিঙ্গীর ব্যাপ্য। এখানে ব্যাপ্তির আশ্রয় ব্যাপ্যই লিঙ্গ এবং ব্যাপ্তির নিরূপক ব্যাপকই লিঙ্গী। ব্যাপ্তিবিশিষ্ট ধূমাদি ব্যাপ্য এবং ব্যাপ্তিনিরূপক বহ্ন্যাদি ব্যাপক। ধূমাদি ও বহ্নাদির ব্যাপ্যব্যাপকভাব বা ব্যাপ্তি স্বাভাবিক অর্থাৎ সার্বকালিক হলেও সর্বদা অনুমিতি হয় না। যেহেতু ব্যাপ্যব্যাপকভাব বা ব্যাপ্তি অনুমিতির কারণ নয়। ব্যাপ্তির জ্ঞানই অনুমিতির কারণ হয়। এই কথাই ব্যাক্ত হয়েছে কৌমুদিকারের এই বক্তব্যে- "লিঙ্গলিঙ্গিগ্রহণেন বিষয়বাচিনা বিষয়িণং প্রত্যয়মুপলক্ষয়তি"।[৭৪] কারিকায় অনুমানকে বোঝাতে যে- "তৎ লিঙ্গলিঙ্গি পূর্বকম্" এর কথা বলা হয়েছে তার মাধ্যমেও আসলে অনুমান যে ব্যাপ্যব্যাপকভাবপূর্বক হয় সে কথাই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু এভাবেও অনুমানের পরিচয় দেওয়া যায় না কারণ ব্যাপ্যব্যাপকভাব পূর্বে থাকলেই অনুমান হয় না। ব্যাপ্যব্যাপকভাবের জ্ঞান থাকলে তবেই অনুমান বা অনুমিতি হয়। সুতরাং লিঙ্গলিঙ্গিপূর্বকম্ এই বাক্যের দ্বারা ওইরূপ অর্থ পরিজ্ঞাত হয় না বলে লক্ষণার দ্বারা বুঝতে হবে অনুমান আসলে লিঙ্গলিঙ্গিজ্ঞানপূর্বকম্। লিঙ্গ ও লিঙ্গীর অর্থাৎ ব্যাপ্য ও ব্যাপকের উল্লেখ করায় ওই শব্দদ্বয়ের দ্বারা বিষয় বোধিত হয়েছে। বিষয়বাচী ব্যাপ্য ধূম ও ব্যাপক বহ্নির বোধক শব্দের দ্বারা বিষয়ী প্রত্যয় বা জ্ঞানকে লক্ষণার দ্বারা বুঝতে হবে। ফলিতার্থ হল এই যে ধূমাদি

---

[৭৩] "তৎ লিঙ্গলিঙ্গিপূর্বকং ইতি"- নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*, ১৪০৬, পৃষ্ঠা-৫১।

[৭৪] তদেব, পৃষ্ঠা- ৫২।

ব্যাপ্য এবং বহ্ন্যাদি ব্যাপক এইরূপ যে প্রত্যয় বা জ্ঞান, সেইরূপ জ্ঞান পূর্বে থাকলেই অনুমান হয়। সুতরাং অনুমানং লিঙ্গলিঙ্গিজ্ঞানপূর্বকম্ জ্ঞান।

সাংখ্যের ন্যায় যোগ দর্শনেও ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকৃত হয়েছে। চিত্তবৃত্তির যে পঞ্চবিধ রূপ যোগদর্শনে স্বীকৃত তার অন্যতম হল প্রমাণ। এই প্রমাণের পরিচয় দিতে গিয়ে সপ্তম সূত্রে পতঞ্জলি বলেছেন– "প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি"[৭৫] অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম ভেদে প্রমাণ ত্রিবিধ। অনুমান প্রমাণের পরিচয় দিতে গিয়ে যোগভাষ্যে বলা হয়েছে – "অনুমেয়েস্য তুল্যজাতীয়ষ্বনুবৃত্তো ভিন্নজাতীয়েভ্যো ব্যাবৃত্তঃ সম্বন্ধো যস্তদ্বিষয়া সামান্যা-বধারণপ্রধানাবৃত্তিরনুমানম্"।[৭৬] এখানে 'অনুমেয়' কথার অর্থ সাধ্য বিশিষ্ট পক্ষ। আর 'তুল্য' কথার অর্থ পক্ষের তুল্য। 'সমানপক্ষ সপক্ষ'– এই অর্থকে গ্রহণ করলে অনুমেয় বা পক্ষের তুল্য হয় সপক্ষ। এই সপক্ষে অনুবৃত্ত বা উপস্থিত থাকে এবং ভিন্নজাতীয় অর্থাৎ পক্ষের অসদৃশ যে বিপক্ষ তাতে ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ বর্তমান থাকে না যে সম্বন্ধ, 'তদ্‌বিষয়া' অর্থাৎ সেই সম্বন্ধের জ্ঞান থেকে উৎপন্ন সামান্য নিশ্চয় হয় যে চিত্তবৃত্তির দ্বারা তাহল অনুমান। যেমন- সাধ্যের অধিকরণ যে পর্বত তাহল অনুমেয়। সেই পর্বতে তুল্য বহ্নির অধিকরণ হল মহানস, সেই মহানসে অনুবৃত্ত এবং তার অসদৃশ জলাশয় ব্যাবৃত্ত হল ধূম। এই ধূমের সঙ্গে বহ্নির সম্বন্ধ হতে উৎপন্ন হয় যে সামান্য নিশ্চয় তা হল অনুমান। সহজ কথায় এক পদার্থের জ্ঞান হতে তাকে ছেড়ে থাকে না যে পদার্থ তার জ্ঞানই অনুমান।

---

[৭৫] *যোগসূত্র*, (সমাধি পাদ)– ৭।

[৭৬] শ্রী পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু, *পাতঞ্জল দর্শন*, ২০০৫, পৃষ্ঠা- ১৭।

২.৫.২ ব্যাপ্তি পরিচয় ও ব্যাপ্তিগ্রহ প্রসঙ্গ

অনুমানের অন্যতম ভিত্তি রূপে সাংখ্য দর্শনেও ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তির কথা বলা হয়েছে। সাংখ্যসূত্রে এই ব্যাপ্তির পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে– "নিয়তধর্ম্ম-সাহিত্যমুভয়োরেকতরস্য বা ব্যাপ্তিঃ"[৭৭] অর্থাৎ সাধ্য-সাধনের মধ্যে কেবলমাত্র সাধনের অব্যভিচরিত সহকারী যে জ্ঞান তাকেই ব্যাপ্তি বলে। পঞ্চশিখের মতে 'আধেয়শক্তিযোগ'-ই ব্যাপ্তি।[৭৮] লক্ষণস্ত 'আধেয়' শব্দের দ্বারা তিনি ব্যাপ্যকে বুঝিয়েছেন। আর এই 'ব্যাপ্তি' বা 'নিয়ম' ব্যাপ্যতেই উদ্ভূত হয়। সাংখ্য দর্শনে প্রকৃতিকে 'ব্যাপক' বা 'আধার' বলা হয়েছে কারণ তাতে আধার শক্তির উদ্ভব হয়। আর বুদ্ধাদি প্রভৃতি তা হতে উৎপত্তি হয় বলে তাদের 'আধেয়' বলা হয়। এই শক্তি অর্থাৎ ব্যাপ্তিরূপ যে শক্তি তা হেতুতে থাকাই ব্যাপ্যতা। এই ব্যাপ্যতার নামই আধেয়তা ও ব্যাপকতার নাম আধারতাশক্তি। যা পঞ্চশিখের মতে আধেয়শক্তিযোগ। এই ব্যাপ্য ও ব্যাপকের পরিচয় দিতে গিয়ে সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদিকার বলেছেন– "শঙ্কিতসমারোপিতোপাধিনিরাকরণেন চ বস্তুস্বভাবপ্রতিবন্ধং ব্যাপ্যম্, যেন প্রতিবন্ধং তদ্ব্যাপকম্"।[৭৯] শঙ্কিত ও নিশ্চিত উভয় প্রকার উপাধি মুক্ত হয়ে যা অন্যের স্বভাব প্রতিবদ্ধ বা স্বাভাবিক সম্বন্ধ যুক্ত হয় তাই হল ব্যাপ্য আর যার দ্বারা তা প্রতিবদ্ধ হয় তা হল ব্যাপক। এইরূপ উপাধি শূন্য ব্যাপ্যব্যাপকের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ তাই হল ব্যাপ্তি। অনুমানকে লিঙ্গ-

---

[৭৭] *সাংখ্যসূত্র-* ৫/২৯।

[৭৮] "আধেয়শক্তিযোগ ইতি পঞ্চশিখঃ", তদেব - ৫/৩২।

[৭৯] নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*, ১৪০৬, পৃষ্ঠা-৫১।

লিঙ্গী পূর্বক বলে বর্ণনা করে ঈশ্বরকৃষ্ণ ও বাচস্পতি অনুমানের ব্যাপ্তি পূর্বকতাকেই নির্দেশ করেছেন।

এখানে বলা দরকার যে ব্যাপ্যব্যাপক সম্বন্ধ একটি সর্বদৈশিক, সর্বকালিক সম্বন্ধ হলেও সর্বত্র এই সম্বন্ধ থাকলেই যে অনুমিতি সম্ভব হয় তা নয়। যেমন- ধূমাদি ও বহ্ন্যাদির ব্যাপ্যব্যাপকভাব বা ব্যাপ্তি স্বাভাবিক অর্থাৎ সর্বকালিক হলেও সবক্ষেত্রে তা থেকে অনুমিতি হয় না। আসলে ব্যাপ্যব্যাপকভাব বা ব্যাপ্তি অনুমিতির কারণ নয়। প্রকৃতপক্ষে ব্যাপ্তির জ্ঞানই অনুমিতির কারণ হয়। এই জন্যই লিঙ্গ-লিঙ্গী পূর্বক কথাটির দ্বারা লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধ জ্ঞান পূর্বক বুঝতে হবে। বাচস্পতিও এই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছেন– "লিঙ্গলিঙ্গীগ্রহণেন বিষয়বাচিনা বিষয়িণং প্রত্যয়মুপলক্ষয়তি"।[৮০] সহজকথায় ধূমাদি ব্যাপ্য এবং বহ্ন্যাদি ব্যাপক এইরূপ যে প্রত্যয় বা জ্ঞান তা থাকলেই যে অনুমিতি সম্ভব হয় তা না। পক্ষধর্মতা জ্ঞানেরও প্রয়োজন হয়। সেকথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বাচস্পতি বলেছেন– "তৎ ব্যাপ্যব্যাপক-ভাবপক্ষধর্মতা-জ্ঞানপূর্বকমনুমানম্"।[৮১] তাহলে প্রশ্ন উঠবে ঈশ্বরকৃষ্ণ কীভাবে কেবল লিঙ্গ-লিঙ্গী পূর্বক জ্ঞান হিসাবে অনুমানের ব্যাখ্যা দিলেন। এর উত্তর দিতে গিয়ে বাচস্পতি বলেছেন "তৎ ব্যাপ্যব্যাপকভাবপক্ষধর্মতাজ্ঞানপূর্বকমনুমানম্ ইত্যনুমানসামান্যং লক্ষিতম্"।[৮২] বক্তব্য এই 'লিঙ্গলিঙ্গীপূর্বকম্' এই অংশের দ্বারা পক্ষধর্মতা জ্ঞানেরও উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর মতে লিঙ্গী শব্দটিকে এখানে দুইবার আবৃত্তি বা উল্লেখ করতে হবে তাহলেই তার দ্বারা ব্যাপ্তিজ্ঞানের মতো পক্ষধর্মতাও যে অনুমানের জনক তা বোধিত হবে। 'লিঙ্গী চ লিঙ্গী চ' এইরূপ সমাসার্থে

---

[৮০] তদেব, পৃষ্ঠা- ৫২।

[৮১] তদেব, পৃষ্ঠা-৫৩।

[৮২] তদেব।

হবে লিঙ্গিনৌ। আর 'লিঙ্গং চ লিঙ্গিনৌ চ লিঙ্গলিঙ্গিনৌ। লিঙ্গলিঙ্গিনৌ পূর্বং যস্য তৎ লিঙ্গলিঙ্গিপূর্বকম্' এইরূপ সমাস করলে সম্পূর্ণ বাক্যটির অর্থ হবে- তৎ লিঙ্গলিঙ্গিলিঙ্গিপূর্বকম্ অর্থাৎ অনুমান লিঙ্গলিঙ্গিলিঙ্গিজ্ঞানজন্য জ্ঞান। প্রথম 'লিঙ্গী' শব্দের দ্বারা কৌমুদিকার ব্যাপ্তির নিরূপক বা ব্যাপককে বুঝিয়েছেন। দ্বিতীয় 'লিঙ্গী' শব্দের দ্বারা লিঙ্গের বা হেতুর অধিকরণ পক্ষকে বোঝালেও লক্ষণার দ্বারা এর অর্থ করতে হবে পক্ষ বিশেষ্যক হেতুজ্ঞান বা পক্ষধর্মতাজ্ঞানকে। কাজেই লিঙ্গী শব্দের এইরূপ অর্থ নির্দেশিত হয় বলে তার দ্বারা তদ্‌ব্যাপ্যব্যাপকভাবপক্ষধর্মতাজ্ঞানপূর্বকম্ এইরূপেই অনুমানের লক্ষণ বোধিত হয়। এই লক্ষণটিকে অনুমানের সামান্য লক্ষণ বলেও অভিহিত করেছেন বাচস্পতি।

সাংখ্য দর্শনে ব্যাপ্তিগ্রহের উপায় হিসাবে প্রত্যক্ষের কথা বলা হলেও বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে এই অব্যভিচার নিয়ম বা ব্যাপ্তির গ্রহণ অনুকূল তর্কের দ্বারাই প্রতিপাদিত হতে পারে। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য –"তথা চোভয়োঃ সাধ্যসাধনয়োরেকতরস্য সাধনমাত্রস্য বা নিয়তোব্যভিচরিতো যঃ স ব্যাপ্তিরিত্যর্থঃ। উভয়োরিতি সমব্যাপ্তি পক্ষে প্রোক্তং, নিয়মশ্চানুকূলতর্কেণ গ্রাহ্য ইতি ন ব্যাপ্তিগ্রহাসম্ভব ইতি ভাবঃ"[৮৩] অর্থাৎ সাধ্য সাধনের দুয়ের বা কেবল সাধনের অব্যভিচার সহকারের গ্রহণ তর্কের দ্বারা বা ব্যভিচারের আশঙ্কা নিবৃত্তি পূর্বক ব্যাপ্তির নিশ্চয় হয়ে থাকে।

[৮৩] কালীবর বেদান্তবাগীশ, *সাংখ্যদর্শনম্,* ১৩৬০, পৃষ্ঠা- ৪৪৯।

২.৬ মীমাংসক মতে ব্যাপ্তি

২.৬.১ মীমাংসা দর্শনে অনুমান

অপরাপর দর্শনের ন্যায় মীমাংসা দর্শনেও দ্বিতীয় প্রমাণ হিসাবে অনুমানের স্বীকৃতি। সেই অনুমানের লক্ষণ স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে জৈমিনি সূত্রের ভাষ্যে। অনুমানের লক্ষণ দিতে ভাষ্যকার শবরস্বামী বলেছেন– "অনুমানং জ্ঞাতসম্বন্ধস্যৈকদেশদর্শনাদেকদেশান্তরেহ-সন্নিকৃষ্টেহর্থে বুদ্ধিঃ"।[৮৪] এখানে ভাষ্যোক্ত 'অনুমান' শব্দে অনুমিতিকে বুঝতে হবে। লিঙ্গ ও লিঙ্গীর মধ্যে সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি সম্বন্ধের জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছে যে পুরুষ সেই জ্ঞাত সম্বন্ধক পুরুষের একদেশ দর্শন হতে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সন্নিকর্ষ রহিত দেশান্তরে থাকা অর্থের বুদ্ধি হল অনুমিতি। এই বর্ণনা থেকে স্পষ্ট হয় যে ব্যাপ্তিস্মৃতি-পক্ষধর্মতাজ্ঞানজন্য জ্ঞানই অনুমিতি। এই অনুমিতি দুই প্রকার– প্রত্যক্ষতদৃষ্ট সম্বন্ধবিষয়ক এবং সামান্যতদৃষ্ট সম্বন্ধবিষয়ক। যেখানে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ সাধারণভাবে দৃষ্ট বা জ্ঞাত সেইক্ষেত্রে অনুমিতি হয় প্রত্যক্ষত দৃষ্টসম্বন্ধ বিষয়ক। আর যেখানে হেতু সাধ্যের সাথে ব্যাপ্তিসম্বন্ধ প্রত্যক্ষদৃষ্ট নয় বরং সামান্যদৃষ্ট সেখানে অনুমিতি সামান্যত দৃষ্টবিষয়ক। ধূমের সাহায্যে অগ্নির অনুমান প্রত্যক্ষতদৃষ্ট বিষয়ক। যেখানে গোময় রূপ ইন্ধন থেকে উৎপন্ন অগ্নির সাহায্যে ধূমের উৎপত্তি হতে দেখা যায় সেখানে পরবর্তী সময়ে ধূম উত্থিত হতে দেখে ওইরূপ অগ্নির অনুমান হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে দেবদত্তের গতি দর্শন থেকে তার দেশান্তর গমনকে হেতু করে সূর্যের গতির অনুমান হল সামান্যতদৃষ্ট বিষয়ক।

---

[৮৪] ডাঃ গজানন শাস্ত্রী, *মীমাংসাদর্শনম্*, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা- ২৯০।

মানমেয়োদয়কার নারায়ণভট্টের মতে ব্যাপ্যের দর্শন থেকে অসন্নিকৃষ্ট অর্থের যে জ্ঞান তাই হল অনুমান– "ব্যাপ্যদর্শনাৎসন্নিকৃষ্টার্থজ্ঞানমনুমানম্"।[৮৫] যেমন পর্বতে দূর থেকে ধূম প্রত্যক্ষ করে অসন্নিকৃষ্ট বহ্নির যে জ্ঞান তা অনুমান। যে পদার্থ যাকে বিনা থাকে না তাকে তার ব্যাপ্য বলে। ব্যাপ্যের দুটি ভেদের কথা বলা হয়েছে– বিষমব্যাপ্য ও সমব্যাপ্য। ধূম বহ্নির বিষমব্যাপ্য কারণ ধূমই বহ্নির ব্যাপ্য হয়, বহ্নি ধূমের ব্যাপ্য হয় না; অঙ্গারে বহ্নি থাকলেও ধূম থাকে না অর্থাৎ ধূমের অভাবেও বহ্নি থাকে। কৃতকত্ব-কার্যত্ব, অনিত্যত্ব-নশ্বরত্ব এগুলি হল সমব্যাপ্য। কারণ দুই ক্ষেত্রে উভয়েই উভয়ের ব্যাপ্য হতে পারে।

২.৬.২ মীমাংসা মতে ব্যাপ্তি সম্বন্ধের স্বরূপ ও ব্যাপ্তিগ্রহের উপায়

মীমাংসাসূত্রে ব্যাপ্তির স্বরূপ নিরপন স্পষ্টভাবে দেখা যায় না। কিন্তু ভাষ্যকার শবরস্বামী ব্যাপ্তি স্বরূপ নিয়ে আলোচনা করেছেন। শবরস্বামী তাঁর ভাষ্যে অনুমানের লক্ষণে "জ্ঞাতসম্বন্ধ" শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। ভাষ্যোক্ত 'সম্বন্ধ' শব্দের অর্থ নিরূপণ করতে গিয়ে কুমারিল শ্লোকবার্তিকে বলেছেন – "সম্বন্ধৌ ব্যাপ্তিরিষ্টা অত্র লিঙ্গধর্মস্য লিঙ্গিনা"[৮৬] অর্থাৎ ভাষ্যকার ব্যবহৃত 'সম্বন্ধ' কথাটি লিঙ্গ ধর্মের লিঙ্গীর সঙ্গে সম্বন্ধকে বা ব্যাপ্তি সম্বন্ধকে নির্দেশ করে। ব্যাপ্য অর্থাৎ লিঙ্গ হল গমক তার দ্বারা ব্যাপক গম্যের অর্থাৎ সাধ্যের অনুমান হয়। যে দেশ ও সময়ের দিক দিয়ে সমান বা কম হয় সে ব্যাপ্য এবং যে সমান বা অধিক দেশে ও কালে থাকে তাকে ব্যাপক বলে। কুমারিল এবং প্রভাকর এই শব্দের দ্বারা "নিয়মরূপ সাহচর্য সম্বন্ধ"কে গ্রহণ করেছেন।

---

[৮৫] শ্রী দীননাথ ত্রিপাঠী, *মানমেয়োদয়*, ১৯৯০, পৃষ্ঠা- ৪৬।

[৮৬] ডাঃ গজানন শাস্ত্রী, *মীমাংসাদর্শনম্*, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা- ২৯২।

অনুমানের স্বরূপ নিরূপণের অনন্তর মানমেয়োদয়ে ব্যাপ্তি কী? এইরকম প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেছেন – "স্বাভাবিকঃ সম্বন্ধো ব্যাপ্তিঃ"।[৮৭] স্বাভাবিকত্বের অর্থ করা হয়েছে 'উপাধিরাহিত্য'। উপাধির লক্ষণ করা হয়েছে– 'সাধনাব্যাপকত্বে সতি সাধ্যসমব্যাপ্তত্ব'। সহজকথায় যা হেতুর অব্যাপক হয়েও সাধ্যের সমব্যাপক হয় তাই উপাধি। এরকম উপাধিরহিত যে সম্বন্ধ তাই স্বাভাবিক সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি। এইভাবে তিনি এই প্রসঙ্গে উদয়নাচার্যকে অনুসরণ করেছেন। স্বাভাবিক সম্বন্ধ ছাড়াও 'নিয়ম', 'প্রতিবন্ধক', 'অব্যভিচার', 'অবিনাভাব' ইত্যাদি শব্দকে ব্যাপ্তির বাচক হিসেবে উল্লেখ করেছেন নারায়ণ ভট্ট। অন্যদিকে ব্যাপ্য হেতুর বাচক হিসাবে 'নিয়ম্য', 'গমক', 'লিঙ্গ', 'সাধন' এই শব্দগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছে। চিন্নাস্বামী "নিয়মরূপ সম্বন্ধ"কে ব্যাপ্তি বলেছেন। দৃশ্যমান দেশ কালাদিতে সাধ্যের সাথে হেতুর সহভাব পরিলক্ষিত হওয়া হচ্ছে নিয়ম বা ব্যাপ্তি। শালিকনাথের মতে যার সাথে যার অব্যভিচরিতত্ব এবং নিয়ত কার্যকারণভাবাদি সম্বন্ধ হয় সেই সদ্ধেতু হতে পারে এবং এইরূপের নিয়ত অব্যভিচরিত কার্যকারণাদি সম্বন্ধকে ব্যাপ্তি বলে।

কণভূক্ষ ও অক্ষপাদের সূত্রের মধ্যে বীজ রূপে যে ব্যাপ্তিকে পাওয়া যায় ব্যাস, বাৎস্যায়ন ও প্রশস্তপাদ সেই ব্যাপ্তির বিচারকে পল্লবিত করেছেন। তবে এই ব্যাপ্তির সুষ্ট ও পরিস্ফূট লক্ষণ প্রদানের কৃতিত্ব কুমারিল ভট্টকে দেওয়া যেতে পারে, যার সমর্থন পরবর্তী প্রায় সকল আচার্য দার্শনিকের রচনায় পাওয়া যায়। ব্যাপ্তিপঞ্চক প্রকরণে যে পাঁচটি ব্যাপ্তির লক্ষণ আছে সেই 'অব্যভিচরিতত্ব'কেই গাগাভট্ট প্রমুখ আচার্যরা ব্যাপ্তি বলে গণ্য করেন।

[৮৭] শ্রী দীননাথ ত্রিপাঠী, *মানমেয়োদয়,* ১৯৯০, পৃষ্ঠা- ৪৮।

তাঁদের মতে হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার না থাকাই ব্যাপ্তি। তবে এই অব্যভিচরিতত্বকে সকলে ব্যাপ্তির লক্ষণ বললেও অব্যভিচরিতত্ব শব্দের স্বরূপ প্রসঙ্গে তাঁরা একমত নন।

গাগাভট্ট ব্যাপ্তির প্রথম লক্ষণে বলেছেন- "সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বং ব্যাপ্তিঃ"[৮৮] অর্থাৎ যা সাধ্যের সঙ্গে থাকে অন্যত্র থাকে না তাকে ব্যাপ্তি বলে। এতদনুসারে সাধ্যশূন্য স্থানে অর্থাৎ সাধ্যাভাবের অধিকরণে হেতুর অবৃত্তি হচ্ছে ব্যাপ্তি। সদ্‌হেতুর স্থলে হেতুর সকল আশ্রয়ে হেতুর বিদ্যমান থাকা অনিবার্য। যে হেতু সাধ্য যুক্ত কোনো স্থানে থাকলেও যদি সাধ্যশূন্য কোন স্থলে থাকে তবে সেই হেতু ব্যভিচারী হবে। 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এই প্রসিদ্ধ স্থলে ব্যাপ্তির লক্ষণটির সমন্বয় করা যায়। এই অনুমানে সাধ্য বহ্নি তার অভাব হল বহ্নির অভাব। এই বহ্নিরূপ সাধ্যের অভাব জলাশয় প্রভৃতিতে থাকে, পর্বত প্রভৃতিতে থাকে না। এখানে 'সাধ্যবৎ' শব্দের তাৎপর্য সাধ্যের আশ্রয় বা অধিকরণ। সাধ্যাভাবীয় এই আশ্রয়ে ধূম কখনো থাকতে পারে না। এইভাবে সাধ্যাভাবীয় অধিকরণ জলাশয় প্রভৃতিতে হেতুর বৃত্তিত্বার অভাব ধূমে থাকে। একইভাবে লক্ষণটি 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' এই প্রসিদ্ধ অসদ্ধেতুক স্থলে সমন্বয় হয় না। এখানে সাধ্য ধূম তার অভাব ধূমাভাব। সাধ্য ধূমের অভাবের অধিকরণ জলাশয় প্রভৃতির মত তপ্ত অয়োগোলক প্রভৃতিও হয়। সেই অয়োগোলক প্রভৃতিতে বহ্নির সত্তা আছে, অসত্তা থাকে না। ফলে অতিব্যাপ্তি হয় না।

নব্য নৈয়ায়িকের মতোই গাগাভট্ট উক্ত অনুমানে দোষ দেখিয়ে বলেছেন যে, 'কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ' ইত্যাদি অব্যাপ্যবৃত্তি সাধক স্থলে ব্যাপ্তির ওই লক্ষণটি সঙ্গত হয় না। অব্যাপ্যবৃত্তি বলতে বুঝতে হবে যে কোনো বস্তুর এক দেশে বা এক কালে থাকা। কোনো

[৮৮] শ্রী সুর্য নারায়ণ শুক্লা, *ভাট্টচিন্তামণিঃ*, ১৯৩৩, পৃষ্ঠা- ২৪।

বস্তুর এক দেশে বা এক কালে থাকাকে অব্যাপ্যবৃত্তি এবং সর্বদেশে ও সর্বকালে থাকাকে ব্যাপাবৃত্তি বলে। দেশকৃত অব্যাপ্যবৃত্তি এবং কালকৃত অব্যাপ্যবৃত্তি ভেদে অব্যাপ্যবৃত্তি আবার দুই প্রকার। যে পদার্থের সত্তা কোনো এক দেশে থাকে এবং কোনো এক দেশে থাকে না তাকে দেশকৃত অব্যাপ্যবৃত্তি বলে। অনুরূপভাবে যে পদার্থের সত্তা কোনো এক কালে থাকে এবং কোনো এক কালে থাকে না তাকে কালকৃত অব্যাপ্যবৃত্তি বলে। যাতে যে পদার্থ কখনও থাকে কখনও থাকে না, তাতে সেই পদার্থের অধিকরণতা সর্বদা থাকতে পারে না। এজন্য সেই পদার্থের অধিকরণ সর্বদা অব্যাপ্যবৃত্তি হয়। যেমন- দণ্ড ও পুরুষের সংযোগ হচ্ছে অব্যাপ্যবৃত্তি। কেননা পুরুষের সারা শরীরে দণ্ড সংযোগ থাকে না, কিন্তু অঙ্গবিশেষের সাথে দণ্ডের সংযোগ থাকে। তাৎপর্য এই যে, পুরুষের শরীর মাত্র দণ্ডের আশ্রয় হয়। এজন্য 'দন্ডী পুরুষৈকদেশ' অর্থাৎ পুরুষের একদেশ দণ্ডবিশিষ্ট এরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত, কিন্তু তা হয় না। এজন্য সংযোগ প্রভৃতি দেশকৃত অব্যাপ্যবৃত্তি পদার্থের অধিকরণতা ব্যাপ্যবৃত্তিই হয়। অনুরূপভাবে গন্ধ প্রভৃতি গুণও উৎপত্তির প্রথম ক্ষণে না থাকায় পদার্থটি কালকৃত অব্যাপ্যবৃত্তি হয়, কিন্তু তার অধিকরণতা পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থে সর্বদা থাকে। অভিপ্রায় হচ্ছে যে, উৎপত্তিক্ষণে গন্ধ না থাকলেও তার পৃথিবীরূপা অধিকরণ থাকে। প্রভৃতি পদার্থের অধিকরণতা হচ্ছে ব্যাপ্যবৃত্তি। কিন্তু উক্তস্থলে কপিসংযোগ হচ্ছে সাধ্য এবং এতদ্‌বৃক্ষত্ব হচ্ছে হেতু। এখানে বৃক্ষের শাখায় কপিসংযোগ আছে, মূলভাগে নেই। অতএব সাধ্যাভাবীয় বৃক্ষের মূলভাগরূপ অধিকরণে হেতু এতদ্‌বৃক্ষত্বের বৃত্তি থাকায় ব্যাপ্তির প্রথম লক্ষণটিতে অব্যাপ্তি দোষ দেখা দেয় আর এই অব্যাপ্তি দোষ নিবারণের জন্য দ্বিতীয় লক্ষণের অবতারণা করা হয়েছে।

গাগাভট্ট তাঁর ভাট্টচিন্তামণি গ্রন্থে ব্যাপ্তির দ্বিতীয় লক্ষণটি উপস্থাপন করেছেন এইভাবে- ‘‘হেতুসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকসাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ’’[৮৯] অর্থাৎ হেতুর সমানাধিকরণে থাকে যে অত্যন্তাভাব সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক সেই সাধ্যতাবচ্ছেদকের দ্বারা অবচ্ছিন্ন সাধ্যের হেতুর সঙ্গে সমানাধিকরণকে ব্যাপ্তি বলে। ব্যাপ্তির এই লক্ষণটি গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত লক্ষণ অনুসারে করা হয়েছে। সাধ্যের অধিকরণ হতে ভিন্ন সাধ্যাভাবের অধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাবই ব্যাপ্তি। গাগাভট্টের এই দ্বিতীয় লক্ষণকে গ্রহণ করলে পূর্বোক্ত আপত্তি থেকে কীভাবে মুক্ত হওয়া যায় তা দেখা যাক। ‘কপিসংযোগী এতদ্‌বৃক্ষত্বাৎ’ এই স্থলে কপিসংযোগাভাবের দুই প্রকার অধিকরণতা লক্ষ্য করা যায়। একটি এতদ্‌বৃক্ষ যাতে কপিসংযোগাভাবসত্তার সাথে কপিসংযোগবত্তাও থাকে। অতএব এই অধিকরণে সাধ্যাভাববত্তা থাকায় সাধ্যবত্ত ভিন্নত্ব থাকে না। কপিসংযোগাভাবের দ্বিতীয় অধিকরণে যে গুণাদি তাতে কপিসংযোগাভাবের সঙ্গে কপিসংযোগ ভিন্নত্বও থাকে। কেননা গুণে গুণ থাকে না বলে গুণ প্রভৃতিও কখনো কপিসংযোগরূপ সাধ্যের অধিকরণ হতে পারে না। এই প্রকারে ‘কপিসংযোগী এতদ্‌বৃক্ষত্বাৎ’ ইত্যাদি স্থলে সাধ্যাবদ্‌ভিন্ন সাধ্যাভাবের অধিকরণের অধিকরণ হচ্ছে গুণ প্রভৃতি, এতদ্‌বৃক্ষ নয়। এইভাবে সাধ্যাভাবীয় অধিকরণ গুণাদিতে এতদ্‌বৃক্ষত্বরূপ হেতু কখনো থাকে না। ফলে আলোচ্য স্থলে লক্ষণটির সমন্বয় হয়।

গাগাভট্ট ব্যাপ্তির দ্বিতীয় লক্ষণেও দোষ দেখিয়ে বলেন যে, এই লক্ষণে প্রতিযোগীর ব্যধিকরণাভাব অপ্রসিদ্ধ। কারণ সকল অভাব পূর্বলক্ষণত্ব বিশিষ্ট স্বভাবশালী হলে প্রতিযোগীর

---

[৮৯] তদেব, পৃষ্ঠা- ২৪।

সমানাধিকরণবিশিষ্ট হয়। তাই গাগাভট্ট ব্যাপ্তির অন্য প্রকার লক্ষণ করেছেন এইভাবে- ‘‘হেতুসমানাধিকরণান্যোন্যাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকসাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্নবৃত্তিত্বং ব্যাপ্তিঃ’’[৯০] অর্থাৎ হেতুর সমানাধিকরণে থাকে যে অন্যোন্যাভাব সেই অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক সাধ্যবত্তার দ্বারা অবচ্ছিন্ন বৃত্তিতাকে ব্যাপ্তি বলে। এখানে প্রযুক্ত ‘সামানাধিকরণ্য’ শব্দের অর্থ হচ্ছে অধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিতা অর্থাৎ একই অধিকরণে বর্তমান থাকা। সেই অনুসারে সাধ্যবিশিষ্ট প্রতিযোগিক ভেদের অধিকরণের দ্বারা নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব হচ্ছে ব্যাপ্তি। ‘কপিসংযোগী এতদ্‌বৃক্ষত্বাৎ’ এই অব্যাপ্যবৃত্তি সাধক স্থলে অব্যাপ্তি দোষ হয় না। কারণ এইটি ‘কপিসংযোগবান্ নয়’- এ হচ্ছে তৎপ্রতিযোগিক অন্যোন্যাভাবের আকার এবং এখানে এতদ্বৃক্ষের কোনো অংশে কপিসংযোগাভাব থাকায় ‘কপিসংযোগবান্ নয়’ এই ভেদের সত্তা থাকে না। আবার এই ভেদের সত্তা গুণ প্রভৃতিতে থাকে, যাতে এতদবৃক্ষত্ব থাকে না। এই প্রকার ‘সংযোগী দ্রব্যত্বাৎ’ স্থলে সংযোগবিশিষ্ট প্রতিযোগিক অন্যোন্যাভাবের অধিকরণ হয় গুণাদি, তাই তাতে দ্রব্যত্ব হেতুর অবৃত্তিত্বই থাকে। আবার ‘ধূমবান্ বহ্নেঃ’ ইত্যাদি অসদ্ধেতুক স্থলেও এই লক্ষণটির অতিব্যাপ্তি হয় না।

উপরোক্ত সকল ব্যাপ্তির লক্ষণ যেখানে যেখানে হেতু সেখান সেখানে সাধ্য এই দৃষ্টিতে বিবেচিত হয়েছে। পরন্তু শেষের লক্ষণটি যেখানে যেখানে সাধ্যাভাব সেখানে সেখানে হেত্বাভাব এই দৃষ্টিতে বিবেচিত হয়েছে। ব্যাপ্তি সর্বদা হেতুতে থাকে এই দৃষ্টিকোণ হতে তৎপ্রতিযোগিত্ব পদ জোড়া হয়েছে। এখানে গাগাভট্টের দ্বারা প্রদর্শিত সকল ব্যাপ্তির লক্ষণ বাস্তবিকভাবে একই ‘অব্যভিচরিতত্ব’ শব্দের বোধক। ‘অব্যভিচরিতত্ব’ শব্দের অর্থ ব্যভিচারশূন্যতা অর্থাৎ

---

[৯০] তদেব, পৃষ্ঠা- ২৬।

ব্যভিচার না থাকা। ফলত হেতুতে সাধ্যের ব্যভিচার না থাকা হচ্ছে ব্যাপ্তি। এই প্রসঙ্গে গাগাভট্ট উদয়নাচার্যকে সমর্থন করে বলেছেন পক্ষ যে- ‘‘ব্যাপকসামানাধিকরণ্যং ন ব্যাপ্তিঃ। কিং তু ব্যাপকসম্বন্ধমাত্রম্’’[৯১] অর্থাৎ ব্যাপকের সামানাধিকরণ্যকে ব্যাপ্তি বলে না বরং ব্যাপকের সম্বন্ধমাত্রকে ব্যাপ্তি বলে।

প্রভাকর অনুগামী শালিকনাথের মতে অসকৃদদর্শনের মাধ্যমে ব্যাপ্তির গ্রহণ হয়ে থাকে। তাঁর মতে যে প্রমাণের দ্বারা সাধন সম্বন্ধ বিশিষ্টের গ্রহণ হয় সেই প্রমাণের দ্বারাই সাধনের ব্যাপ্তি সম্বন্ধেরও গ্রহণ হয়। যেমন– যেখানে ধূম ও অগ্নির সম্বন্ধ প্রত্যক্ষের মাধ্যমে যেমন ব্যাপ্তিজ্ঞান উৎপন্ন হয়ে থাকে তেমনই ধূম নিষ্ঠ ব্যাপ্তি সম্বন্ধেরও জ্ঞান হয়ে থাকে। ভাষ্যকার শবরস্বামীকে অনুসরণ করে কুমারিল ‘সম্বন্ধ’ পদের দ্বারা যেমন ব্যাপ্তিকে বুঝিয়েছেন তেমনই ভূয়োদর্শনের দ্বারাই ওই সম্বন্ধের বা ব্যাপ্তিরনিশ্চয় হয় বলে দাবি করেছেন।[৯২] তাঁর মতে কি সমব্যাপ্তি, কি বিষমব্যাপ্তি উভয়ের ক্ষেত্রেই ব্যাপ্যকে গমক ও ব্যাপককে গম্য বলা হয়। কারণ ব্যাপ্যের জ্ঞানের জন্য ব্যাপকের জ্ঞানের প্রয়োজন হয়। সুতরাং ব্যাপ্যে ব্যাপ্যতা এবং ব্যাপকের ব্যাপিতা থাকে। তাঁর মতে মহানসে যতবার ধূম দর্শন হয় ততবারই বহ্নিরও দর্শন হয়। এইভাবে সপক্ষ মহানসে ধূম ও বহ্নির বারবার সহচারদর্শন বা ভূয়োদর্শনের দ্বারাই ধূম ও বহ্নির ব্যাপ্তি সম্বন্ধের নিশ্চয় হয়ে থাকে।

---

[৯১] তদেব।

[৯২] ‘‘ভূয়োদর্শনগম্যা চ ব্যাপ্তিঃ সামান্যধর্ময়োঃ
জ্ঞায়তে ভেদহানেন ক্ব চিচ্চাপি বিশেষয়োঃ’’। ডাঃ গজানন শাস্ত্রী, *মীমাংসাদর্শনম্*, ১৯৭৯, পৃষ্ঠা- ২৯৪।

২.৭. ব্যাপ্তি বিষয়ে বেদান্তীর ব্যাখ্যা

২.৭.১ বৈদান্তিক দৃষ্টিতে অনুমান

বেদান্ত দর্শনেও অনুমানকে অন্যতম প্রমাণ হিসাবে মানা হয়েছে। অনুমান বলতে নৈয়ায়িকদের মতোই বেদান্তী বোঝেন অনুমিতির করণকে। কিন্তু প্রশ্ন হল অনুমিতি কী? উত্তরে বেদান্ত পরিভাষাকার বলেছেন- "অনুমিতিশ্চ ব্যাপ্তিজ্ঞানত্বেন ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্যা"[৯৩] অর্থাৎ কিনা ব্যাপ্তি জ্ঞানত্বরূপে ব্যাপ্তিজ্ঞান হতে যা উৎপন্ন তাই অনুমিতি। এখানে বলা দরকার যে ব্যাপ্তিজ্ঞান হতে কেবলমাত্র অনুমিতি উৎপন্ন হয় না। ব্যাপ্তিজ্ঞান যেমন অনুমিতির জনক তেমনই ব্যাপ্তি বিষয়ক অনুব্যবসায়, ব্যাপ্তিস্মরণ ও ব্যাপ্তিজ্ঞানের ধ্বংসের প্রতি কারণ হয়ে থাকে। তবে সকল ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিজ্ঞানের কারণতা একই প্রকার নয়। ব্যাপ্তিজ্ঞান যেখানে কারণ হয় সেখানে ব্যাপ্তিজ্ঞানের যেমন কারণতা থাকে তেমনই সেরূপ সেই কারণতা নিরূপিত জন্যতা থাকে সেইসব পদার্থে, যেগুলি ব্যাপ্তিজ্ঞান জন্য। এই কারণে ব্যাপ্তিস্মৃতি, অনুব্যবসায় ও ব্যাপ্তিজ্ঞানের ধ্বংস সকলের মধ্যে ব্যাপ্তিজ্ঞানগতজনকতা নিরূপিত জন্যতা আছে।

তবে সাধারণভাবে এই চতুর্বিধ কার্যে ব্যাপ্তিজ্ঞানগতজনকতা নিরূপিত জন্যতা থাকলেও সকল ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিজ্ঞান একই ধর্ম-পুরস্কারে তাদের জনক হয় না। যেমন, ব্যাপ্তিজ্ঞান বিষয়ক অনুব্যবসায় বা মানস প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিজ্ঞান বিষয়ত্ব ধর্ম-পুরস্কারে জনক হয়, স্মৃতির প্রতি স্বসমানত্ব বিষয়ক অনুভবত্বরূপে ব্যাপ্তিজ্ঞান জনক হয় আর ধ্বংসের

---

[৯৩] শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, *বেদান্তপরিভাষা,* ১৮৮৩, পৃষ্ঠা- ১১৬।

প্রতি ব্যাপ্তিজ্ঞান জনক হয় প্রতিযোগিত্ব ধর্ম-পুরস্কারে। একমাত্র অনুমিতির ক্ষেত্রেই ব্যাপ্তিজ্ঞানত্ব ধর্ম-পুরস্কারে ব্যাপ্তিজ্ঞান জনক হয়ে থাকে।

অন্যভাষায় যেরূপে বা যে ধর্ম-পুরস্কারে ব্যাপ্তিজ্ঞান জনক হয় সেই ধর্মটি তদ্‌গত জনকতার অবচ্ছেদক হয়। আর জনকতাটি সেই ধর্মের দ্বারাই অবচ্ছিন্ন হয়। এইভাবে দেখলে ব্যাপ্তিনিষ্ঠ জনকতা নিরূপিত জন্যতা চতুর্বিধ হয়– ১) বিষয়ত্বাবচ্ছিন্ন জনকতা নিরূপিত জন্যতা ২) অনুভবত্বাবচ্ছিন্ন জনকতা নিরূপিত জন্যতা ৩) ব্যাপ্তিজ্ঞানত্বাবচ্ছিন্ন জনকতা নিরূপিত জন্যতা ও ৪) প্রতিযোগিত্বাবচ্ছিন্ন জনকতা নিরূপিত জন্যতা। এই চতুর্বিধের মধ্যে ব্যাপ্তি জ্ঞানত্বাবচ্ছিন্ন জনকতা নিরূপিত যে জন্যতা তাই অনুমিতিতে আছে। এই কারণে অনুমিতির লক্ষণ করা হয়েছে- "ব্যাপ্তিজ্ঞানত্বেন ব্যাপ্তিজ্ঞানজন্য" হিসাবে। ব্যাপ্তিজ্ঞাননিষ্ঠ জনকতা নিরূপিত যে জন্যতা তা ব্যাপ্তি বিষয়ক অনুব্যবসায়, স্মৃতি বা ব্যাপ্তিজ্ঞানের ধ্বংসে না থাকায় অনুমিতির এই লক্ষণের বিরুদ্ধে অতিব্যাপ্তির আপত্তি উঠে না। আর অনুমিতি মাত্রই যেহেতু ব্যাপ্তিজ্ঞানত্বাবচ্ছিন্ন ব্যাপ্তিজ্ঞান জন্য তাই এক্ষেত্রে অব্যাপ্তির কোনো আশঙ্কাও থাকে না।

অনুমিতির যে লক্ষণ ধর্মরাজাধ্বরিন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে তা থেকে অনুমিতির ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিজ্ঞানের গুরুত্ব ঠিক কতখানি তা স্পষ্ট হয়ে যায়। নানা ক্ষেত্রে বা দৃষ্টান্তে ব্যভিচারের অদর্শন এবং সহচারের দর্শন দ্বারা হেতুতে সাধ্যের ব্যাপ্তির প্রত্যক্ষ সম্ভব হলে পরে পক্ষে হেতু দর্শন বশত সেই হেতুতেই গৃহীত ব্যাপ্তির স্মরণাত্মক জ্ঞান হয়। এই ব্যাপ্তিস্মৃতি হতেই অনুমিতির উৎপত্তি। সুতরাং ব্যাপ্তিনিশ্চয় অনুমিতির করণ বা অনুমান প্রমাণ। ব্যাপ্তিনিশ্চয়কে অনুমিতির করণ বললে জিজ্ঞাসা স্বাভাবিক যে তার ব্যাপার কী হবে? এই জিজ্ঞাসা নিরসন

করে পরিভাষাকার বলেছেন "তৎসংস্কারোহবান্তরব্যাপারঃ"[৯৪] অর্থাৎ ব্যাপ্তিজ্ঞানের সংস্কারই হল অনুমিতির ব্যাপার। আর অনুমিতির কারণ ব্যাপ্তিজ্ঞান ব্যাপ্তিসংস্কাররূপ ওই ব্যাপারের অধিকরণ হওয়ায় তাকেই অনুমিতির কারণ বলতে হয়।[৯৫]

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে উদ্দ্যোতকর প্রমুখ প্রাচীন নৈয়ায়িকরা পরামর্শকে অনুমিতির করণ বলেছেন আবার কণাদ, উদয়ন, শঙ্কর মিশ্র প্রমুখ জ্ঞায়মানলিঙ্গকে অনুমিতির ক্ষেত্রে কারণ হিসাবে মেনেছেন কিন্তু অদ্বৈতী নব্য নৈয়ায়িকদের মতোই ব্যাপ্তিজ্ঞানকে অনুমিতির প্রতি কারণ হিসাবে মেনেছেন। তবে ব্যাপ্তিজ্ঞানের করণত্ব সমর্থন করলেও পরিভাষাকার পরামর্শকে অনুমিতির ব্যাপার হিসাবে মান্যতা দেননি।[৯৬] পরিবর্তে ব্যাপ্তি সংস্কারকেই অনুমিতির ব্যাপার বলে মেনেছেন। এখানে পূর্বপক্ষী প্রশ্ন তুলবেন ব্যাপ্তি সংস্কার বড় জোর ব্যাপ্তি স্মৃতির জনক হতে পারে তা অনুমিতির জনক হবে কীভাবে? অনুমিতিকে যদি ব্যাপ্তি সংস্কারজন্য বলা হয় তাহলে তা স্মৃতি বলে পরিগণিত হোক। অথচ অনুমিতি স্মৃতি নয় যা সর্বজনবিদিত। এই আপত্তির উত্তরে বেদান্তী বলেন স্মৃতিপ্রাগভাবজন্যত্বই স্মৃতিত্বের প্রযোজক। অনুমিতির ক্ষেত্রে সংস্কারজন্যত্ব থাকলেও স্মৃতিপ্রাগভাবজন্যত্ব থাকে না। সুতরাং অনুমিতিতে স্মৃতির আপত্তি নিরর্থক। তাছাড়া সংস্কারজন্যত্ব বেদান্ত মতে স্মৃতির প্রয়োজক নয়। কারণ সংস্কারজন্যত্ব সংস্কার ধ্বংস ও স্মৃতি উভয়ের ক্ষেত্রে সাধারণ। সংস্কার হতে যেমন স্মৃতি উৎপন্ন হয় তেমনই সংস্কারের ধ্বংসও উৎপন্ন হয়। ফলে এটি একটি সাধারণ কারণ। তাই একে স্মৃতি প্রয়োজক বলে অভিহিত করা যায় না। পরিবর্তে স্মৃতি প্রাগভাবকেই

---

[৯৪] তদেব, পৃষ্ঠা- ১১৭।

[৯৫] "অনুমিতিকরণং চ ব্যাপ্তিজ্ঞানম্", তদেব।

[৯৬] 'ন তু তৃতীয়লিঙ্গপরামর্শোহনুমিতৌ করণম্', তদেব, পৃষ্ঠা- ১১৯।

ওই প্রয়োজক বলে মানতে হয়। আর তা মানলে অনুমিতির উৎপত্তির পূর্বে স্মৃতির প্রাগভাব না থাকায় অনুমিতিতে স্মৃতিত্বের আপত্তি হয় না।

২.৭.২ ব্যাপ্তি বিষয়ে বেদান্তীর ব্যাখ্যা

যাইহোক অনুমিতি যেহেতু ব্যাপ্তি জ্ঞানকরণক তাই অনুমিতির আলোচনায় ব্যাপ্তিজ্ঞানের আলোচনা প্রসক্ত হয়। জিজ্ঞাসা হয় ব্যাপ্তি জ্ঞানের বিষয় যে ব্যাপ্তি সেই ব্যাপ্তি আসলে কী বা কীরূপ সম্বন্ধ? ব্যাপ্তির পরিচয় দিতে গিয়ে বেদান্ত পরিভাষায় বলা হয়েছে- "ব্যাপ্তিশ্চ অশেষসাধনাশ্রয়াশ্রিতসাধ্যসামানাধিকরণ্যরূপা"[৯৭] অর্থাৎ অশেষ সাধনের আশ্রয়ে আশ্রিত যে সাধ্য তার সঙ্গে (হেতু) সামানাধিকরণ্যই হল ব্যাপ্তি। 'অশেষ' কথার অর্থ অন্তহীন অর্থাৎ যাবতীয় বা সকল। 'সাধন' হেতুর বাচক। 'আশ্রয়' অর্থাৎ হেতুর আশ্রয় পক্ষ। যাবৎ পক্ষে আশ্রিত সাধ্যের সঙ্গে হেতুর যে সামানাধিকরণ্য তাই ব্যাপ্তি। যেমন ধূমে পর্বতাদি যাবতীয় অধিকরণে বিদ্যমান যে সাধ্য বহ্নি তার সঙ্গে ধূমের সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি। এখানে সামানাধিকরণ্য বলতে একাধিকরণ্যকে বুঝতে হবে। যারা একই অধিকরণে থাকে তারা হল সামানাধিকরণ্য। এই সামানাধিকরণ পদার্থ সকলের মধ্যে যে সম্বন্ধ তা সামানাধিকরণ্য। ধূমের অধিকরণে বহ্নি উপস্থিত থাকে তাই বহ্নি হল ধূম সামানাধিকরণ্য। এদের মধ্যে সামানাধিকরণ্যই থাকে। ধূম বহ্নির এই সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কোনো আশ্রয়ে যখন কোনো বস্তু থাকে তখন যে আশ্রয়ে তা থাকে তাকে বলা হয় অধিকরণ। আর যে ওই অধিকরণে বর্তমান থাকে তাকে বলা হয় আধেয়।

---

[৯৭] তদেব, পৃষ্ঠা- ১২৩।

এই আধেয়ে থাকে আধেয়ত্ব বা বৃত্তিত্ব। এই আধেয়ত্বটি অধিকরণ নিরূপিত। যা সাধ্যের অধিকরণে থাকে তাকে সাধ্যাধিকরণবৃত্তি বা সাধ্যসমানাধিকরণ বলে। সেই সাধ্য সমানাধিকরণের যে ভাব তাই সাধ্যসামানাধিকরণ্য। এই সাধ্যসামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি। হেতু ধূমে সাধ্য বহ্নির অধিকরণ নিরূপিত ওই বৃত্তিত্ব থাকায় তাতে সাধ্যসামানাধিকরণ্য রয়েছে।

তবে এখানে বলা দরকার যে ব্যাপ্তি সাধ্যসামানাধিকরণ্যকে সূচিত করলেও সামানাধিকরণ্য মাত্রই ব্যাপ্তি নয়। সামানাধিকরণ্য মাত্র ব্যাপ্তি বললে 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ইত্যাদির ক্ষেত্রে অব্যাপ্তি হয়। কারণ এখানে বহ্নি সাধ্য এবং হেতু ধূম। বহ্নির অধিকরণ যেমন পর্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানস হয় তেমনই অয়োগোলকও হয়। সাধ্যের ওই অধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্ব হেতু ধূমে নেই কারণ অয়োগোলক ধূম থাকে না। অথচ বহ্নির অনুমানে ধূম একটি সর্ববাদী সম্মত সদ্ধেতু। এই বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখেই কেবল সামানাধিকরণ্যকে ব্যাপ্তি না বলে 'সাধনাশ্রয়াশ্রিত সামানাধিকরণ্য'কেই ব্যাপ্তি বলা হয়েছে। বক্তব্য এই সাধন অর্থাৎ হেতুর আশ্রয়ে আশ্রিত যে সাধ্য তাদৃশ সাধ্যের সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি। আলোচ্যস্থলে সাধন যে ধূম অয়গোলক তার আশ্রয় নয়, অনাশ্রয়। পক্ষান্তরে পর্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানস হল ধূমের আশ্রয়। ওই সব আশ্রয়ে আশ্রিত সাধ্যের সামানাধিকরণ্য ধূমে রয়েছে। কেননা ওই অধিকরণগুলির প্রতিটিতেই ধূম রয়েছে। সুতরাং সাধনাশ্রয়ে আশ্রিত সাধ্যের সামানাধিকরণ্য হেতু ধূমে থাকায় আর অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয় না। এইভাবে দেখলে হেতুর আশ্রয়ে আশ্রিত সাধ্যের সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি হয়।

কিন্তু 'সাধনাশ্রয়াশ্রিত সামানাধিকরণ্য'– এইমাত্র ব্যাপ্তির লক্ষণ বললে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থেকে যায়। কারণ 'পর্বতঃ ধূমবান্ বহ্নেঃ' এইরূপ অনুমিতি স্থলে সাধন যে বহ্নি

তার আশ্রয়ে ধূম আশ্রিতই হয়। অতএব পর্বতাদি বহ্নির আশ্রয়গুলিতে ধূমের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তাই ধূম সাধনাশ্রয়ে আশ্রিত সাধ্য। সেই সাধ্যের সামানাধিকরণ্য বহ্নিতে থাকায় লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যায়। অথচ ধূমের অনুমানে বহ্নি একটি অসদ্ধেতু হিসাবেই গণ্য হয়। ব্যাপ্তির লক্ষণটির এরূপ অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা দূর করতেই লক্ষণে 'অশেষ' বিশেষণটি নিবেশিত হয়েছে। 'অশেষ' কথার অর্থ অন্তহীন বা যাবতীয়। বক্তব্য এই যাবৎ সাধনের আশ্রয়ে আশ্রিত যে সাধ্য সেইরূপ সাধ্যের সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি। একথা ঠিক যে হেতু বহ্নির মহানসাদি কিঞ্চিৎ আশ্রয়ে সাধ্য ধূম আশ্রিত হয় তাই এক হিসাবে বহ্নিতে সাধনাশ্রয়ে আশ্রিত সাধ্যের সামানাধিকরণ্য থাকে। কিন্তু বহ্নির আশ্রয় যে অয়োগোলক তাতে সাধ্য ধূম আশ্রিত নয়। কাজেই যাবৎ সাধনের আশ্রয়ে আশ্রিত যে সাধ্য তার সামানাধিকরণ্য বহ্নিতে থাকে না। তাই বহ্নিতে সাধনাশ্রয়াশ্রিত সাধ্যের সামানাধিকরণ্য থাকলেও যাবৎ সাধনাশ্রয়াশ্রিত সাধ্যের সামানাধিকরণ্য না থাকায় ব্যাপ্তির লক্ষণের সমন্বয় হয় না। ফলত অতিব্যাপ্তির কোনো আশঙ্কাও থাকে না।

২.৭.৩ ব্যাপ্তিগ্রহ প্রসঙ্গ

এইভাবে ব্যাপ্তির লক্ষণ নিরূপণের অনন্তর বেদান্তী ব্যাপ্তিগ্রহের উপায় প্রদর্শন করেছেন। বৌদ্ধ দর্শনে তাদাত্ম্য ও তদুৎপত্তি এই দুটিকে ব্যাপ্তিগ্রহ বা অবিনাভাব নিশ্চয়ের উপায় হিসাবে মানা হয়েছে। জৈনরা ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের উপায় হিসাবে তর্ক বা ঊহের কথা বলেছেন। ন্যায় দর্শনে তর্ক ছাড়াও অন্বয়, ব্যতিরেক, ব্যভিচারাগ্রহ, উপাধিনিরাশ ও সামান্যলক্ষণ প্রত্যক্ষকে ব্যাপ্তিগ্রহের উপায় হিসাবে মানা হয়েছে। বেদান্তী ব্যাপ্তিগ্রহের উপায় হিসাবে বলেছেন ব্যভিচারঅদর্শন সহকৃত সহচারদর্শনের কথা। ব্যাপ্তির লক্ষণ নিরূপণের পর ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র

ব্যাপ্তি গ্রহের উপায় নির্দেশ করছেন এইভাবে– "সা চ ব্যভিচারাজ্ঞানে সতি সহচারদর্শনেন গৃহ্যতে"[৯৮] অর্থাৎ ব্যভিচারের অদর্শন সহকৃত সহচারদর্শনের দ্বারা ব্যাপ্তির গ্রহণ হয়। সহচার বলতে বোঝায় সহ উপস্থিতিকে। দুটি বিষয়ের একই অধিকরণে উপস্থিতি হল সহচার। ব্যাপ্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে এই সহচারদর্শন আবশ্যক। হেতু সাধ্যের সহচারদর্শনের দ্বারাই সচরাচর ব্যাপ্তির গ্রহণ হয়ে থাকে। কিন্তু কেবল সহচারদর্শন দ্বারা ব্যাপ্তি সম্বন্ধের নিশ্চয় হয় না। প্রায় সর্বত্রই পার্থিব পদার্থে লৌহলেখ্যত্ব পরিলক্ষিত হয়। তথাপি এই ভূয়ঃসহচারদর্শন দ্বারা পার্থিবত্ব ও লৌহলেখ্যত্বের ব্যাপ্তি নিশ্চয় হয় না। মণির ক্ষেত্রে পার্থিবত্বের উপস্থিতি সত্ত্বেও লৌহলেখ্যত্ব উপস্থিত থাকে না। একথা বিবেচনা করেই অন্নংভট্ট ব্যভিচারজ্ঞান বিরহ সহকৃত সহচারদর্শনকে[৯৯] ব্যাপ্তিগ্রহের অন্যতম উপায় হিসাবে মেনেছেন তাঁর তর্কসংগ্রহ দীপিকায়। পরিভাষাকারও এই কারণে ব্যভিচারঅদর্শন সহকৃত সহচারদর্শনকে ব্যাপ্তিগ্রহের কারণ হিসাবে মেনেছেন। তাঁর মতে কেবল ব্যভিচারদর্শন বা কেবল ব্যভিচারের অদর্শন দ্বারা ব্যাপ্তি নিশ্চয় হয় না; পরন্তু ব্যভিচারদর্শন বিশিষ্ট সহচারদর্শনকে ব্যাপ্তিগ্রহের উপায় বলেছেন। ব্যভিচার হল সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব। সাধ্যের অভাবের অধিকরণ হল সাধ্যাভাববৎ। ওই অধিকরণে বর্তমান যে হেতু তাহল সাধ্যাভাববৎ বৃত্তি বা ব্যভিচারী। যেমন- ধূমের অনুমানে বহ্নি হল সাধ্যাভাববৎ বৃত্তি বা ব্যভিচারী। কারণ সাধ্য ধূমের অভাবের অধিকরণ যে অয়োগোলক তাতে বহ্নি হেতুটি থাকে। যেখানে ব্যভিচারনিশ্চয় থাকে সেই হেতুর ক্ষেত্রে অসংখ্য সহচারের দৃষ্টান্ত থাকলেও ব্যাপ্তি সিদ্ধ হতে পারে না। প্রকৃত ব্যাপ্তির ক্ষেত্রে

---

[৯৮] তদেব, পৃষ্ঠা- ১১৭।

[৯৯] "ব্যভিচারজ্ঞানবিরহসহকৃতসহচারজ্ঞানস্য ব্যাপ্তিগ্রাহকত্বাৎ", শ্রী পঞ্চানন শাস্ত্রী, *তর্কসংগ্রহ,* ১৩৯২, পৃষ্ঠা- ১২৮।

কোনোরূপ, ব্যভিচার থাকতে পারে না। একথা বিবেচনায় রেখে ব্যভিচার শূন্য বা ব্যভিচারের অদর্শন সহকৃত যে সহচারদর্শন তাকে ব্যাপ্তিগ্রহের উপায় বলে মানা হয়েছে।

বেদান্ত মতে, তাদাত্ম্য বা তদুৎপত্তি দ্বারা ব্যাপ্তি গৃহীত হতে পারে না। কারণ ব্যাপ্তির এমন বহু ক্ষেত্র রয়েছে যেখানে লিঙ্গ ও লিঙ্গীর মধ্যে তাদাত্ম্য বা তদুৎপত্তি কোনোটিই নেই। যেমন বহু দৃষ্টান্তে রূপ ও রসের সহ উপস্থিতি লক্ষ্য করে কেউ রসের দ্বারা রূপের অনুমান করতে পারে। ওই অনুমান যথার্থই; যদিও ওই স্থলে রসের সঙ্গে রূপের তাদাত্ম্য বা তদুৎপত্তি কোনো সম্বন্ধই নেই। পরন্তু ব্যভিচার জ্ঞানের অভাব সহকৃত সহচারদর্শনই এইক্ষেত্রে ব্যাপ্তিগ্রহের হেতু নয়।

একইভাবে বেদান্তী ব্যাপ্তিগ্রহ বিষয়ে ভাট্টমতেরও নিরাকরণ করেছেন।[১০০] কুমারিল ভূয়ঃসহচারদর্শনকে ব্যাপ্তিগ্রহের উপায় হিসাবে মেনেছেন। কিন্তু বেদান্তী মনে করেন ঠিক কতবার সহচারদর্শন হলে ব্যাপ্তিরনিশ্চয় হবে তা কেউ বলতে পারে না। অসংখ্য ক্ষেত্রে সহচারদর্শন হলেও লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধটি ব্যাপ্তি বলে গণ্য হবে না। যদি একটি ক্ষেত্রেও ব্যভিচার দৃষ্ট হয়। অন্যদিকে এমন ক্ষেত্রও রয়েছে যেখানে বারংবার সহচারদর্শন ছাড়াই কেবলমাত্র একটি সহচারদর্শন এবং ব্যভিচারেরঅদর্শন ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের হেতু হয়। যেমন- ‘তদরূপবান্ তদ্‌রসাৎ’ এরূপক্ষেত্রে একটি দৃষ্টান্তে হেতু সাধ্যের সহ উপস্থিতি দর্শন দ্বারাই ব্যাপ্তি গ্রহণ সম্ভব হয়। তাছাড়া যেখানে লঘুভূত সহচারদর্শনই কারণ হয়, সেখানে গুরুভূত

[১০০] “তচ্চ সহচারদর্শনং...”, শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য শাস্ত্রি, *বেদান্তপরিভাষা*, ১৮৮৩, পৃষ্ঠা- ১২৫।

সহচারদর্শন অর্থাৎ সকৃত সহচারদর্শন বা ভূয়ঃসহচারদর্শন ব্যাপ্তি নিশ্চয়ের হেতু হতে পারে না।

তৃতীয় অধ্যায়

নব্য ন্যায়ে ব্যাপ্তি

নৈয়ায়িকের ব্যাপ্তি সম্বন্ধের গুরুত্ব কতখানি তা ন্যায়ের যেকোনো গ্রন্থ পাঠ করলেই বোঝা যায়। প্রাচীন থেকে নব্য সকল ন্যায়াচার্যই এই লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধের স্বরূপ নিরূপণে যত্নবান হয়েছেন। তবে ব্যাপ্তি সম্বন্ধের স্বরূপ বিশ্লেষণ তার নিরতিশয় রূপ লাভ করেছে নব্য ন্যায়ে। এই ব্যাপারে যার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখের দাবি রাখে তিনি হলেন নব্য ন্যায়ের প্রবক্তা গঙ্গেশ উপাধ্যায়। গঙ্গেশ তাঁর "তত্ত্বচিন্তামণি"র ব্যাপ্তিবাদ প্রকরণে ব্যাপ্তি সম্বন্ধের অভিনবত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। ব্যাপ্তি কী তা বলতে গিয়ে তিনি প্রথমে ব্যাপ্তি আসলে কী নয় তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন অনুমান খণ্ডের অন্তর্গত ব্যাপ্তিবাদে। সেখানে একে একে 'অব্যভিচরিতত্ব' পদ প্রতিপাদ্য মীমাংসক সম্মত পঞ্চলক্ষণ যে ব্যাপ্তির প্রকৃত লক্ষণ নয় তা যেমন তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন তেমনই 'সিংহ-ব্যাঘ্র'-কৃত লক্ষণদ্বয় বা সৌন্দড় উপাধ্যায় প্রদত্ত লক্ষণগুলিও যে ব্যাপ্তির প্রকৃত পরিচায়ক নয় সে কথাও প্রতিষ্ঠা করেছেন মণিকার। এইভাবে পূর্বপক্ষী প্রদত্ত লক্ষণগুলি খণ্ডনের অনন্তর ব্যাপ্তি প্রকৃত পক্ষে কি তার পরিচয় তিনি দিয়েছেন সিদ্ধান্ত লক্ষণে। মণিকারের ওই লক্ষণ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা পরবর্তী নব্য নৈয়ায়িকদের রচনায় বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে মথুরানাথ, রঘুনাথ, গদাধর ও জগদীশের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরও পরবর্তীকালে নব্যন্যায়ের উপর কিছু সহজগ্রন্থ রচিত হয়েছে যেগুলিতে গঙ্গেশকৃত ব্যাপ্তির সিদ্ধান্তলক্ষণের অনুসরণে ব্যাপ্তির নানা লক্ষণ গঠন করেছেন নব্য অনুগামীরা। এর মধ্যে যেমন ভাষাপরিচ্ছেদকার বিশ্বনাথের লক্ষণ রয়েছে তেমনই

তর্কসংগ্রহকার অন্নংভট্টের লক্ষণও রয়েছে। নব্য পরম্পরায় বিশেষভাবে আলোচিত ওই লক্ষণগুলি কয়েকটি বিবেচনা করা হবে এই অধ্যায়ে।

৩.১ গঙ্গেশ প্রদত্ত ব্যাপ্তির সিদ্ধান্ত লক্ষণ

প্রথমেই নব্যন্যায়ের পুরোধা মহামতি গঙ্গেশের সিদ্ধান্তলক্ষণটির উপর আলোকপাত করা যাক। লক্ষণটি এইরূপ – "প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণযৎসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতা-বচ্ছেদকাবচ্ছিন্নং যন্ন ভবতি তেন সমং তস্য সামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ"।[১] সহজ কথায় যে অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগীর অসমানাধিকরণ অর্থাৎ প্রতিযোগীর অধিকরণে অবৃত্তি হয় অথচ যার সমানাধিকরণ অর্থাৎ যার অধিকরণে বৃত্তি হয়, সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম দ্বারা অবছিন্ন নয় যা, তার সঙ্গে তার সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি। আলোচ্য লক্ষণে 'যৎ সামানাধিকরণ' অংশের অন্তর্গত 'যৎ' শব্দটি হেতুর বাচক। পক্ষান্তরে 'যন্ন ভবতি' এই অংশে 'যৎ' শব্দটি সাধ্যের বাচক। ফলে লক্ষণটির ফলিত অর্থ দাঁড়ায় হেতুসমানাধিকরণ অর্থাৎ হেতুর অধিকরণে বৃত্তি হয় কিন্তু প্রতিযোগীর অসমানাধিকরণ অর্থাৎ প্রতিযোগীর অধিকরণে অবৃত্তি হয় এমন যে অত্যন্তাভাব সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগি-তাবচ্ছেদক ধর্ম যার বা যে সাধ্যের ধর্ম নয় সেই রূপ সাধ্যের সঙ্গে সেই রূপ হেতুর সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি।

'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এই সদ্ধেতুক স্থলে লক্ষণটিকে প্রয়োগ করা যাক। এখানে হেতুর সমানাধিকরণ অত্যন্তাভাব হল ধূমের অধিকরণ পর্বতাদিতে বর্তমান অত্যন্তাভাব, যেমন ঘটের অত্যন্তাভাব। এই অত্যন্তাভাব প্রতিযোগী ঘটাদির অধিকরণে অবৃত্তি। কারণ যে অধিকরণে

[১] শ্রী কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, *তত্ত্বচিন্তামণি*, পৃষ্ঠা- ১০০।

ঘটাদি থাকে সেই অধিকরণে ঘটাদির অত্যন্তাভাব থাকতে পারে না। ওইরূপ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হল ঘটত্ব। ওই ঘটত্ব ধর্ম দ্বারা অবছিন্ন নয় এমন পদার্থ হল বহ্নি। ওইরূপ বহ্নির সাথে ধূমের সামানাধিকরণ্য রয়েছে মহানসাদিতে। সুতরাং সদ্ধেতুতে লক্ষণটির সমন্বয় হয়।

পক্ষান্তরে 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' - এই অসদ্ধেতুক অনুমিতির ক্ষেত্রে হেতু হল বহ্নি। এই বহ্নির অধিকরণ হল অয়োগোলক। তাতে বর্তমান অত্যন্তাভাব ধূমের অভাব। সেই অভাব প্রতিযোগীর অধিকরণে অবৃত্তি অর্থাৎ যেখানে প্রতিযোগী ধূম যাকে, যেমন মহানসাদি, সেখানে ধূমের অত্যন্তাভাব থাকে না। কাজেই ধূমের অত্যন্তাভাবটি একাধারে হেতুর অধিকরণে বৃত্তি এবং প্রতিযোগীর অধিকরণে অবৃত্তি। এই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদ ধর্ম ধূমত্ব। সাধ্যকে ওই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন ভিন্ন হতে হবে। কিন্তু বাস্তবে সাধ্য ধর্ম ওই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন থেকে ভিন্ন হয় না। সুতরাং এক্ষেত্রে লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ায় অসৎ হেতুর ক্ষেত্রে লক্ষণটির অতিব্যাপ্তির আর কোনো আশঙ্কা থাকে না।

কিন্তু মণিকারকৃত লক্ষণের যথাশ্রুতার্থ গ্রহণ করলে 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' স্থলে লক্ষণটির অব্যাপ্তি দেখা দেয়। কারণ এখানে হেতুসমানাধিকরণ অত্যন্তাভাব হবে ধূমের অধিকরণ পর্বত বৃত্তি অত্যন্তাভাব। এটি মহানসীয় বহ্নির অত্যন্তাভাব হতে পারে। কারণ মহানসীয় বহ্নি পর্বতে কখনই থাকে না। একইভাবে এটি ধূমের অধিকরণ মহানস বৃত্তি পর্বতীয় বহ্নির অত্যন্তাভাব হতে পারে। আর এভাবে দেখলে চালুনীয় ন্যায়ে ধূম সমানাধিকরণ অত্যন্তাভাব বহ্নি সামান্যের অত্যন্তাভাব হয়ে যেতে পারে। ওই অত্যন্তাভাব প্রতিযোগী বহ্নির অধিকরণে অবৃত্তি এবং হেতুর অধিকরণে বৃত্তি। এই বহ্নি সামান্যের অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হবে বহ্নিত্ব।

ওই বহ্নিত্ব দ্বারা সাধ্যটি অবচ্ছিন্ন হওয়া চলবে না। অথচ বাস্তবে সাধ্য বহ্নি বহ্নিত্বের দ্বারাই অবচ্ছিন্ন। সুতরাং 'প্রতিযোগতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন যন্ন ভবতি' এই দাবি পূরণ না হওয়ায় লক্ষণটি আর আলোচ্য ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে না।

৩.১.১ সিদ্ধান্ত লক্ষণের রঘুনাথকৃত ব্যাখ্যা

এই অব্যাপ্তির আশঙ্কা দূর করার লক্ষ্যে দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণি এই লক্ষণটিকে ঈষৎ পরিবর্তন ঘটান। তিনি লক্ষণটি উপস্থাপন করেন এইভাবে- ''প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণেতি, প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণ যদ্রূপবিশিষ্টসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবপ্রতিযোগিতানবচ্ছেদকো যো ধর্ম্মস্তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নেন যেন কেনাপি সমং সামানাধিকরণ্যং তদ্রূপবিশিষ্টস্য তদ্ধর্ম্মাবচ্ছিন্নযাবন্নিরূপিতা ব্যাপ্তিঃ''[২] অর্থাৎ যে অত্যন্তাভাব প্রতিযোগীর অসমানাধিকরণ হয়ে হেতুটি যদ্রূপ বিশিষ্ট সেই হেতুতাবচ্ছেদক বিশিষ্ট হেতুর সমানাধিকরণ হয়ে সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক যে ধর্ম সেই ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে কোনো কিছুর হেতুতাবচ্ছেদক বিশিষ্টের সঙ্গে সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি। সহজ কথায় প্রতিযোগীর অধিকরণে নাই অথচ হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অধিকরণে আছে যে অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন যে সাধ্যতাবচ্ছেদক, সেই সাধ্যতাবচ্ছেদকাবছিন্ন যে কোনো সাধ্যের সঙ্গে হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি। গঙ্গেশকৃত লক্ষণের সঙ্গে রঘুনাথকৃত লক্ষণের তফাৎ এখানেই যে গঙ্গেশ সেখানে 'যৎ সমানাধিকরণ' কথাটি ব্যবহার করেছেন সেখানে রঘুনাথ 'যদ্রূপবিশিষ্টসমানাধিকরণ' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। অর্থাৎকিনা হেতুর সমানাধিকরণ না বুঝিয়ে হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের সমানাধিকরণ বোঝাতে

---

[২] শ্রী কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, *তত্ত্বচিন্তামণি দীধিতি-বিবৃতি*, ১৯১০, পৃষ্ঠা- ৬১০।

চেয়েছেন। একই ভাবে ‘প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নং যন্ন ভবতি’ কথাটির পরিবর্তে রঘুনাথ ‘প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক যো ধর্মঃ’ এই কথাটি ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ গঙ্গেশ বুঝিয়েছেন প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক দ্বারা অবছিন্ন নয় যা সেই সাধ্যকে আর রঘুনাথ বুঝিয়েছেন প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ভিন্ন যে সাধ্যতাবচ্ছেদক তাকে। সহজ কথায় সাধ্যের পরিবর্তে তিনি যেমন সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্মের কথা বলেছেন তেমনই প্রতিযোগীর ক্ষেত্রেও প্রতিযোগীবৃত্তি ধর্মের কথা বলেছেন। উভয় ক্ষেত্রেই তিনি ধর্মীর পরিবর্তে ধর্মের কথা বলেছেন। এভাবে সমগ্র লক্ষণটির অর্থ দাঁড়ায় প্রতিযোগীর অধিকরণে নেই অথচ হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অধিকরণে থাকে যে অত্যন্তাভাব সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ভিন্ন যে সাধ্যতাবচ্ছেদক, সেই সাধতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন যেকোনো সাধ্যের সাথে হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি।

কিন্তু রঘুনাথ প্রদত্ত লক্ষণকে অনুসরণ করে অত্যন্তাভাবটিকে যদি যদ্রূপ বিশিষ্ট সমানাধিকরণ অর্থাৎ হেতুতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন হেতুর সমানাধিকরণ অত্যন্তাভাব হিসেবে ধরা হয় তাহলে ধূম সমানাধিকরণ অত্যন্তাভাব কখনই বহ্নি সামান্যের অত্যন্তাভাব হবে না। কারণ এক্ষেত্রে পর্বত বৃত্তি যে ধূম হেতু হয়েছে তার হেতুতাবচ্ছেদক হল পর্বতীয় ধূমত্ব। পর্বতীয় ধূমত্ব ধর্ম পুরস্কারে ধূমের অধিকরণ কেবল পর্বতই হতে পারে, মহানসাদি হতে পারে না। সেই পর্বতীয় ধূমত্বাবচ্ছিন্ন ধূম সমানাধিকরণ অত্যন্তাভাব হল মহানসীয় বহ্নির অভাব। ওই মহানসীয় বহ্নির অভাবের প্রতিযোগিতাবছেদক মহানসীয় বহ্নিত্বই হবে। আর তা সাধ্যতার অনবচ্ছেদক। কারণ সাধ্যতার অবচ্ছেদক ধর্ম হল বহ্নিত্ব। তাছাড়া মহানসীয় বহ্নিত্ব কোনো জাতি নয়, যদিও বহ্নিত্ব জাতি। সুতরাং প্রতিযোগীর অসমানাধিকরণ যেরূপ বিশিষ্ট হেতুর

সমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবের কথা আলোচ্য ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ধর্ম মহানসাদিতে বিদ্যমান তৎ তৎ বহ্নিত্ব হওয়ায় প্রতিযোগিতানবচ্ছেদক সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন সাধ্যের সঙ্গে হেতুতাবচ্ছেকাবচ্ছিন্ন হেতুর সামানাধিকরণ্য থাকতে কোনো বাধা নেই এবং সামান্য রূপে বহ্নিত্ব না হওয়ায় সে কারণে তার প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদক ধর্ম তৎ তৎ বহ্নিত্বই হয়, সামান্যভাবে বহ্নিত্ব হয় না।

'ভাষাপরিচ্ছেদ' গ্রন্থে ব্যাপ্তির আলোচনা প্রসঙ্গে তিনটি ব্যাপ্তির লক্ষণের উল্লেখ করা হয়েছে। যার মধ্যে প্রথমটি মণিকারের ব্যাপ্তিপঞ্চক গ্রন্থে উল্লিখিত পাঁচটি লক্ষণের অন্তর্গত 'সাধ্যাভাববৃত্তিত্বম্' এই প্রথম লক্ষণেরই পুনরাবৃত্তি। তবে মুক্তাবলীকার এই লক্ষণটির কোনো রূপ ব্যাখ্যা করেননি। মুক্তাবলীতে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় লক্ষণের ব্যাখ্যা উপন্যস্থ হয়েছে। ওই লক্ষণদ্বয়ের প্রথমটি দুষ্ট এবং দ্বিতীয়টি নির্দোষ হিসাবে মুক্তাবলীতে ব্যাখ্যাত হয়েছে। লক্ষণ দুটি একে একে আলোচনা করা যাক।

৩.২ ব্যাপ্তি বিষয়ে ভাষাপরিচ্ছেদকারের মত

ভাষাপরিচ্ছেদের ৬৮তম কারিকায় বলা হয়েছে "ব্যাপ্তিঃ সাধ্যবদন্যস্মিন্নসম্বন্ধ উদাহৃতঃ"[৩] অর্থাৎ ব্যাপ্তি হল সাধ্যবদন্যের সঙ্গে অসম্বন্ধ। সাধ্যবদন্য হল সাধ্যবদ্‌ভিন্ন অর্থাৎ কিনা সাধ্যাভাবাধিকরণ। সেই সাধ্যাভাবাধিকরণের সঙ্গে হেতুর অসম্বন্ধই হল ব্যাপ্তি। যেমন 'বহ্নিমান্ ধুমাৎ' স্থলে সাধ্য বহ্নির অধিকরণ মহানসাদি হল সাধ্যবদ্ আর তদভিন্ন জলাশয়াদি হল সাধাবদন্য। ওই সাধ্যবদন্যের সঙ্গে হেতু ধূমের সম্বন্ধ নাই। তাই ধূম বহ্নির সম্বন্ধ ব্যাপ্তি

[৩] *ভাষাপরিচ্ছেদ-* ৬৮।

লক্ষণাক্রান্ত হয় এবং ধূম ব্যাপ্তির আশ্রয় হিসাবে প্রতিপাদিত হয়। অন্যদিকে, 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' স্থলে সাধ্য ধূমের অধিকরণ মহানসাদি হল সাধ্যবদ্। ওই ধূমাধিকরণসমূহ ভিন্ন অয়োগোলক হল সাধ্যবদন্য। সেই সাধ্যবদন্যে হেতু বহ্নি উপস্থিত থাকায় লক্ষণ সমন্বয় হয় না। ফলে লক্ষ্যে যেমন লক্ষণটির সমন্বয় ঘটে তেমনই অলক্ষ্যে লক্ষণটির সমন্বয় হয় না। ফলত প্রাথমিকভাবে লক্ষণটিতে অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না।

তবে লক্ষণস্থ 'সাধ্যবদ্' বা 'সাধ্যবান্' পদের দ্বারা এখানে যে সম্বন্ধে সাধ্য ধরা হয়েছে সেই একই সম্বন্ধে সাধ্যবান্‌কে গ্রহণ করতে হবে একথাই স্পষ্ট হয়েছে মুক্তাবলীতে। সেখানে বলা হয়েছে– "যেন সম্বন্ধেন সাধ্যং, তেনৈব সম্বন্ধেন সাধ্যবান্ বোধ্যঃ"।[৪] অন্যথা সমবায় সম্বন্ধে সাধ্য বহ্নির অধিকরণ বহ্ন্যবয়ব সাধ্যবদ্ এবং তদ্ভিন্ন মহানসাদি সাধ্যবদন্য বলে গণ্য হবে। ওই মহানসাদিতে হেতু ধূম থাকায় সাধ্যবদন্যের সঙ্গে হেতুর সম্বন্ধই সিদ্ধ হবে, অসম্বন্ধ নয়। ফলে লক্ষণটির অব্যাপ্তি দোষ ঘটবে। অথচ যে সংযোগ সম্বন্ধে বহ্নিকে সাধ্য করা হয়েছে সেই সংযোগ সম্বন্ধে সাধ্যবান্ ধরলে বহ্ন্যবয়ব আর সাধ্যবান্ হবে না; হবে মহানসাদি। আর সাধ্যবদন্য হবে জলাশয়াদি। সেখানে ধূম না থাকায় অব্যাপ্তির আশঙ্কাও থাকবে না।

একইভাবে লক্ষণান্তর্গত সাধ্যবদন্যকে "সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকভেদবান্ বোধ্যঃ"[৫] অর্থাৎ যে ভেদের প্রতিযোগিতা সাধ্যবত্ত্বের দ্বারা অবচ্ছিন্ন সেই ভেদবিশিষ্ট রূপে ধরতে হবে। সহজকথায়, এর অর্থ হল যাবৎ সাধ্যবদ্‌ভিন্ন। এই অর্থে যদি সাধ্যবদন্য গ্রহণ করা না হয় তাহলে বিশেষ সাধ্যবদভিন্ন পদার্থ সাধ্যবদন্য বলে গণ্য হবে। সেক্ষেত্রে সাধ্য

---

[৪] শ্রী পঞ্চানন শাস্ত্রী, *ভাষাপরিচ্ছেদ*, ২০১৬, পৃষ্টা- ৩২৬।

[৫] তদেব, পৃষ্ঠা- ৩২৭।

বহ্নির বিশেষ অধিকরণ পর্বত ভিন্ন যে মহানস তা সাধ্যবদন্য হিসাবে প্রতিপন্ন হবে। আর সেই মহানসে হেতু ধূম থাকায় লক্ষণটির পুনরায় অব্যাপ্তি দোষ ঘটবে। অথচ যাবৎ সাধ্যবদ্‌ভিন্ন অর্থে 'সাধ্যবদন্য'কে গ্রহণ করলে মহানসাদি ধূমাধিকরণ আর সাধ্যবদন্য হবে না। সেক্ষেত্রে জলাশয়াদি হবে সাধ্যবদন্য, যেখানে ধূম না থাকায় অব্যাপ্তির আশঙ্কা দূর হবে।

লক্ষণস্থ 'অসম্বন্ধ' পদটি 'অবৃত্তিত্ব' বা 'বৃত্তিত্বাভাবের' বাচক। এই বৃত্তিত্বভাব আবার যে সম্বন্ধে হেতুতা সিদ্ধ হয় সেই সম্বন্ধে এবং বৃত্তিতত্ব ধর্ম পুরস্কারে বৃত্তিত্বের অভাব হিসাবে গণ্য। বৃত্তিত্বাভাব নিরূপনের সময় হেতুতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধটি বিচারে রাখা প্রয়োজন, তা নাহলে 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' অনুমিতির স্থলে সাধ্যবদন্য যে ধূমাবয়ব তাতে সমবায় সম্বন্ধে ধূম বর্তমান থাকায় সাধ্যবদন্য নিরূপিত বৃত্তিত্বই হেতুতে পাওয়া যাবে এবং সদ্ধেতুতে লক্ষণ সমন্বয় হবে না। পক্ষান্তরে, যেহেতু ধূমে হেতুতা সংযোগসম্বন্ধে সিদ্ধ হয়েছে তাই হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ এক্ষেত্রে সংযোগ। ওই সংযোগ সম্বন্ধে ধূম ধূমাবয়বে না থাকায় লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যাবে।

একইভাবে, সাধ্যবদন্য নিরূপিত বৃত্তিত্বার অভাবটিকে যদি বৃত্তিত্বাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্বাভাব হিসাবে গণ্য করা না হয় তাহলে 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' স্থলে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটবে। কারণ এখানে সাধ্যবদন্য জলাশয় নিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাব বহ্নিতে বর্তমান। কিন্তু সাধ্যবদন্য যে অয়োগোলক তন্নিরূপিত বৃত্তিত্বই বহ্নিতে বর্তমান। তাই বৃত্তিত্বাভাব বলতে যদি বৃত্তিতত্বত্বাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্বের অভাব বা সকল বৃত্তিত্বের অভাব ধরা হয় তাহলে হেতু বহ্নিতে তা পাওয়া যাবে না এবং অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটবে না।

এইভাবে লক্ষণটিকে ব্যাখ্যা করলে 'সাধ্যবদন্যস্মিন্নসম্বন্ধ' লক্ষণটির সম্পূর্ণ রূপ দাঁড়ায়- "সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক ভেদবান নিরূপিত হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্বত্বাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্বাভাব"। কিন্তু এই পরিবর্ধিত ব্যাপ্তির লক্ষণটিও নির্দোষ নয়। লক্ষণ শরীরে এই বিশেষণগুলি আরোপ করার পরেও দুটি সদ্ধেতুক স্থলে লক্ষণটির অব্যাপ্তি দোষ ঘটে। যেমন– 'ঘটো অভিধেয়ঃ প্রমেয়ত্বাৎ' এই অনুমিতির স্থলটিতে অভিধেয়ত্ব হল সাধ্য। নিখিল পদার্থ অভিধেয় বা অভিধার বিষয় হওয়ায় সকল পদার্থই হয় সাধ্যবৎ আর সেই কারণেই সাধ্যবদন্য হয় অসিদ্ধ। আর যা অসিদ্ধ তার সঙ্গে সম্বন্ধ কিংবা সম্বন্ধের অভাব কোনটিই সিদ্ধ হতে পারে না। ফলে সাধ্যবদন্য নিরূপিত অবৃত্তিত্বটি হেতু প্রমেয়ত্বে থাকে না। যদিও প্রময়েত্বের যাবতীয় অধিকরণে অভিধেয়ত্ব থাকায় তা একটি সদ্ধেতুই হয়।

অন্যদিকে 'সত্তাবান্ জাতেঃ' এই অনুমিতির স্থলটিতে সাধ্যবদন্য অসিদ্ধ না হলেও তন্নিরূপিত হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্বটি অসিদ্ধ হয়। কারণ এখানে সাধ্য সত্তা হওয়ায় সেই সত্তার অধিকরণ দ্রব্য, গুণ, কর্ম হয় সাধ্যবদ্। সেই সাধ্যবদ্ভিন্ন হয় সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব। ওই সামান্যাদিতে কোনো কিছুই সমবায় সম্বন্ধে থাকে না। অথচ আলোচ্য ক্ষেত্রে জাতি হেতু হওয়ায় হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হল সমবায়। সেই সাধ্যবদন্য নিরূপিত সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে বৃত্তিত্ব তা অসিদ্ধ হওয়ায় ওই বৃত্তিত্বের অভাবও অসিদ্ধ। সুতরাং হেতুতে অসিদ্ধ বৃত্তিত্বের অভাব থাকতে পারে না। এভাবে লক্ষণটি সদ্ধেতুক অনুমিতির স্থলে সমন্বিত হতে ব্যর্থ হয়।

এইভাবে দ্বিতীয় লক্ষণে দোষ প্রদর্শনের পর তৃতীয় লক্ষণ প্রদান করতে গিয়ে ভাষাপরিচ্ছেদকার বলেছেন– "অথবা হেতুমন্নিষ্ঠাবিরহাপ্রতিযোগিনা সাধ্যেন হেতোরৈকাধি-করণ্যং ব্যাপ্তিরুচ্যতে"।[৬] হেতুর অধিকরণ হল হেতুমৎ। ওই হেতুমৎ পদার্থে বর্তমান যে বিরহ বা অভাব তা হল হেতুমননিষ্ঠবিরহ। এই বিরহের প্রতিযোগী সেই সকল পদার্থ, হেতুর অধিকরণে যাদের অভাব থাকে। সদ্ধেতুর অধিকরণে সাধ্যের অভাব কখনই থাকে না। সুতরাং সাধ্য হল হেতুমননিষ্ঠবিরহের অপ্রতিযোগী। হেতুর অধিকরণে বর্তমান বিরহের অপ্রতিযোগী যে সাধ্য হেতুর সঙ্গে তাদৃশ সাধ্যের একাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি। সহজকথায়, ব্যাপ্তি হল হেতুর সঙ্গে তাদৃশ সাধ্যের সামানাধিকরণ্য যে সাধ্যের বিরহ বা অভাব কখনই হেতুর অধিকরণে থাকে না। যেমন- হেতু ধূমের অধিকরণ হল মহানসাদি। সেই মহানসাদিতে বর্তমান বিরহ হল পুস্তকাদির বিরহ। এই বিরহের প্রতিযোগী হল পুস্তকাদি। পক্ষান্তরে ধূমের অধিকরণে বহ্নির অভাব কদাপি না থাকায় বহ্নি ধূমাদিকরণনিষ্ঠ বিরহের অপ্রতিযোগী হয়। সুতরাং ধূমের সঙ্গে তাদৃশ বহ্নির যে সম্বন্ধ তা ব্যাপ্তি বলে গণ্য হয়। এই লক্ষণটি উত্থাপিত দুই অব্যাপ্তির আশঙ্কা থেকে মুক্ত। 'ঘটো অভিধেয় প্রমেয়ত্বাৎ' এই অনুমিতির ক্ষেত্রে প্রমেয়ত্বই হেতু হওয়ায় হেতুমৎ হয় প্রমেয়ত্ববিশিষ্ট নিখিল পদার্থ। ওই সকল পদার্থে অভিধেয়ত্বের অভাব কখনই থাকে না ফলে অভিধেয়ত্ব প্রমেয়ত্বের অধিকরণে বর্তমান বিরহের অপ্রতিযোগীই হয়। সুতরাং প্রমেয়ত্ব ও অভিধেয়ত্বের সামানাধিকরণ্য ব্যাপ্তি বলে গণ্য হয়। একইভাবে, জাতির অধিকরণ দ্রব্য, গুণ, কর্মে আর যার অভাব থাকুক সত্তার অভাব কখনই

[৬] *ভাষাপরিচ্ছেদ-* ৬৯।

থাকে না। সুতরাং সত্তা জাতিমান পদার্থে বর্তমান বিরহের অপ্রতিযোগীই হয়। এইভাবে উত্থাপিত অব্যাপ্তির দুটি ক্ষেত্রেই নবগঠিত ব্যাপ্তির লক্ষণে লক্ষণটির সমন্বয় হয়।

৩.৩ অন্নংভট্ট ও কেশব মিশ্রের দৃষ্টিতে ব্যাপ্তি

তর্কসংগ্রহকার অন্নংভট্টও ব্যাপ্তির স্বরূপ নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন "যত্র ধূমস্তত্রাগ্নিরিতি সাহচর্য্যনিয়মো ব্যাপ্তিঃ"[৭] অর্থাৎ যেখানে ধুম সেখানে বহ্নি এই সাহচর্য নিয়মই ব্যাপ্তি। তিনি ধূম শব্দের দ্বারা হেতুকে ও অগ্নি শব্দের দ্বারা সাধ্যকে বুঝিয়েছেন। আবার ধূমের সকল অধিকরণকে বোঝাবার জন্য তিনি 'যত্র যত্র ধূম' এইরূপ শব্দ ব্যবহার করেছেন। তবে ব্যাপ্তির এইরূপ লক্ষণ করলেও 'যত্র ধূম তত্র অগ্নি' এই অংশের দ্বারা তিনি কেবল ব্যাপ্তির অভিনয়ই প্রদর্শিত করেছেন। কাজেই তাঁর মতে 'সাহচর্য্যনিয়মঃ'ই ব্যাপ্তির প্রকৃত লক্ষণ। 'সহ চরতঃ' এই অর্থে দুটি পদার্থ সহগামী হলে বা একসঙ্গে থাকলে তাদের সহচার বলা হয়। আর এই সহচার বা একসঙ্গে থাকাই সাহচর্য বা সহউপস্থিতি। সাহচর্য মানে সামানাধিকরণ্য বা সমান অধিকরণতাকে বোঝায় অর্থাৎ দুটি পদার্থ হেতু ও সাধ্য একই অধিকরণে থাকলে তাদের মধ্যে সাহচর্য বা সামানাধিকরণ্য আছে বলা যায়। অপরদিকে 'নিয়ম' শব্দের অর্থ নিয়ত বা অবশ্যম্ভাবিতা অর্থাৎ যার কোনো ব্যতিক্রম হয় না। কাজেই হেতু ও সাধ্যের নিয়ত সাহচর্যই ব্যাপ্তি। ধুম থাকলে আগুন থাকবেই এখানে হেতু ধূম, সাধ্য আগুন। এখন যদি আগুনকে হেতু ধরে সাধ্য হিসাবে ধূমের অনুমান করতে হয়, তাহলে যেখানে অগ্নি সেখানেই ধূম এই সাহচর্য নিয়ত সম্বন্ধ পাওয়া যাবে না। কারণ ধূম ছাড়াও আগুনের অস্তিত্ব থাকতে পারে। তাই সাহচর্য নিয়মের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অন্নৎভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহ দীপিকায় বলেছেন

[৭] পঞ্চানন শাস্ত্রী, *তর্কসংগ্রহ*, ১৩৯২, পৃষ্ঠা-১২৬।

"হেতুসমানাধিকরণাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিসাধ্যসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ"[৮] অর্থাৎ হেতুর সমান অধিকরণে থাকে যে অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী যে সাধ্য, তার সাথে হেতুর সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি।

'পর্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ'- এরূপ অনুমিতির স্থলে পর্বতে ধূমকে প্রত্যক্ষ করে আমরা যখন বহ্নির অনুমান করি, তখন সেই অনুমানে ধূম হল হেতু, বহ্নি বা আগুন হল সাধ্য এবং পর্বত হল পক্ষ। হেতু ধূমের অধিকরণ হল মহানস, চত্বর, গোষ্ঠ প্রভৃতি। এই সকল ধুমের অধিকরণে যে অত্যন্তাভাব থাকে তা ওই বহ্নির অত্যন্তাভাব হতে পারে না। যেসব স্থানে ধূম থাকে সে সব স্থানে 'বহ্নির্নাস্তি' বা 'বহ্নি নেই' এমন বলা চলে না, বরং 'বহ্নি অস্তি' বা 'বহ্নি আছে' এমন কথাই বলতে হয়। কাজেই ধূম সমানাধিকরণ অত্যন্তাভাব বহ্নি নয়, তা হল বহ্নির অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী বহ্নি। হেতুসমানাধিকরণ অত্যন্তাভাব হল ঘট, পটাদির অত্যন্তাভাব, বহ্নির অত্যন্তাভাব নয়। বহ্নি হল ওই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী। অর্থাৎ কিনা, হেত্বধিকরণ স্থানে যার অত্যন্তাভাব থাকে তা সাধ্যের অত্যন্তাভাব নয়। যেসব স্থানে হেতু থাকে সেসব স্থানে 'সাধ্য নেই' বলা চলে না, বরং 'সাধ্য আছে' এমন কথাই বলতে হয়। কাজেই হেতুসমানাধিকরণ অত্যন্তাভাব সাধ্যের অত্যন্তাভাব নয়, তা হল সাধ্যের অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী অর্থাৎ স্বয়ং সাধ্য। আর এই লক্ষণ অনুসরণ করলে অনুমানের হেতুটিও সদ্ধেতু হয়, অনুসরণ না করলে হেতুটি অসদ্ধেতু হয়।

[৮] তদেব, পৃষ্টা- ১২৬।

আবার কেশবমিশ্র এই ব্যাপ্তির লক্ষণ দিতে গিয়ে তাঁর তর্কভাষায় বলেছেন – "তথাহি যত্র ধুমস্তত্রাগ্নিরিতি সাহচর্যনিয়মো ব্যাপ্তিঃ"[৯] অর্থাৎ যেখানে যেখানে ধূম সেখানে সেখানে বহ্নি এইরূপ সাহচর্যনিয়মই হল ব্যাপ্তি। কাজেই তাঁর মতেও ব্যাপ্তি হল সাহচর্যনিয়ম। সাহচর্য বলতে তিনি সহাবস্থানকে বুঝিয়েছেন। তবে যেকোনো সহাবস্থানকে তিনি ব্যাপ্তি বলেননি তাঁর মতে এই সহাবস্থানকে আবার নিয়ত হতে হবে। যেমন, যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেখানে সেখানে অবশ্যই বহ্নি থাকে, ধূম কখনও বহ্নিকে ছাড়া থাকতে পারে না। কাজেই ধূম বহ্নির সহবস্থান হল নিয়ত। আর এই রূপ ধূমাধিকরণে বহ্নির নিয়ত বিদ্যমানতাই হল ব্যাপ্তি। ধূমের অধিকরণে বহ্নি থাকবেই এইরূপ সাহচর্য নিয়মকে অবিনাভাব সম্বন্ধ বা অনৌপাধিক সম্বন্ধও বলা হয়। কারণ 'নিয়ম' পদার্থ ব্যাপ্তি ঘটিত হওয়ায় আত্মাশ্রয়দোষের প্রসঙ্গ উঠে ফলে কেবলমাত্র সাহচর্য নিয়মকে ব্যাপ্তি বলা যায় না। তাই 'অনৌপাধিক সম্বন্ধ'ই ব্যাপ্তি এরূপ অর্থ বোঝানোর জন্যই এখানে 'নিয়ম' পদটির অবতারণা করা হয়েছে। যে পদার্থ যে পদার্থের অবিনাভাবী, সেই পদার্থকে সেই পদার্থের ব্যাপ্য বলে। ধূম কখনও কোথাও বহ্নি ছাড়া থাকতে পারে না বলে ধূম পদার্থ বহ্নি পদার্থের অবিনাভাবী হওয়ায় ধূম বহ্নির ব্যাপ্য এবং বহ্নি হল ব্যাপক। বহ্নির ব্যাপ্য ধূম হওয়ায় ধূমে বহ্নির ব্যাপ্যত্ব বা ব্যাপ্তি থাকে। ব্যাপ্তি সম্বন্ধের (অনৌপাধিক সম্বন্ধের) প্রতিযোগী হল ব্যাপ্তির নিরূপক ও ব্যাপক এবং আনুযোগী হল ব্যাপ্য। বহ্নির ব্যাপ্তিসম্বন্ধ ধূমে থাকায় ব্যাপ্তিসম্বন্ধের প্রতিযোগী বহ্নি হল ব্যাপক এবং ব্যাপ্তিসম্বন্ধের আশ্রয় ধূম হল ব্যাপ্তির অনুযোগী, তাই ব্যাপ্য।

---

[৯] গঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য, *তর্কভাষা*, ২০১৩, পৃষ্ঠা- ১৪২।

চতুর্থ অধ্যায়

গঙ্গেশ কর্তৃক মীমাংসক সম্মত পঞ্চ ব্যাপ্তিলক্ষণের নিরাকরণ

ব্যাপ্তি বিষয়ে আপন মত মণিকার উপস্থাপন করেছেন তাঁর "সিদ্ধান্ত লক্ষণ" শীর্ষক পরিচ্ছেদে। ওই সিদ্ধান্ত লক্ষণের কথা তৃতীয় অধ্যায়ে ব্যক্ত হয়েছে। তবে ওই সিদ্ধান্ত লক্ষণ প্রদানের পূর্বেই গঙ্গেশ তাঁর অনুমান চিন্তামণির 'ব্যাপ্তিবাদ' অংশে ব্যাপ্তি বিষয়ে পূর্বাচার্যদের নানা লক্ষণ নিরাশ করেছেন। ওই ব্যাপ্তির লক্ষণগুলির মধ্যে 'অব্যভিচরিতত্ব' পদপ্রতিপাদ্য ব্যাপ্তির পঞ্চ লক্ষণ বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। 'ব্যাপ্তিপঞ্চক' পরিচ্ছেদে উল্লিখিত ওই লক্ষণসমূহ; যাদের একত্রে 'পঞ্চলক্ষণী' নামে অভিহিত করা হয় সেই লক্ষণগুলির ব্যাখ্যা এই অধ্যায়ের মুখ্য আলোচ্য।

৪.১ অব্যভিচরিতত্ব পদপ্রতিপাদ্য পঞ্চ লক্ষণের ব্যাখ্যা

লিঙ্গ-লিঙ্গী সম্বন্ধ সম্প্রদায় ভেদে যে নানা নামে আখ্যায়িত হয় তা ইতিপূর্বেই লক্ষ্য করেছি আমরা। মীমাংসক পরম্পরা এই সম্বন্ধটির পরিচিত 'অব্যভিচার' হিসাবে। ব্যভিচার হল ব্যতিক্রম বা নিয়মের লঙ্ঘন। আর অব্যভিচার সেই লঙ্ঘন বা অনিয়মের নিষেধকে সূচিত করে। মীমাংসক মতে লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধটি এমন এক নিয়মের বাচক যার লঙ্ঘন হতে পারে না। 'অব্যভিচার' শব্দের এইরূপ অর্থ করলে তা প্রায় সর্বদর্শন সম্মতই হয়। কিন্তু অব্যভিচারকে যখন ব্যাপ্তির লক্ষণ বলে মীমাংসকরা দাবি করেন তখন তাঁরা আসলে কতকগুলি বিশেষ লক্ষণকে বোঝাতে চান। গুরু প্রভাকর 'অব্যভিচরিতত্ব' পদের প্রতিপাদ্য পাঁচটি বিশেষ লক্ষণের উল্লেখ করেছেন, সেগুলির উল্লেখ তত্ত্বচিন্তামণির ব্যাপ্তিপঞ্চক পরিচ্ছেদেও পাওয়া যায়। ওই লক্ষণ গুলি যথাক্রমে- ১) সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্, ২)

সাধ্যবদ্‌ভিন্নসাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্, ৩) সাধ্যবৎপ্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্যম্, ৪) সকলসাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিত্বম্, ৫) সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বম্।[১] একে একে এই লক্ষণগুলির ব্যাখ্যা ও গঙ্গেশ অনুসরণে সেগুলির নিরাশে প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

৪.১.১ সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্ লক্ষণটির ব্যাখ্যা

৪.১.১.১ লক্ষণটির সমাসার্থ

'অব্যভিচরিতত্ব' পদপ্রতিপাদ্য ব্যাপ্তির পঞ্চ লক্ষণের প্রথমটি হল - ''সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্''। সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্ একটি সমস্তপদ, যেটি নানাভাবে সমাসবদ্ধ হতে পারে। প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ পদটিকে যেভাবে সমাসবদ্ধ করেন তা নব্য নৈয়ায়িকরা অনুমোদন করেন না। একে একে সমস্ত পদটির প্রাচীন ও নব্য সম্মত ব্যাখ্যা পেশ করা যাক।

প্রথমে দেখা যাক সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্ পদটির কিরূপ সমাস প্রাচীনেরা করেন। সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্'' এটি একটি সমস্থ পদ। এই সমস্ত পদটির অর্থ নিরূপণ করতে গিয়ে প্রাচীনেরা লক্ষণান্তর্গত প্রতিটি পদের সমাসবাক্য যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তা প্রথমে বুঝতে হবে। তাঁরা 'বৃত্ত' পদটিকেই মূল পদ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁদের মতে 'বৃত্ত' এবং 'বৃত্তি' পদের অর্থ অভিন্ন। 'বৃত্তম্' পদটি 'বৃৎ' শব্দের উত্তর ভাবে 'ক্ত' প্রত্যয় করে বা প্রথমায় 'বৃত্তী' এর ভাব এই অর্থে 'ত্ব' প্রত্যয় করলে হয় 'বৃত্তিত্ব'। যার অর্থ হল - যা কোন কিছুর আধেয় হয় বা কোন কিছুতে থাকে, তার ধর্ম অর্থাৎ আধেয়তা। 'বৃত্তস্য অভাবঃ অবৃত্ততম্' এইরূপ অব্যয়ীভাব সমাসে 'অবৃত্তিত্বম্' পদটি নিষ্পন্ন। যার অর্থ বৃত্তের অভাব বা না থাকা।

---

[১] '...সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্...সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বম্', শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, *তত্ত্বচিন্তামণি*, ২০১০, পৃষ্ঠা- ২৭।

‘সাধ্যাভাববদবৃত্তম্’ পদটি সাধ্যাভাববতঃ অবৃত্তম্ সাধ্যাভাববদবৃত্তম্ এইরূপ ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস করে নিষ্পন্ন। এর অর্থ সাধ্যের অভাবের অধিকরণতার দ্বারা নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব। ‘সাধ্যাভাববদবৃত্তম্ অস্মিন্ অস্তি’ এই অর্থে সাধ্যাভাববদবৃত্তম্ শব্দের উত্তর মত্বর্থীয় ‘ইন্’ প্রত্যয় করে ‘সাধ্যাভাববদবৃত্তী’ পদটি নিষ্পন্ন হয়। যার অর্থ সাধ্যের অভাবের অধিকরণের দ্বারা নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব যাতে থাকে সেটি হল সাধ্যাভাববদবৃত্তী। আবার ‘সাধ্যাভাববদবৃত্তম্’ শব্দের মত্বর্থীয় ‘ইন্’ প্রত্যয় করে হয় সাধ্যাভাববদবৃত্তিন। আর ‘সাধ্যাভাববদবৃত্তিন’ পদের সঙ্গে ‘ত্ব’ প্রত্যয় যুক্ত করে হয় সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব। এর অর্থ হচ্ছে সাধ্যের অভাবের অধিকরণের দ্বারা নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব যাতে আছে, তার ভাব বা ধর্ম।

নব্য অনুগামী মথুরানাথ প্রাচীনদের এই সমাসার্থ নির্ণয়কে খণ্ডন করেন। তাঁর মতে পাণিনীর একটি অনুশাসন হল “ন কর্মধারেয়ান্মত্বর্থীয়ো বহুব্রীহিশ্চেৎ অর্থ প্রতিপত্তিকর” অর্থাৎ বহুব্রীহি সমাসের দ্বারা যদি কোন পদের অর্থ নিষ্পন্ন হয়, তাহলে সেই পদের কর্মধারয় সমাসের উত্তর মত্বর্থীয় প্রত্যয় হয়। পাণিনী ‘কর্মধারয় সমাস কথার দ্বারা বহুব্রীহি ভিন্ন সমস্ত সমাসকে বুঝিয়েছেন। আর প্রাচীনগণ এই অনুশাসনই লঙ্ঘন করেছেন। ‘সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্’ পদটির অর্থ বহুব্রীহি সমাসে নিষ্পন্ন হয়েছে। অথচ প্রাচীনগণ ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস করে তারপর মত্বর্থীয় ‘ইন’ প্রত্যয় করেছেন অর্থাৎ তাঁরা বহুব্রীহি ভিন্ন তৎপুরুষ সমাস করেছেন - যা অসঙ্গত। দীধিতিকার ‘গুণপ্রকাশরহস্য’ গ্রন্থে অগুণবত্ত্বের সাধর্ম্ম্য ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এই যুক্তিকেই সমর্থন করেছেন। ব্যকরণের নিয়ম অনুসারে অব্যয়ীভাব সমাসের উত্তর পদের সঙ্গে সেই সমাস বহির্ভূত অন্যকোন পদের অন্বয় হয় না। অব্যয়ীভাব সমাস নিষ্পন্ন পদের সঙ্গে সমাস বহির্ভূত অন্য পদের সমাস করলে কাঙ্ক্ষিত অর্থের পরিবর্তে

অন্য অর্থ উপস্থিত হয়ে যায়। যেমন ঘটের অভাব, অঘট অব্যয়ীভাব সমাস। এই সমাসের উত্তরপদ হল 'ঘট'। ভূতলে ঘটের অভাব আছে এইরকম বোঝাতে যদি 'অঘট' এই অব্যয়ীভাব সমাসবদ্ধ পদের উত্তরপদ 'ঘটের' সঙ্গে ভূতলের অন্বয় করা হয় তাহলে 'অঘটভূতল' পদটি পাওয়া যাবে। এর অর্থ হল ভূতলবৃত্তি ঘটাত্যন্তাভাব। বলাবাহুল্য যা অভিপ্রেত অর্থ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। সুতরাং একথাও বলা যায় না ব্যকরণের নিয়ম অনুসারে সাধ্যাভাববদ্‌ের সঙ্গে বৃত্তির অন্বয় সঙ্গত হয়েছে।

এখানে কেউ হয়ত প্রথমে 'বৃত্তেঃ অভাব অবৃত্তি' এইরূপ অব্যয়ীভাব সমাস করে 'সাধ্যাভাববতো অবৃতির্যত্র' এইরূপ বহুব্রীহি সমাস করার পর ভাবার্থে 'ত্ব' প্রত্যয় করে 'সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব' পদটি নিষ্পন্ন হয়েছে বলে দাবি করতে পারেন। তাহলে আর পাণিনীর অনুশাসন লঙ্ঘিত হয় না বলে তাঁরা মনে করেন। কিন্তু মথুরানাথ দেখান যে, এইভাবে প্রথম আপত্তিটি পরিহার করা গেলেও দ্বিতীয় আপত্তিটি পরিহার করা যায় না। কেননা এক্ষেত্রেও সাধ্যাভাববদ্‌ের সঙ্গে উত্তরপদ 'বৃত্ত' এরই অন্বয় হয়েছে। 'সাধ্যাভাববতো বৃত্তম্ সাধ্যাভাববদবৃত্তম্ সাধ্যাভাববক্তৃত্ত্যভাব ইতি যাবৎ' এইভাবে। যা ব্যাকরণের নিয়মে বিরুদ্ধ। ব্যকরণের নিয়ম হল অব্যয়ীভাব সমাসবদ্ধ সমগ্র পদটি অব্যয় হয়ে যায়। এর সঙ্গে অন্য কোন পদের সমাসান্তর হয় না। এই কারণে 'অবৃত্তি' পদটি অব্যয় হয় এবং এই অব্যয়ের সঙ্গে অন্য কোন পদের সমাসান্তর হয় না অর্থাৎ 'সাধ্যাভাববতের' সঙ্গে 'অবৃত্তি'র কোন সমাসই সম্ভব নয়। সুতরাং 'সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্' পদটিকে প্রাচীনগণ যেভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তা ব্যাকরণের অনুশাসন বিরুদ্ধ এবং অসঙ্গত।

নব্যমতে "সাধ্যাভাববতো ন বৃত্তিঃ যত্র" এরূপ ত্রিপদব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস করে তার উত্তর 'ত্ব' প্রত্যয় করে 'সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্' পদটির অর্থ নিষ্পন্ন করতে হবে এবং পদটির বিশ্লেষণও ঐ ভাবেই করতে হবে। 'সাধ্যাভাববতঃ' স্থলে নিরূপিতত্ব অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়েছে আর এর অন্বয় হয়েছে বৃত্তিতার সঙ্গে। এখানে আপত্তি হতে পারে যে, ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সর্বত্র গ্রহণযোগ্য নয়। যেক্ষেত্রে অন্য উপায় থাকে সেক্ষেত্রে পণ্ডিতগণ ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস করেন না। উত্তরে মথুরানাথ বলেন "অয়ং হেতুঃ সাধ্যাভাববদবৃত্তিরিত্যাদৌ ব্যধিকরণবহুব্রীহিং বিনা গত্যন্তরাভাবেনা অত্রাপি ব্যধিকরণবহুব্রীহেঃ সাধুত্বাৎ"। বক্তব্য এই এক্ষেত্রে ব্যধিকরণ বহুব্রীহি ছাড়া গত্যন্তর নেই। 'সাধ্যাভাববদবৃত্তি' ইত্যাদিতে ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস গ্রহণেই যুক্তিযুক্ততা থাকার জন্য নব্য মত অনুসরণ করে ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাসই করতে হবে। আর পদটির এইরূপ সমাসার্থ গ্রহণ করলে ব্যাপ্তির প্রথম লক্ষণটির সম্পূর্ণ অর্থ দাঁড়ায় - সাধ্যের অভাবের যে অধিকরণ, সেই অধিকরণ নিরূপিত যে বৃত্তিতা, সেই বৃত্তিতার অভাব হেতুতে থাকাই ব্যাপ্তি।

এখন দেখা দরকার মীমাংসক সম্মত ব্যাপ্তির আলোচ্য লক্ষণটির লক্ষ্যস্থলে সমন্বয় এবং অলক্ষ্য স্থলে সমন্বয়াভাব হয় কিনা তা বিচার করে দেখা। ব্যাপ্তি লক্ষণের লক্ষ্য হল - ব্যাপ্য হেতু অর্থাৎ সদ্ধেতু এবং অলক্ষ্য ব্যভিচারী হেতু অর্থাৎ অসদ্ধেতু। অর্থাৎ কিনা হেতুর যাবতীয় অধিকরণে যদি সাধ্য বর্তমান থাকে সেই হেতুকে ব্যাপ্য বা সদ্ধেতু বলে। যেমন – 'পর্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ' স্থলে ধূম হল সদ্ধেতু কারণ ধূমের যাবতীয় অধিকরণে বহ্নি উপস্থিত থাকে। পর্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানস এই চারটি অধিকরণে ধূম উপস্থিত থাকে এবং ওই সকল স্থলে বহ্নিও উপস্থিত থাকে।

অন্যদিকে হেতুর যাবতীয় অধিকরণে যদি সাধ্য না থাকে বা যদি এমন একটি অধিকরণও থাকে, যেখানে হেতু উপস্থিত কিন্তু সাধ্য অনুপস্থিত তাহলে ঐ হেতু হবে অসদ্ধেতু। যেমন 'পর্বতঃ ধূমবান্ বহ্নেঃ' এই অনুমিতির ক্ষেত্রে ধূম সাধ্য এবং বহ্নি হেতু। বহ্নির সকল অধিকরণে ধূম উপস্থিত থাকে না; যেমন, অয়োগোলক। তাই ধূম সাধ্যক এই অনুমিতিতে বহ্নি একটি অসদ্ধেতু। এখন দেখা যাক সদ্ধেতুতে লক্ষণটি সমন্বয় হয় কিনা।

"সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্" ব্যাপ্তির এই লক্ষণস্থ সাধ্য আলোচ্য স্থলে বহ্নি হওয়ায় বহ্ন্যধিকরণ মহানসাদি। আর সাধ্যাভাব তাই বহ্ন্যভাব। সেই সাধ্যাভাববদ আলোচ্যক্ষেত্রে সেই সেই পদার্থ যেগুলিতে বহ্নি থাকে না, যথা- জলহ্রদ। সেই জল-হ্রদাদি বহ্ন্যভাবাধিকরণে মীন, শৈবালাদি বিদ্যমান হলেও হেতু ধূম তথায় অবিদ্যমান। ফলে সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্ব কেবল মীন, শৈবালাদিতেই বিদ্যমান থাকে; ধূমে ওই বৃত্তিত্বের অভাব থাকে। এইভাবে সদ্ধেতুক অনুমিতির স্থলে লক্ষণটির সমন্বয় হয়; ফলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। পক্ষান্তরে, 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' স্থলে সাধ্য ধূম হওয়ায় সেই ধূমের অভাব হয় সাধ্যাভাব এবং ওই অভাবের যাবতীয় অধিকরণ সাধ্যাভাববৎ রূপে পরিগণিত হয়। তার মধ্যে যেমন জলাশয় বিদ্যমান; কারণ অয়োগোলক সাধ্য ধূমের অনাশ্রয়। যদিও সেই অয়োগোলক বহ্নির একটি প্রসিদ্ধ আশ্রয়। ফলত সাধ্যাভাবাধিকরণ অয়োগোলক নিরূপিত বৃত্তিত্ব হেতুতে পাওয়া যায়; বৃত্তিত্বাভাব পাওয়া যায় না। এইভাবে অসদ্ধেতুক অনুমিতির ক্ষেত্রে লক্ষণটির সমন্বয় ব্যর্থ হওয়ায় অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা প্রাথমিকভাবে দূর হয়।

সুতরাং সাধ্যের অভাবের অধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাব হেতুতে থাকাই ব্যাপ্তির লক্ষণ হিসাবে প্রাথমিকভাবে গণ্য হতে পারে। তবে লক্ষণটির গভীরে প্রবেশ করলে ধরা

পড়ে সাধ্যাভাব, সাধ্যাভাববৎ বা সাধ্যাভাবাধিকরণ এবং অবৃত্তিত্ব বা বৃত্তিত্বাভাব লক্ষণঘটক প্রতিটি পদকে নির্দিষ্ট পারিভাষিক অর্থে গ্রহণ করাই বিধেয়। একে একে ওই নির্দিষ্ট অর্থগুলি স্পষ্টীকরণে প্রবৃত্ত হওয়া যাক।

৪.১.১.২ সাধ্যাভাব পদের অর্থ

লক্ষণস্থ 'সাধ্যাভাব' পদটির আক্ষরিক অর্থ সাধ্যের অভাব; কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে এই সাধ্যাভাবকে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ এবং সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতাতার নিরূপক অভাব হিসাবে গণ্য করতে হবে। এবিষয়ে মথুরানাথের অনুশাসন উল্লেখের দাবি রাখে; "সাধ্যাভাবশ্চ সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-প্রতিযোগিতাকোবোধ্যঃ"।[২] এখানে সাধ্যাভাবকে যে প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব হিসাবে ধরা হয়েছে তাকে প্রথমত, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের দ্বারা এবং দ্বিতীয়ত, সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা হিসাবে গ্রহণের বিধান দেওয়া হয়েছে। প্রশ্ন হল ঠিক কি কারণে এরূপ বিধান প্রদত্ত হয়েছে। প্রথমে, কেন সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব হিসাবে সাধ্যাভাবকে গ্রহণ করা বিধেয় তার ব্যাখ্যা দেওয়া যাক।

এই ব্যাখ্যার প্রারম্ভে বলা কর্তব্য যে, সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ বলতে যে সম্বন্ধে কোন স্থলে একটি বিষয়কে সাধ্য ধরা হয় সেই সম্বন্ধটি বিবক্ষিত। যেমন– 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' স্থলে বহ্নি সংযোগসম্বন্ধে সাধ্য হওয়ায় সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হয় সংযোগ। সাধ্যাভাব ধরার সময়

---

[২] তদেব, পৃষ্ঠা- ৩০।

ওইরূপ সংযোগসম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বহ্নিনিষ্ঠ যে প্রতিযোগিতা সেই প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব হিসাবে সাধ্যাভাবকে বিবেচনা করতে হবে নতুবা বহ্নিনিষ্ঠ সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতাতার নিরূপক অভাবও সাধ্যাভাব রূপে গণ্য হবে। সমবায় সম্বন্ধে বহ্নি কেবল তার অবয়বেই বিদ্যমান থাকে; সুতরাং বহ্ন্যবয়ব ভিন্ন যাবতীয় পদার্থই সেক্ষেত্রে সাধ্যাভাববৎ পদবাচ্য হবে। এই পদার্থ সকলের মধ্যে মহানসাদি থাকায় এবং সেই সকল বহ্ন্যভাবাধিকরণে হেতু ধূম উপস্থিত থাকায় সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বই সিদ্ধ হবে; বৃত্তিত্বাভাব নয়। ফলে অব্যাপ্তি দোষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। অথচ, সাধ্যতাবচ্ছেদক সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব হিসাবে যদি ওই বহ্ন্যভাবকে গ্রহণ করা হয় তাহলে মহানসাদি আর সাধ্যাভাবাধিকরণ রূপে গণ্য হবে না; হবে জলাশয়াদি সেই সকল পদার্থ যেগুলিতে বহ্নি সংযোগসম্বন্ধে অবিদ্যমান। এই সাধ্যাভাবাধিকরণ সমূহে হেতু ধূম না থাকায় অব্যাপ্তির আশঙ্কা তিরোহিত হয়।

একইভাবে সাধ্যাভাবকে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব হিসাবে গণ্য করাও কর্তব্য । যে ধর্ম-পুরস্কারে কোনো বিষয়টি সাধ্য করা হয়। তা হল সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম। যেমন বহ্নিকে বহ্নিত্ব ধর্ম-পুরস্কারে সাধ্য ধরলে সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম হবে বহ্নিত্ব। সাধ্যাভাব নিরূপণের সময় ওই বহ্নিত্বধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব হিসাবেই তাকে ধরতে হবে। অন্যথায় পর্বতীয় বহ্নিত্ব ধর্ম-পুরস্কারে বহ্নির অভাব সাধ্যাভাব হিসাবে গণ্য হতে পারবে তেমনই বহ্নি-জল এতদ্উভয়ত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক যে অভাব তাও সাধ্যাভাব হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু পর্বতীয় বহ্নিত্ব ধর্ম-পুরস্কারে বহ্নির অভাবকে সাধ্যাভাব রূপে গ্রহণ করলে মহানসাদি সাধ্যাভাবাধিকরণ হয়ে

পড়বে। ফলে ওই সকল অধিকরণে ধূম উপস্থিত থাকায় সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বই পাওয়া যাবে হেতুতে। একইভাবে, বহ্নি-জল এতদ্ উভয় ধর্ম-পুরস্কারে কোনো কিছুই কোনো অধিকরণে থাকে না। সুতরাং ওই ধর্ম-পুরস্কারে সাধ্য বহ্নির অভাব পর্বতে পাওয়া যাবে; যে পর্বতে ধূম উপস্থিত। সুতরাং সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্মাবচ্ছিন্ন যে প্রতিযোগিতা তাদৃশ প্রতিযোগিতা নিরূপক অভাবই সাধ্যাভাব রূপে ধর্তব্য।

৪.১.১.৩ সাধ্যাভাববৎ পদের অর্থ

'সাধ্যাভাব' পদের অর্থ স্পষ্ট করার পর 'সাধ্যাভাববৎ' পদের রহস্য উন্মোচনের পালা। সাধ্যাভাববৎ কথার অর্থ যে সাধ্যাভাবের অধিকরণ তা উল্লেখ করা হয়েছে। এখন এই সাধ্যাভাবের অধিকরণটি ঠিক কোন সম্বন্ধে নির্বাচন করা হবে তা একটি প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। এব্যাপারে রহস্যকার বিধান দিয়েছেন "তাদৃশসাধ্যাভাববত্ত্বঞ্চ অভাবীয়বিশেষণতাবিশেষেণ বোধ্যম্"[৩] অর্থাৎ সাধ্যাভাবের অধিকরণটিকে অভাবীয়-বিশেষণতা-বিশেষ সম্বন্ধে ধরতে হবে। এরূপ নির্দেশ নিরর্থক নয়। যদি সাধ্যাভাবাধিকরণ স্থির করার সময় এই অনুশাসন লঙ্ঘন করা হয় তাহলে 'গুণত্ববান্ জ্ঞানত্বাৎ' ও 'সত্তাবান্ জাতেঃ' এই দুই স্থলে ব্যাপ্তির লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ অপরিহার্য হবে।

এখানে স্পষ্ট করা দরকার যে 'গুণত্ববান্ জ্ঞানত্বাৎ' ও 'সত্তাবান্ জাতেঃ' দুটি সদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল কারণ হেতু জ্ঞানত্বের অধিকরণ যে জ্ঞান তা গুণ পদার্থ হওয়ায় গুণত্বেরও অধিকরণ; একইভাবে অধিকরণতা সম্বন্ধে জাতি যে সকল পদার্থে থাকে সেই সকল জাতিমৎ

---

[৩] তদেব, পৃষ্ঠা- ৩০।

পদার্থে সত্তা বর্তমান থাকে। কিন্তু সদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল হলেও যদি বিষয়িতা বা অব্যাপত্ব সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণকে ধরা হয় তাহলে ব্যাপ্তির আলোচ্য লক্ষণটি উভয় ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হতে ব্যর্থ হবে।

এই ব্যর্থতা প্রদর্শনের পূর্বে বিষয়িতা ও অব্যাপ্যত্ব সম্বন্ধে কোনো পদার্থ কোথাও থাকে তার পরিচয় দেওয়া দরকার। বিষয়িতা সম্বন্ধে যে কোনো বিষয়ই থাকে জ্ঞানে। জ্ঞান যেমন বিষয়ে থাকতে পারে তেমনই বিষয়ও জ্ঞানে থাকতে পারে। বিষয়ে জ্ঞান থাকে বিষয়িতা সম্বন্ধে। বিষয় জ্ঞানে থাকে বিষয়িতা সম্বন্ধ। অব্যাপ্যত্ব সম্বন্ধের পারিভাষিক পরিচয় হল 'স্বাভাববদবৃত্তিত্ব'। 'স্ব' বা নিজের অভাবের অধিকরণ বা তাতে কোন বস্তুর বর্তমানত্ব স্বাভাববদবৃত্তিত্বম্। যে বস্তু যে অধিকরণে থাকে না সেই অধিকরণের সঙ্গে তার যে না থাকার সম্বন্ধ তাই স্বাভাববদবৃত্তিত্ব বা অব্যাপ্যত্ব সম্বন্ধ।

এখন দেখা যাক সাধ্যাভাববদ্‌কে বিষয়িতা সম্বন্ধে গ্রহণ করলে উল্লিখিত দুটি অনুমিতিতে কীভাবে অব্যাপ্তি দোষ দেখা দেয়। প্রথমত, 'গুণত্ববান্ জ্ঞানত্বাৎ' স্থলে গুণত্ব হল সাধ্য এবং জ্ঞানত্ব হল হেতু। গুণত্ব সাধ্য হওয়ায় সাধ্যাভাব হয় গুণত্বাভাব। সেই গুণত্বাভাবের অধিকরণ স্বরূপ সম্বন্ধে না ধরে যদি বিষয়িতা সম্বন্ধে ধরা হয় তাহলে জ্ঞানই সেই অধিকরণ হবে কারণ বিষয়িতা সম্বন্ধে বিষয় মাত্রই জ্ঞানে থাকে। ফলে গুণত্বাভাব বিষয়ক যে জ্ঞান তাও বিষয়িতা সম্বন্ধে জ্ঞানে থাকবে। ওই জ্ঞানে আবার জ্ঞানত্ব জাতি আছে। ফলে সাধ্যাভাবাধিকরণ জ্ঞান নিরূপিত বৃত্তিত্ব হেতু জ্ঞানত্বে থাকায় অব্যাপ্তি দোষ দেখা দেয়।

একইভাবে 'সত্তাবান্ জাতেঃ' অনুমিতির স্থলেও সমবায় সম্বন্ধে সত্তা সাধ্য হওয়ায় সত্তাভাব হয় সাধ্যাভাব। এই সত্তাভাব বিষয়িতা সম্বন্ধে সত্তাভাব বিষয়ক জ্ঞানে থাকে, ফলে

জ্ঞান হয় সাধ্যাভাবাধিকরণ। সেই জ্ঞানে জ্ঞানত্ব ও গুণত্বের পাশাপাশি সত্তা জাতি থাকে। ফলে সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্ব হেতুতে থাকায় অব্যাপ্তি দোষ দেখা দেয়।

বিষয়িতা সম্বন্ধের পরিবর্তে যদি অব্যাপ্যত্ব বা স্বাভাববদ্বৃত্তিত্ব সম্বন্ধে সাধ্যাভাববৎকে গ্রহণ করা হয় তাহলেও উক্ত দুটি ক্ষেত্রে অব্যাপ্তি অপরিহার্য হয়। কারণ 'গুণত্ববান জ্ঞানত্বাৎ' স্থলে গুণত্ব হল সাধ্য এবং জ্ঞানত্ব হল হেতু। গুণত্ব সাধ্য হওয়ায় সাধ্যাভাব হয় গুণত্বাভাব। 'স্ব' পদে এই গুণত্বাভাবকে ধরলে স্বাভাব হয় গুণত্বাভাবাভাব অর্থাৎ গুণত্ব। স্বাভাববৎ হয় গুণত্ববৎ অর্থাৎ গুণ। স্বাভাববদ্বৃত্তি পদে তাই গুণ বৃত্তি পদার্থকে বোঝায়। এই গুণে যেমন গুণ বৃত্তি হয় তেমনই নানা সম্বন্ধে নানা পদার্থও বৃত্তি হয়। আর বিষয়তা সম্বন্ধে জ্ঞান বিষয়ে থাকায় তা গুণেও থাকে। ফলে স্বাভাববদ্বৃত্তি হয় জ্ঞান। আর তাতে হেতু জ্ঞানত্ব থেকে যায়। ফলে অব্যাপ্তি দোষ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

সেই গুণত্বাভাবের অধিকরণ স্বরূপ সম্বন্ধে না ধরে যদি বিষয়িতা সম্বন্ধে ধরা হয় তাহলে জ্ঞানই সেই অধিকরণ হবে কারণ বিষয়িতা সম্বন্ধে বিষয় মাত্রই জ্ঞানে থাকে। ফলে গুণত্বাভাব বিষয়ক যে জ্ঞান তাও বিষয়িতা সম্বন্ধে জ্ঞানে থাকবে। ওই জ্ঞানে আবার জ্ঞানত্ব জাতি আছে। ফলে সাধ্যাভাবাধিকরণ জ্ঞান নিরূপিত বৃত্তিত্ব হেতু জ্ঞানত্বে থাকায় অব্যাপ্তি দোষ দেখা দেয়।

অথচ মাথুরীয় অনুশাসনকে মান্যতা দিয়ে সাধ্যাভাববৎ-কে যদি স্বরূপ সম্বন্ধে বিবেচনা করা হয় তাহলে আর কোনো ক্ষেত্রেই অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। কেননা 'গুণত্ববান্ জ্ঞানত্বাৎ' অনুমিতির ক্ষেত্রে সাধ্যাভাব অর্থাৎ গুণত্বাভাবের স্বরূপ সম্বন্ধে অধিকরণ জ্ঞান হয় না; হয় গুণ ভিন্ন দ্রব্যাদি যাবতীয় পদার্থ। উক্ত দ্রব্যাদি নিরূপিত সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্ব জ্ঞানত্বে

পাওয়া যায় না, পাওয়া যায় দ্রব্যাদিতে। ফলে হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বার অভাবই পাওয়া যায়। একইভাবে সত্তার অভাবের স্বরূপ সম্বন্ধে অধিকরণ হয় সেই সব পদার্থ যাদের উপর সত্তা জাতি থাকে না। বাস্তবে সামান্য, বিশেষ, সমবায়, অভাবই ওই অধিকরণ হতে পারে। এই অধিকরণগুলিতে হেতু জাতি না থাকায় সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বার অভাবই হেতুতে পাওয়া যায়। একইভাবে 'সত্তাবান্ জাতেঃ' স্থলে সাধ্যাভাব অর্থাৎ সত্তাভাবের স্বরূপ সম্বন্ধে অধিকরণ হয় সামান্যাদি সেই সকল পদার্থ যেগুলি জাতির অধিকরণ নয়। ফলে সাধ্যাভাবাধিকরণে ব্যাপ্তির অধিকরণতা না থাকাই সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাবই জাতিতে সিদ্ধ হয়।

এই পর্যন্ত সাধ্যাভাববৎ-কে স্বরূপ সম্বন্ধে না ধরলে যে অসুবিধা হয় তার পরিচয় পেয়েছি আমরা। কিন্তু সাধ্যাভাবের অধিকরণকে স্বরূপ সম্বন্ধে ধরলেও কিন্তু দেখা কিছু বিপত্তি দেখা দিতে পারে। যার প্রমাণ আমরা পাব নিম্নলিখিত অনুমিতির স্থল দুটিকে পর্যালোচনা করলে- 'ঘটাত্যন্তাভাববান্ পটত্বাৎ' ও 'ঘটান্যোন্যাভাববান্ পটত্বাৎ'।

প্রথম ক্ষেত্রে, সাধ্য ঘটত্বের অত্যন্তাভাব এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ঘটের অন্যোন্যাভাব উভয় ক্ষেত্রেই ঘটত্ব হল হেতু। ঘটত্বের অধিকরণ যে ঘট তাতে ঘটত্বের অত্যন্তাভাব যেমন থাকে তেমনি ঘটের অন্যোন্যাভাবও থাকে। ফলে হেতুর অধিকরণে সাধ্য থাকাই উভয় ক্ষেত্রেই হেতুটি সৎ। অথচ সাধ্যভাবের অধিকরণকে যদি স্বরূপ সম্বন্ধে ধরা হয় তাহলে কোনো ক্ষেত্রেই লক্ষণটির সমন্বয় হয় না। প্রথমত, ঘটত্বের অত্যন্তাভাবকে স্বরূপ সম্বন্ধে সাধ্য ধরলে সেই ঘটত্বাভাবের স্বরূপ সম্বন্ধে অভাব হবে সাধ্যাভাব। প্রাচীন মত অনুসারে অভাবের অভাব প্রতিযোগী স্বরূপ হওয়ায় ঘটত্বের অত্যন্তাভাবের অভাব ঘটত্বই হয়। একইভাবে, প্রাচীন মতে

অন্যোন্যাভাবের অভাব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক স্বরূপ হয়। তাই দ্বিতীয় অনুমানের ক্ষেত্রে যেখানে ঘটের অন্যোন্যাভাব সাধ্য সেখানে সাধ্যাভাব অর্থাৎ ঘটের অন্যোন্যাভাবের অভাব ঘটত্বই হয়। সাধ্য ভিন্ন হলেও উভয় অনুমিতির ক্ষেত্রেই সাধ্যাভাব অভিন্ন-ঘটত্ব। ওই সাধ্যাভাব ঘটত্বের স্বরূপ সম্বন্ধে অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ। ফলে সাধ্যাভাবের স্বরূপ সম্বন্ধে অধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্ব কিংবা সেই বৃত্তিত্বের অভাব কোনোটিই সিদ্ধ হতে পারে না। সুতরাং ওই রূপ বৃত্তিত্বের অভাব স্থাপন অসম্ভব হওয়ায় অব্যাপ্তি দোষ দেখা দেয়।

তবে এই সমস্যা কেবল প্রাচীন মতের ক্ষেত্রেই হয় কারণ নব্য মতে অত্যন্তাভাবের অভাব প্রতিযোগী স্বরূপ বা অন্যোন্যাভাবের অভাব প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক স্বরূপ নয়, পরন্তু উভয় ক্ষেত্রেই তারা পৃথক পৃথক অভাব স্বরূপ। তাই ঘটত্বের অত্যন্তাভাবের অভাব এবং ঘটভেদের অভাব দুটিই স্বতন্ত্র অভাব হওয়ায় তাদের স্বরূপ সম্বন্ধে অভাব প্রসিদ্ধই হয়। অধিকরণ দুটি ক্ষেত্রেই হয় ঘট (কেননা, ঘটত্বের অত্যন্ত্যাভাবের অভাব যেমন স্বরূপ সম্বন্ধে ঘটে থাকে তেমনি ঘটভেদের অভাবও স্বরূপ সম্বন্ধে ঘটেই থাকে)। ওই ঘট নিরূপিত বৃত্তিত্ব ঘটত্বাদিতে সিদ্ধ; কিন্তু পটত্বে নয় কারণ পটত্ব কদাপি ঘটে থাকে না।

এইভাবে সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাব হেতুতে স্থাপন করা ন্যায়মতে সম্ভব হয়। কিন্তু প্রাচীন সিদ্ধান্তকে বিচারে রাখলে পূর্বোক্ত অব্যাপ্তি নিরসনের কোনো উপায় থাকে কী? এবিষয়ে মথুরানাথ একটি বিকল্প উপায় নির্দেশ করেছেন। তিনি মনে করেন স্বরূপ সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণকে না ধরে যদি সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক সাধ্যভাববৃত্তি সাধ্যসামান্যীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক

সম্বন্ধে ওই অধিকরণ ধরা হয় তাহলে এই বিড়ম্বনা হতে পরিত্রাণ মিলতে পারে।[৪] যে সম্বন্ধে এবং যে ধর্ম-পুরস্কারে সাধ্য ধরা হয় সেই সম্বন্ধে এবং সেই ধর্ম-পুরস্কারে সাধ্যের অভাব ধরলে ওই সাধ্যাভাবে বর্তমান যে প্রতিযোগিতা তা সমগ্র সাধ্য নিরূপিত বা সাধ্যসামান্যীয় হয় সেই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণকে বিবেচনার নিদান দিয়েছেন রহস্যকার। ঘটত্বাভাব যেখানে সাধ্য সেখানে সাধ্যাভাববৃত্তি প্রতিযোগিতা হবে ঘটত্ববৃত্তি প্রতিযোগিতা। ওই ঘটত্ব বৃত্তির প্রতিযোগিতাটি সাধ্যসামান্যীয় তখনই হবে যদি ঘটত্বের সমবায় সম্বন্ধে অভাব ধরা হয় কেননা ঘটত্বের সমবায় সম্বন্ধে অভাবই অলোচ্য ক্ষেত্রে স্বরূপ সম্বন্ধে সাধ্য হয়েছে। ওই সাধ্যসামান্যীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধটি সমবায়, সেই সমবায় সম্বন্ধে সাধ্যাভাব অর্থাৎ ঘটত্বের অধিকরণ হয় ঘট আর সেখানে পটত্ব না থাকায় আর অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না।

একইভাবে ঘটান্যোন্যাভাব অর্থাৎ ঘটভেদ যেখানে সাধ্য সেখানে ঘটভেদাভাব হল সাধ্যাভাব যা প্রাচীন মতে ঘটত্ব স্বরূপ। সেই সাধ্যাভাববৃত্তির প্রতিযোগিতা বলতে ঘটত্ব বৃত্তি ঘটত্বাভাব নিরূপিত প্রতিযোগীতাকে বোঝায়। এই প্রতিযোগিতা আপাতদৃষ্টিতে সাধ্যসামান্যীয় নয়; কেননা সাধ্য এখানে ঘটত্বাভাব নয়, বরং ঘটভেদ। তাই আপাত দৃষ্টিতে সাধ্য সামান্যীয় প্রতিযোগিতাটি অপ্রসিদ্ধ বলেই মনে হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে 'ঘটান্যোন্যাভাব পটত্বাৎ' স্থলে সাধ্যাভাব ঘটত্ব হলেও তা আসলে ঘটভেদের অত্যন্তাভাব স্বরূপ অর্থাৎ ঘটভেদের অত্যন্তাভাবের ও ঘটত্বের কোনো ভেদ নেই। তাই ঘটত্ব বৃত্তি প্রতিযোগিতার সঙ্গে

---

[৪] '...সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকসাধ্যাভাববৃত্তিসাধ্যাসামান্যীয়প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন সাধ্যাভাবাধিকরণত্বম্', তদেব, পৃষ্ঠা- ৩১।

ঘটভেদাভাববৃত্তি প্রতিযোগিতারও কোন ইতর বিশেষ নেই। এখন ঘটভেদাভাববৃত্তি প্রতিযোগিতা হল ঘটভেদের অত্যন্তাভাবের পুনরায় যে অত্যন্তাভাব সেই তৃতীয়াভাব নিরূপিত প্রতিযোগিতা যা বাস্তবত ঘটত্ববৃত্তি ঘটত্বাভাব নিরূপিত প্রতিযোগিতার সঙ্গে সমতুল্য। এখানে অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব প্রতিযোগী স্বরূপ এই প্রাচীন নিয়মটিকে বিবেচনায় রাখলে বোঝা যায় ঘটভেদের অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাব নিরূপিত প্রতিযোগিতা কার্যত ঘটভেদ নিরূপিত প্রতিযোগিতা। ফলে ঘটভেদ নিরূপিত প্রতিযোগিতার সঙ্গে ঘটত্বের অত্যন্তাভাব নিরূপিত প্রতিযোগিতাটি সমতুল্যই হয়। এই যুক্তিতে ঘটত্বনিষ্ঠ ঘটত্বের সমবায় সম্বন্ধে অভাব নিরূপিত প্রতিযোগিতা সাধ্যসামান্যীয় প্রতিযোগিতা হয়ে দাঁড়ায়। ওই সাধ্যসামান্যীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধটি পূর্বস্থলীয় অনুমিতির ন্যায় সমবায়ই হয়। ওই সমবায় সম্বন্ধে ঘটভেদাভাব অর্থাৎ ঘটত্বের অধিকরণ হয় ঘট যাতে পটত্বের অভাব রয়েছে। ফলে এখানেও অব্যাপ্তির কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

সাধ্যাভাববৎ পদের সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন সাধ্যভাববৃত্তি সাধ্যসামান্যীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণ ধরা হয় তাহলে প্রাচীন মতের ওপর অব্যাপ্তির যে আশঙ্কা ছিল তার নিরসন হয় কিন্তু এই সমাধানের উপরও একটি আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে। ইতিপূর্বে ব্যক্ত হয়েছে যে প্রাচীন মতে অত্যন্তাভাবের অত্যন্তাভাবটি যেমন ওই অভাবের প্রতিযোগী স্বরূপ হয় তেমনই অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবটি ওই অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক স্বরূপ হয়। এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলে ঘটের অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাব অর্থাৎ ঘটাভেদাভাবটি ঘটত্ব স্বরূপই হয়। কিন্তু তা বললে যেখানে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে কোনো কিছুকে সাধ্য করা হয়, সেই স্থলে সাধ্যতার অবচ্ছেদক

সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন সাধ্যাভাববৃত্তি যে সাধ্যসামান্যীয় প্রতিযোগিতা তা অপ্রসিদ্ধই হয়। আর ওই প্রতিযোগিতা অপ্রসিদ্ধ হলে তার অবচ্ছেদক সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণকে গ্রহণ করার কোনো অবকাশই থাকে না। ফলে যেখানে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধটি তাদাত্ম সেরূপ সদ্ধেতুক অনুমিতির ক্ষেত্রে লক্ষণটির অব্যাপ্তি দোষ দেখা দেয়।

যেমন 'অয়ং গোমান্ গোত্বাৎ' অনুমিতির এই ক্ষেত্রটি বিবেচনা করা যেতে পারে। সরল কথায় এর অর্থ 'এটি গো' কারণ এতে 'গোত্ব' রয়েছে। এই অনুমিতির ক্ষেত্রে 'গো' তাদাত্ম্য সম্বন্ধে সাধ্য এবং 'গোত্ব' সমবায় সম্বন্ধে হেতু। 'গোত্ব' সমবায় সম্বন্ধে যে অধিকরণে থাকে সেই (গো) পদার্থে 'গো' তাদাত্ম্য সম্বন্ধে থাকে। সুতরাং হেতুর অধিকরণে সাধ্য উপস্থিত থাকায় এটি সদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল। কিন্তু আলোচ্য স্থলে যে সম্বন্ধে সাধ্যাভাবের অধিকরণটি ধরার কথা বলা হয়েছে সেই সম্বন্ধে কোনো সাধ্যাভাবাধিকরণ প্রসিদ্ধ নয়। কেননা, আলোচ্যক্ষেত্রে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে 'গো' সাধ্য হওয়ায় সাধ্যাভাব হয় 'গোভেদ'। ওই 'গোভেদে'র সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাববৃত্তি সাধ্যসামান্যীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে কোনো অধিকরণই সিদ্ধ নয়। কেননা আলোচ্য ক্ষেত্রে ওইরূপ সাধ্যসামান্যীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ পাওয়া যেতে পারে না।

ঠিক কী কারণে ওইরূপ সম্বন্ধ সিদ্ধ নয় তার ব্যাখ্যা দেওয়া যাক। অলোচ্য ক্ষেত্রে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যাভাববৃত্তি যে প্রতিযোগিতা তা কখনই সাধ্যসামান্যীয় হতে পারে না। কারণ সাধ্য যেখানে তাদাত্ম্য সম্বন্ধে 'গো' সেখানে সাধ্যাভাব হল 'গোভেদ'। সেই 'গোভেদ' বৃত্তি প্রতিযোগিতা হবে 'গোভেদে' যে অত্যান্তাভাব সেই 'গোভেদাভাব' নিরূপিত প্রতিযোগিতা। প্রাচীন নিয়ম অনুসারে অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবটি অন্যোন্যাভাবের

প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক স্বরূপ হয় বলে ‘গো ভেদাভাব’টি ‘গোত্ব’ স্বরূপ হয়। সেক্ষেত্রে ‘গো’ ভেদ বৃত্তি ‘গোভেদাভাব’ নিরূপিত প্রতিযোগিতা কার্যত ‘গোত্ব’ নিরূপিত প্রতিযোগিতা ‘গোত্ব’ নয় বরং ‘গো’-ই হল সাধ্য। ফলত সাধ্যাভাববৃত্তি প্রতিযোগিতাটি সাধ্যসামান্যীয় হওয়ার(গো নিরূপিত হওয়ায়) কোনো সম্ভাবনা না থাকায় ওই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধকে আর সাধ্যসামান্যীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ বলা যায় না। এভাবে সাধ্যাভাববৃত্তি সাধ্যসামান্যীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধে অপ্রসিদ্ধিবশত সাধ্যাভাববৎও অপ্রসিদ্ধই হয়। ফলে সেই সাধ্যাভাববৎ নিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাব হেতু গোত্বে স্থাপন করা যায় না। এটি একটি সদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল হওয়া সত্ত্বেও আলোচ্য হেতুতে ব্যাপ্তির লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হয়।

প্রাচীন সিদ্ধান্তকে অবলম্বন করেই প্রাচীন সম্মত সমাধানের ওপর যে আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে প্রাচীন রীতি অনুসরণ করেই মথুরানাথ তার অসারতা প্রমাণ করতে গিয়ে বলেছেন- “প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবৎ প্রতিযোগ্যপি অন্যোন্যাভাবাভাবাঃ তেন তাদাত্মসম্বন্ধেন সাধ্যতায়াং সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নসাধ্যাভাববৃত্তিসাধ্যীয়প্রতিযোগিত্বস্য নাপ্রসিদ্ধিঃ”।[৫] সহজ কথায় তাদাত্ম্য সম্বন্ধক সাধ্যক স্থলে সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে সাধ্যাভাববৃত্তি সাধ্যীয় প্রতিযোগিতা তা অপ্রসিদ্ধ হয় না; কেননা অন্যোন্যাভাবের ক্ষেত্রে তার অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকের ন্যায় প্রতিযোগী স্বরূপও হয়। পূর্বে প্রাচীন রীতি উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছিল যে অন্যোন্যাভাবের অত্যন্তাভাবটি উক্ত অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক স্বরূপ হবে। এখন বলা হল ওইরূপ অন্যোন্যাভাবাভাব অন্যোন্যাভাবটির

[৫] তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৫।

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা প্রতিযোগী স্বরূপও হবে। এই নিয়ম মানলে ঘটভেদাভাবকে যেমন ঘটত্ব স্বরূপ বলা হয় তেমনই ঘট স্বরূপও বলতে হবে। একই যুক্তিতে 'গোভেদে'র স্বরূপ সম্বন্ধে যে অভাব পূর্বে 'গোত্ব' বলে বিবেচিত হচ্ছিল তা যুগপৎ 'গো' বলেও বিবেচিত হবে, আর আলোচ্য ক্ষেত্রে 'গো'-ই সাধ্য। সুতরাং 'গোভেদাভাব'-নিষ্ঠ 'গোভেদে'র স্বরূপ সম্বন্ধে অভাব নিরূপিত প্রতিযোগিতা তা 'গোত্ব' নিরূপিত প্রতিযোগিতা হওয়ার পাশাপাশি 'গো' নিরূপিত প্রতিযোগিতাও হয়। এই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক সম্বন্ধটি স্বরূপ সম্বন্ধ হওয়ায় সাধ্যাভাববৎকে স্বরূপ সম্বন্ধেই গ্রহণ করতে হবে। স্বরূপ সম্বন্ধে সাধ্যাভাববৎ হবে গো ভিন্ন ঘট পটাদি পদার্থ। কারণ 'গোভেদ' স্বরূপ সম্বন্ধে গো ভিন্ন যাবতীয় পদার্থে থাকায় তা ঘট পটাদিতে থাকে। ওই ঘট পটাদি সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্ব ঘটত্বাদিতেই বর্তমান; গোত্বে না। সুতরাং সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাব হেতুতে পাওয়া যায়। এভাবে প্রাচীন মতের ওপর আশঙ্কিত আপত্তির নিরসন হয়।

এপর্যন্ত 'সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম' ব্যাপ্তির এই প্রথম লক্ষণের অন্তর্গত সাধ্যাভাববৎ অর্থাৎ সাধ্যাভাবের অধিকরণ কোন সম্বন্ধে ধরতে হবে তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। এখন সাধ্যাভাবের যেটি অধিকরণ তার অধিকরণতার পরিচয় প্রদান আবশ্যক। এই প্রসঙ্গে মাথুরীয় ব্যাখ্যা হল সাধ্যাভাবের অধিকরণ নিষ্ঠ যে অধিকরণতা তা নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণতা হওয়া প্রয়োজন। এখানে বলা দরকার যে কোন ধর্মের অধিকরণকে দুইভাবে দেখা যেতে পারে – স্বাবচ্ছিন্নভাবে বা কোন অবচ্ছেদক পুরস্কারে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে অর্থাৎ অবচ্ছেদক শূন্য হিসেবে। যদি সাধ্যাভাবের অধিকরণটিকে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিবেচনা করা না হয় তাহলে

ব্যাপ্তির লক্ষণটি ‘কপিসংযোগী এতদ্ববৃক্ষত্বাৎ’ এইরূপ অনুমিতির স্থলে অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হবে।

‘কপিসংযোগী এতদ্ববৃক্ষত্বাৎ’ এরূপ অনুমিতির ক্ষেত্রে ‘কপিসংযোগী’ হল সাধ্য, আর ‘এতদ্ববৃক্ষত্ব’ হল হেতু। ‘এতদ্ববৃক্ষত্ব’ রয়েছে এতদ্ববৃক্ষে অর্থাৎ একটি বিশেষ বৃক্ষে যেখানে কপিসংযোগও বর্তমান। কিন্তু একটি সদ্ধেতুক অনুমিতির স্থল হওয়া সত্ত্বেও আলোচ্য ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষের আশঙ্কা থেকে যায়। কেননা, আলোচ্য ক্ষেত্রে কপিসংযোগ সাধ্য হওয়ায় কপিসংযোগাভাব হয় সাধ্যাভাব। ওই সাধ্যাভাবের অধিকরণ যে সম্বন্ধে ধরতে হবে তা হল সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন সাধ্যাভাববৃত্তি সাধ্যসামান্যীয় প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ। এখানে কপিসংযোগ সমবায় সম্বন্ধে এবং কপিসংযোগত্ব ধর্ম-পুরস্কারে সাধ্য হওয়ায় সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন কপিসংযোগত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক যে অভাব সেই কপিসংযোগাভাব হবে সাধ্যাভাব। ওই সাধ্যাভাববৃত্তি প্রতিযোগিতাটি সাধ্যসামান্যীয় হবে যদি তা কপিসংযোগের যে অভাব তার স্বরূপ সম্বন্ধে অভাব তন্নিরূপিত প্রতিযোগিতা হয় (কারণ একমাত্র কপিসংযোগাভাবের স্বরূপ সম্বন্ধে অভাবই কপিসংযোগ স্বরূপ হয়)। ওই স্বরূপ সম্বন্ধে সাধ্যাভাব অর্থাৎ কপিসংযোগাভাবের অধিকরণ যেমন উক্ত বৃক্ষ ভিন্ন সকল পদার্থ হতে পারে তেমনি ওই বৃক্ষটিও হতে পারে কারণ সংযোগ একটি অব্যাপ্যবৃত্তি গুণ। যে অধিকরণে সংযোগ গুণটি থাকে সেই একই অধিকরণে সংযোগের অভাবও বিদ্যমান থাকে। যে শয্যায় শায়িত ব্যক্তির সংযোগ রয়েছে, সেই একই শয্যায় ওই সংযোগের অভাবও রয়েছে। যে হস্তে লেখনী সংযোগ রয়েছে সেই একই হস্তের নানা অংশে ওই সংযোগের অভাবও রয়েছে। একইভাবে এতদ্ববৃক্ষ রূপে যে বৃক্ষটি শনাক্ত করা হয়েছে সেই বৃক্ষের শাখা

অংশে কপিসংযোগ থাকলেও কাণ্ড বা মূলাংশে ওই কপিসংযোগের অভাব রয়েছে। সুতরাং ওই বৃক্ষটি একাধারে কপিসংযোগের অধিকরণ হওয়ার পাশাপাশি ওই সংযোগের অভাবের অধিকরণও। আর সাধ্যের ওই অধিকরণে এতদ্ববৃক্ষ হেতুটি থাকায় সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাব হেতুতে সিদ্ধ হয় না। এভাবে অব্যাপ্তি দোষ দেখা দেয়।

কিন্তু অধিকরণ বলতে যদি কেবলমাত্র অধিকরণ না বলে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ বলা হয় তাহলে আর ঐ অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। কারণ সাধ্যাভাবের অধিকরণ বলতে নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ বললে মূলাবচ্ছিন্ন এতদ্বৃক্ষ সাধ্যাভাবের (অর্থাৎ কপিসংযোগাভাবের) অধিকরণ হতে পারে না। কেননা মূলাবচ্ছিন্ন এতদ্বৃক্ষরূপ অধিকরণ নিরবচ্ছিন্ন নয়, তা একদেশাবচ্ছিন্ন। সুতরাং কপিসংযোগাভাবের (সাধ্যাভাবের) নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ হবে সেই সকল পদার্থ যাদের কোন অংশেই কপিসংযোগ থাকে না। এতদ্ববৃক্ষ ভিন্ন যাবতীয় পদার্থ ওই রূপ অধিকরণ হতে পারে। সাধ্যাভাবের ওই সকল অধিকরণে এতদ্ববৃক্ষত্ব না থাকায় অব্যাপ্তি দোষের আশঙ্কা দূর হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সাধ্যাভাবের অধিকরণ বলতে কেবলমাত্র নিরবচ্ছিন্ন অধিকরণ বললে হবে না তাকে সাধ্যাভাবত্ববিশিষ্ট নিরূপিত অধিকরণতাশ্রয় হতে হবে।[৬] কারণ তা যদি বলা না হয় তাহলে ‘গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাভাববান্ গুণত্বাৎ’ এই সদ্ধেতুক অনুমিতির স্থলটি অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হবে। কারণ এই স্থলে সাধ্য হল গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তা এবং হেতু হল গুণত্ব। গুণভেদ, কর্মভেদ ও সত্তা এই তিনটি একত্রে যেখানে থাকে তাই হল গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তা। এই বিশিষ্টসত্তা দ্রব্যে আছে, কারণ দ্রব্যেতেই গুণকর্মভিন্নত্ব ও সত্তা

[৬] ‘নিরুক্তসাধ্যাভাবত্ববিশিষ্টনিরূপিতা...তদাশ্রয়াবৃত্তিত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ’, তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৬।

আছে। কিন্তু এই বিশিষ্টসত্তা ও কেবলসত্তা একই, এরা পৃথক নয়। অথচ এদের অধিকরণ ভিন্ন। গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তার অধিকরণ হবে দ্রব্য, গুণাদি নয়, এবং কেবল সত্তার অধিকরণ হবে দ্রব্য, গুণ, কর্ম। এই সাধ্যের অভাব অর্থাৎ গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাভাবাভাব হবে গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তা; এই বিশিষ্টসত্তা ও কেবল সত্তা একই। তাহলে সত্তারূপ সাধ্যাভাবের অধিকরণ হবে দ্রব্য, গুণ, কর্ম। এই সত্তারূপ সাধ্যাভাবের অধিকরণ গুণ হলে গুণ নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব গুণত্ব বা হেতুতে থাকে না। কারণ গুণত্ব গুণে থাকে, ফলে অব্যাপ্তি হয়। কিন্তু অধিকরণটিকে যদি সাধ্যাভাবত্ববিশিষ্ট নিরূপিত অধিকরণতাশ্রয়রূপে ধরা হয় তাহলে আর এই অব্যাপ্তি হয় না। কারণ বিশিষ্টসত্তা (গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তা) যদি সাধ্যাভাব হয়, তাহলে সেই সাধ্যাভাবের অধিকরণকে অবশ্যই সাধ্যাভাবত্ববিশিষ্ট নিরূপিত অধিকরণতাশ্রয় বলতে হবে। এরূপ হলে বিশিষ্টসত্তারূপ সাধ্যাভাবের বিশিষ্ট অধিকরণ হবে দ্রব্য, কেবলসত্তা ও বিশিষ্টসত্তা স্বরূপত এক হলেও এদের অধিকরণ ভিন্ন ভিন্ন। এরূপ হলে অর্থাৎ গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তারূপ সাধ্যাভাবের অধিকরণ দ্রব্য হলে, এই দ্রব্যরূপ অধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বার অভাব গুণত্বে বা হেতুতে থাকে, ফলে অব্যাপ্তিও বারিত হয়।

৪.১.১.৪ বৃত্তিত্বাভাব পদের পারিভাষিক অর্থ

প্রথম লক্ষণটির অন্তর্গত যে 'বৃত্তিত্বাভাব' পদটি রয়েছে সেই বৃত্তিতার অভাব বলতে কোন ধরনের অভাবকে বুঝতে হবে তা নির্দেশ করতে গিয়ে মথুরানাথ বলেছেন- "সাধ্যাভাবাধিকরণবৃত্তিত্বাভাবশ্চ তাদৃশবৃত্তিসামান্যাভাবোবোধ্যঃ"[৭] অর্থাৎ সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত যে বৃত্তিত্বাভাবের কথা বলা হয়েছে তার দ্বারা আসলে বৃত্তিত্বার সামান্যভাবকেই

[৭] তদেব, পৃষ্ঠা- ৩০।

বুঝতে হবে। তাঁর মতে বৃত্তিত্বার অভাব বলতে যদি যে কোনো ধরণের অভাবকে ধরা হয় তাহলে তার দ্বারা বৃত্তিত্বার বিশেষাভাব কিংবা সামান্যাভাবকে ধরা যেতে পারে। কিন্তু বৃত্তিতার অভাব বলতে যদি ওই দুটির কোনো একটিকে ধরা হয় তাহলে 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' এই অদ্ধেতুক অনুমিতির স্থলে লক্ষণটির সমন্বয় হয়ে যাবে এবং লক্ষণটির অতিব্যাপ্তি দোষ দেখা দেবে।

সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব বলতে যদি বিশেষাভাবকে ধরা হয় তাহলে 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' এই অসদ্ধেতুক স্থলে ধূম সাধ্য হওয়ায় সাধ্যাভাবাধিকরণ অর্থাৎ ধূমের অভাবের অধিকরণ জলহ্রদাতিও হতে পারে। ওই জলহ্রদাদিও বৃত্তিতার অভাব হেতু বহ্নিতে থাকায় আলোচ্য স্থলে লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যাবে। ফলে লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হবে। ওইরূপ বৃত্তিতার অভাব বলতে যদি উভয়াভাবকেও ধরা হয় তাহলেও 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' এই অসদ্ধেতুক স্থলে সাধ্য ধূম হওয়ায় সাধ্যাভাবাধিকরণ উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডনিষ্ঠ বহ্নি এবং জল এই উভয়ের অভাব হেতু বহ্নিতে পাওয়া যাবে। ফলে এক্ষেত্রেও অতিব্যাপ্তি দোষ দেখা দেবে।

কিন্তু বৃত্তিত্বার অভাব বলতে যদি সামান্যাভাবকে ধরা হয় তাহলে আর এই অতিব্যাপ্তি হয় না। কারণ 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' স্থলে সাধ্য হল ধূম। আর সাধ্যাভাবাধিকরণ হিসাবে যদি জলহ্রদ, ঘট, পট, উত্তপ্ত লৌহপিণ্ড নিরূপিত বৃত্তিত্বার যাবতীয় অভাব বা সামান্যভাব হেতু বহ্নিতে থাকে না। তাই জলহ্রদাদি নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব হেতু বহ্নিতে থাকলেও উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডনিষ্ঠ বৃত্তিত্বার অভাব হেতু বহ্নিতে পাওয়া যায় না বলে হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বই প্রসিদ্ধ হয়, তার অভাব নয়।

মথুরানাথ দেখান যে, ব্যাপ্তির প্রথম লক্ষণস্থ সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিতার যে অভাব, সেই অভাবকে যে কোন সম্বন্ধে ধরলে হবে না। যদি যে কোন সম্বন্ধে বৃত্তিতার অভাব

বা বৃত্তিত্বাভাবকে ধরা হয় তাহলে সমবায় সম্বন্ধে কিংবা কালিক বিশেষণতা সম্বন্ধে বৃত্তিত্বাভাবকে গ্রহণ করা যেতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এই সদ্ধেতুক অনুমিতি স্থলেই ব্যাপ্তি লক্ষণটির সমন্বয় হয় না। ফলে লক্ষণটি অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয়। এরূপ অব্যাপ্তি বারণের জন্য মথুরানাথ বলেন– "সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিশ্চ হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন বিবক্ষণীয়া"[৮] অর্থাৎ বৃত্তিতার অভাব বলতে হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অভাবকে বুঝতে হবে।

বৃত্তিতার অভাব বলতে যদি সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন অভাব ধরা হয়, তাহলে 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ'। এই সদ্ধেতুক অনুমিতিস্থলে লক্ষণে অব্যাপ্তিদোষ দেখা দেয়। কারণ এখানে সাধ্যাভাবাধিকরণ অর্থাৎ বহ্নির অভাবের অধিকরণ ধূমাবয়বকে ধরা যায়। এই ধূমাবয়বে হেতু ধূম সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তি হয়, অবৃত্তি হয় না। ফলে অব্যাপ্তি দোষ ঘটে। আবার কালিক সম্বন্ধে বৃত্তিতার অভাবকে বুঝলেও অনুরূপ অব্যাপ্তি দোষ দেখা দেয়। কেননা সাধ্যাভাবাধিকরণ অর্থাৎ বহ্নির অভাবের অধিকরণ জলহ্রদাদিকে ধরলেও সেখানে হেতু ধূম কালিক সম্বন্ধে বৃত্তি হয়ে যায়, অবৃত্তি হয় না। কালিক সম্বন্ধে পদার্থমাত্রই কালে এবং জন্য বস্তুতে থাকে। ফলে এক্ষেত্রেও অব্যাপ্তি দোষ দেখা দেয়।

কিন্তু যদি হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে বৃত্তিতার অভাবকে ধরা হয়, তাহলে আর এরূপ অব্যাপ্তি দোষের আশঙ্কা থাকে না। হেতু যে সম্বন্ধে পক্ষে থাকে, তাকে হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ বলে। আলোচ্য ক্ষেত্রে হেতু ধূম, পক্ষ পর্বতে সংযোগসম্বন্ধে থাকায় এক্ষেত্রে হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ সংযোগ। সাধ্যাভাবাধিকরণ ধূমাবয়ব বা জলহ্রদাদি যাই ধরা হোক না কেন,

---

[৮] তদেব, পৃষ্ঠা- ৩০।

হেতুতাবচ্ছেদক সংযোগসম্বন্ধে হেতু ধূম সেখানে বৃত্তি হয় না, অবৃত্তিই হয়। ফলে লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ নিবারিত হয়।

৪.১.২ সাধ্যবদ্‌ভিন্নসাধ্যাভাববদ্‌বৃত্তিত্বম্ লক্ষণটির ব্যাখ্যা

৪.১.২.১ লক্ষণার্থ নিরূপণ

এবার দ্বিতীয় লক্ষণটি বিবেচনা করা যাক। দ্বিতীয় লক্ষণটি প্রথম লক্ষণের প্রায় অনুরূপ – ''সাধ্যবদ্‌ভিন্নসাধ্যাভাববদ্‌বৃত্তিত্বম্''। এখানেও সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাবকে ব্যাপ্তি বলা হয়েছে। তবে সেইসঙ্গে বলা হয়েছে যে ওই সাধ্যাভাবাধিকরণকে সাধ্যবৎ হতে ভিন্ন হতে হবে। সাধ্যবৎ ভিন্ন কথার অর্থ সাধ্যের অধিকরণ ভিন্ন। কাজেই সাধ্যের অধিকরণ হতে ভিন্ন হয় এমন সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাব হেতুতে থাকবে। এই লক্ষণটিতে 'সাধ্যবদ্ভিন্ন' পদের সাথে সাধ্যাভাব পদের অন্বয় হয়েছে। ''সাধ্যবদ্ ভিন্ন যঃ সাধ্যাভাবঃ'' এইভাবে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাসের অর্থ বুঝে নিতে হবে। ফলে সমগ্র লক্ষণটির অর্থ দাঁড়াবে সাধ্যবৎ ভিন্নে বর্তমান যে সাধ্যাভাব তার অধিকরণ নিরূপিত আধেয়তার অভাব। ওইরূপ আধেয়তার অভাব সদ্ হেতুতে পাওয়া যায়।

যেমন 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' স্থলটিতে সাধ্য হল বহ্নি এবং সাধ্যবৎ হল মহানসাদি। সেই সাধ্যবৎ ভিন্ন জলাশয়াদি নিরূপিত আধেয়তার অভাব হেতু ধূমে থাকায় অব্যাপ্তি হয় না। একইভাবে 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' এই অসদ্‌হেতুক অনুমিতি স্থলটিতে সাধ্য হল ধূম এবং ধূমাদিকরণ মহানসাদি। ওই সাধ্যবৎ ভিন্ন হল অয়োগোলক। যেখানে সাধ্য ধূমের অভাব থাকায় অয়োগোলক হল সাধ্যবৎ ভিন্ন সাধ্যাভাববৎ। ওই অধিকরণে হেতু বহ্নি বর্তমান।

ফলে সাধ্যবৎ ভিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত আধেয়তায় হেতুতে পাওয়া যাবে, আধেয়তার অভাব নয়। ফলে ব্যভিচারী হেতুতে লক্ষণ সমন্বয়ের কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

৪.১.২.২ অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যক অনুমিতির ক্ষেত্রে লক্ষণটির সমন্বয়

এখন দেখা দরকার যে অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যক অনুমিতি স্থলে প্রথম লক্ষণটির অব্যাপ্তি ঘটেছিল, আলোচ্য লক্ষণটি সেক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় কিনা। অনুমিতি স্থলটি ছিল 'কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ'। এখানে কপিসংযোগ সাধ্য ও কপিসংযোগাভাব সাধ্যাভাব হওয়ায় এবং একই বৃক্ষ যুগপৎ কপিসংযোগ ও তার অভাব থাকায় কপিসংযোগাভাব নিরূপিত বৃত্তিত্ব হেতুতে থেকে যাচ্ছিল। কিন্তু যদি সাধ্যাভাবাধিকরণটিকে সাধ্যবদ্ভিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণ হিসেবে ধরা হয় তাহলে আর ওইরূপ সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত আধেয়তা হেতুতে পাওয়া যাবে না কারণ কপিসংযোগ যেখানে সাধ্য সেখানে সাধ্যবৎ হল কপিসংযোগের অধিকরণ এতদ্বৃক্ষ। সাধ্যবদ্ভিন্ন পদার্থ হবে ওই বৃক্ষ ভিন্ন পদার্থ। পূর্বের ন্যায় তা বৃক্ষটির কাণ্ড বা মূলাবচ্ছিন্ন অংশ হবে না । পরন্তু সমগ্র বৃক্ষ ভিন্ন যাবতীয় পদার্থ হবে যার মধ্যে অপরাপর বৃক্ষ, পাষাণাদি বিদ্যমান। ওই সকল অধিকরণ যুগপৎ সাধ্যবদ্ভিন্ন এবং সাধ্যাভাববৎ; যেহেতু ওই সকল পদার্থে কপিসংযোগের অভাব রয়েছে। সাধ্যবদ্ভিন্ন সাধ্যাভাববৎ পাষাণাদি ওই সকল পদার্থে এতদ্ববৃক্ষত্ব না থাকায় সাধ্যবদ্ভিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত আধেয়তার অভাবই হেতু এতদ্ববৃক্ষত্বে পাওয়া যায়। সুতরাং পূর্বের ন্যায় অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না।

এখানে লক্ষণটির প্রাচীন ও নব্য সম্মত ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে একটি বিবাদ দেখা দেয়। প্রাচীনদের যেরূপ লক্ষণটি ব্যাখ্যা তা এইরকম – সাধ্যবৎ বা সাধ্যবিশিষ্ট হতে ভিন্ন যে সাধ্যাভাববিশিষ্ট তন্নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবই ব্যাপ্তি। প্রাচীনেরা 'সাধ্যবদ্ভিন্ন' পদার্থটিকে

সাধ্যাভাববানের সঙ্গে অভেদ সম্বন্ধে অন্বয় করেন। সাধ্যবদ্ভিন্ন পদের সাথে সাধ্যাভাববৎ পদের অভেদ সম্বন্ধে কর্মধারই সমাস স্বীকার করে পুনরায় তার সঙ্গে অবৃত্তিত্ব-এর অন্বয় করেন তাঁরা। এর দ্বারা অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যক অনুমিতিতে অব্যাপ্তি বারিত হলেও 'সাধ্যাভাববৎ' পদটির যোজনা নিরর্থক হয়ে পড়ে। এই কারণে নব্যরা লক্ষণটির স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। তাঁরা 'সাধ্যবদ্ভিন্ন' পদের সঙ্গে 'সাধ্যাভাব' পদের সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস করে, সেই সমাসবদ্ধ 'সাধ্যবদ্ভিন্নসাধ্যাভাব' পদের উত্তর 'মতুপ' প্রত্যয় যোগ করে 'সাধ্যবদ্ভিন্নসাধ্যাভাববৎ' পদ নিষ্পন্ন করেন। তারপর 'সাধ্যবদ্ভিন্ন সাধ্যাভাববতো ন বৃত্তির্যত্র' এভাবে ত্রিপদ ব্যধিকরণ বহুব্রীহির উত্তর 'ত্ব' প্রত্যয় যোগে 'সাধ্যবদ্ভিন্ন সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্' পদটি ব্যুৎপাদন করেন। ফলে সমগ্র লক্ষণটির অর্থ দাঁড়ায় সাধ্যবদ্ভিন্নে বৃত্তি যে সাধ্যাভাবাধিকরণ, সেই অধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিতার অভাবই ব্যাপ্তি। এরূপ সমাসার্থ গ্রহণ করার ফলে 'কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ' এইস্থলে এতদ্বৃক্ষভিন্ন জলাশয়াদি অপরাপর পদার্থরূপ সাধ্যবদ্ভিন্নে কপিসংযোগাভাবরূপ সাধ্যাভাব বৃত্তি হওয়ায় সাধ্যবদ্ভিন্ন সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব হেতু এতদ্বৃক্ষত্বে থাকায় লক্ষণটি সমন্বয় হয়ে যায়। আর তাই 'সাধ্যাভাববৎ' পদটির বিরুদ্ধে ব্যর্থতার আপত্তি আর হয় না।

কিন্তু এইরূপ নব্যমত গ্রহণ করার ক্ষেত্রেও সমস্যা আছে। কারণ এভাবে 'সাধ্যবদ্ভিন্ন সাধ্যাভাববৎ' পদের সঙ্গে বৃত্তিত্বাভাবের অন্বয় করলে এক্ষেত্রেও 'সাধ্যাভাববৎ' পদের প্রয়োজন থাকে না। 'সাধ্যবদ্ভিন্নাবৃত্তিত্বম' এরূপ লঘু লক্ষণের দ্বারাই কার্য সিদ্ধি হয়। কারণ 'কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ' এইস্থলে কপিসংযোগবদ্ভিন্নে অর্থাৎ এতদ্বৃক্ষভিন্ন অপরাপর পদার্থ হেতু 'এতদ্বৃক্ষ' বৃত্তি না হওয়ায় লক্ষ্যে লক্ষণ সঙ্গতই হয়।

কিন্তু নব্যসম্মত ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে এই আশঙ্কা সমীচীন নয় বলে মথুরানাথ মনে করেন। কারণ 'সাধ্যবদ্ভিন্নে যে সাধ্যাভাব তার অধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিভার অভাবই ব্যাপ্তি' - এরূপ ব্যাখ্যা হতে জানা যায় যে মূল লক্ষণে 'সাধ্যবদ্ভিন্ন' 'সাধ্যাভাব' এবং 'তদ্বৎ' প্রভৃতি পদের নিবেশ থাকলেও 'সাধ্যাভাববৎ' রূপে কোনো পদের নিবেশ না থাকায় 'সাধ্যাভাববৎ' পদের ব্যর্থতাপত্তির প্রশ্নই ওঠে না। তবে 'সাধ্যবদ্ভিন্নাবৃত্তিত্বম্' এরূপ লক্ষণ করলেও কোনো অসুবিধা হয় না বলে একে পৃথক লক্ষণ করা যেতে পারে। কিন্তু মূল লক্ষণটি পরিবর্তন করে এরূপ করা উচিত নয় বলে মথুরানাথের অভিমত। তাছাড়া ''সাধ্যবৎপ্রতিযোগিকান্যোন্যা-ভাবাসামানাধিকরণ্যম্'' এবং ''সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বম্'' এই তৃতীয় ও পঞ্চম লক্ষণদ্বয় প্রকৃতপক্ষে 'সাধ্যবদ্ভিন্নাবৃত্তিত্বম্' এর সমার্থক এবং পঞ্চম লক্ষণের সঙ্গে এই লঘু লক্ষণটি অভিন্ন হয়ে পড়ে। সুতরাং নব্যমতের বিরুদ্ধে 'সাধ্যাভাববৎ' পদের ব্যর্থতার আশঙ্কা করা যায় না।

আপত্তি হতে পারে নব্যসম্মত ব্যাখ্যায় 'সাধ্যাভাববৎ' পদটি ব্যর্থ না হলেও 'সাধ্যাভাব' পদটি নিবেশের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। কারণ সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তি যা তৎ অধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবকে ব্যাপ্তি বললে 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এই প্রসিদ্ধ অনুমিতি স্থলে অসম্ভব দোষের আপত্তি হয়। কারণ এস্থলে সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তি যে অর্থাৎ বহ্নিমদ্ভিন্ন জলহ্রদাদিতে বৃত্তি যে দ্রব্যত্ব এই দ্রব্যত্ব পর্বতাদিতেও থাকায় এক্ষেত্রে সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তি যে তৎ অধিকরণ তা হয়ে যায় পর্বতাদি। এই পর্বতাদিতে হেতুধূম বৃত্তি হওয়ায় অসম্ভব দোষ অনিবার্য হয়ে পড়ে। এই অসম্ভবাপত্তি বারণের জন্য লক্ষণশরীরে 'সাধ্যাভাব' পদের নিবেশ অত্যাবশ্যক।

পুনরায় আশঙ্কা হতে পারে উক্ত অসম্ভবাপত্তি বারণের জন্য যদি 'সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তির্যো অভাবঃ তদ্বদ অবৃত্তিত্বম্' এভাবে লক্ষণটিকে বলা হয় তাহলে উক্ত প্রকারে দ্রব্যত্বকে গ্রহণ

করে আর অসম্ভবাপত্তি দেখানো যাবে না, যেহেতু দ্রব্যত্ব অভাব পদার্থ নয়। এরূপ আশঙ্কার উত্তরে মথুরানাথ বলেছেন এক্ষেত্রে 'সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তির্যো অভাবঃ' এই অভাব অর্থে 'দ্রব্যত্বাভাবাভাব' রূপ অভাবকেও গ্রহণ করা যায়। এই দ্রব্যত্বাভাবাভাব দ্রব্যত্বস্বরূপ হওয়ায় উক্ত ধূমহেতুক বহ্নিসাধ্যক অনুমিতিস্থলে পূর্ববৎ অসম্ভবাপত্তি অনিবার্য হয়ে ওঠে।

যদি এক্ষেত্রে এমন কথা বলা হয় যে অধিকরণ ভেদে অভাব ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় আলোচ্যস্থলে সাধ্যবদ্ভিন্ন জলহ্রদাদিবৃত্তি দ্রব্যত্বরূপ দ্রব্যত্বাভাবাভাব এবং পর্বতনিষ্ঠ দ্রব্যত্বরূপ দ্রব্যত্বাভাবাভাব ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় উক্ত অসম্ভবাপত্তি আর হয় না। তাহলে তার উত্তরে মথুরানাথ বলবেন- "সাধ্যাভাবেত্যত্র সাধ্যপদমপ্যত এব দ্রব্যত্বাদেরপি দ্রব্যত্বাভাবাভাবত্বাৎ ভাবরূপাভাবস্য চাধিকরণভেদেন ভেদাভাবাৎ"।[৯] বক্তব্য এই ভাবস্বরূপ অভাব অধিকরণ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন না হওয়ায় দ্রব্যত্বাভাবাভাবের অধিকরণরূপে পুনরায় পর্বতাদিকে গ্রহণ করলে পূর্ববৎ অসম্ভবাপত্তি থেকেই যায়। সুতরাং লক্ষণে 'সাধ্যাভাব' পদমধ্যস্থ 'সাধ্য' পদটিও প্রয়োজন। অতএব 'সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তির্যঃ সাধ্যাভাবঃ তদ্বদবৃত্তিত্বম্' এভাবেই দ্বিতীয় লক্ষণটিকে বুঝতে হবে।

এখন 'ভাবরূপ অভাব অধিকরণ ভেদে ভিন্ন নয়'- এই নিয়ম যদি স্বীকার করা হয় তাহলে 'ঘটত্বঘটাকাশসংযোগএতদন্যতরাভাবান গগনত্বাৎ' এই সদ্ধেতুক অনুমিতিস্থলে ব্যাপ্তি লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ ঘটে। এক্ষেত্রে গগনত্ব হেতুর অধিকরণে সাধ্য ঘটাকাশসংযোগান্যতরাভাব থাকায় গগনত্ব হেতুটি সদ্ধেতু। সংযোগ দুটি হওয়ায় ঘটাকাশসংযোগ থাকে ঘটে ও আকাশে এবং ঘটত্ব থাকে ঘটে। অতএব উক্ত অন্যতর থাকে

[৯] তদেব, পৃষ্ঠা- ৪০।

ঘটে ও আকাশে কিন্তু উক্ত অন্যতরের অভাবরূপ সাধ্য থাকে ঘটভিন্ন সর্বত্র। এখানে সাধ্যবৎ হল ঘটভিন্ন সমস্ত পদার্থ এবং সাধ্যবদ্ভিন্ন হল কেবল ঘট। এখন সাধ্যবদ্ভিন্ন বৃত্তি যে সাধ্যাভাব অর্থাৎ ঘটবৃত্তি যে 'ঘটত্বঘটাকাশসংযোগএতদন্যতরাভাবাভাব' তা একটি ভাবস্বরূপ অভাব হওয়ায় পূর্বোক্ত নিয়ম বলে (ভাবস্বরূপ অভাব অধিকরণ ভেদে ভিন্ন নয়) যে অন্যতরাভাবাভাব আকাশে থাকে, সেই অন্যতরাভাবাভাব ঘটেও থাকে এইরূপ স্বীকার করতে হয়। এভাবে ঘটত্বঘটাকাশসংযোগান্যতররূপ সাধ্যাভাবের অধিকরণ ঘট ও আকাশ হওয়ায় অন্যতরটিও উভয়টিতে থাকে। এখন সাধ্যাভাবাধিকরণ গগন নিরূপিত বৃত্তিত্ব হেতু গগণত্বে থাকায় বৃত্তিতার অভাব হেতুতে না থাকায় ব্যাপ্তি লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ ঘটে।

এই অব্যাপ্তি বারণের জন্য যদি লক্ষণটিকে 'সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তিত্ববিশিষ্টসাধ্যাভাবত্ব' এভাবে ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে উক্ত অব্যাপ্তি বারিত হয়। কারণ উক্ত স্থলে সাধ্যবদ্ভিন্ন কেবল ঘট হওয়ায়, সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তিত্ববিশিষ্ট অর্থাৎ ঘটবৃত্তিত্ববিশিষ্ট যে ঘটত্বঘটাকাশসংযোগ-এতদন্যতরাভাবাভাবরূপ সাধ্যাভাব তা কেবল বিশিষ্টাধিকরণ অর্থাৎ ঘটেই থাকে, গগনে নয়। ফলে গগণ আর সাধ্যাভাবের অধিকরণ হতে না পারায় সাধ্যাভাবাধিকরণ কেবল ঘট হওয়ায়, ওই ঘট নিরূপিত বৃত্তিতার অভাবই গগনত্ব হেতুতে থাকায় অব্যাপ্তি দোষ বারিত হয়।

কিন্তু 'সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তিত্ববিশিষ্ট সাধ্যাভাব' এভাবে লক্ষণটি পরিবর্তন করলে, মূল লক্ষণে নিবিষ্ট 'সাধ্যাভাব' পদের ব্যর্থতার আপত্তি অব্যবহিত থাকে। কারণ 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ'- এই সদ্ধেতুক অনুমিতিস্থলে সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তিত্ববিশিষ্ট যে দ্রব্যত্ব অর্থাৎ বহ্নিমদ্ভিন্নজলহ্রদাদিবৃত্তিত্ববিশিষ্ট যে দ্রব্যত্ব, সেই দ্রব্যত্বের অধিকরণ কেবল জলহ্রদাদিই হবে, পর্বত নয়। ফলে পর্বতকে গ্রহণ করে পরিবর্তিত লক্ষণের দ্বারা আর অসম্ভবাপত্তির সম্ভবনা

না থাকায় লক্ষণঘটক 'সাধ্যাভাব' পদটি ব্যর্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু মূল লক্ষণে সাধ্যাভাব পদটি নিবিষ্ট থাকায়, লক্ষণের পরিবর্তন করে 'সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তিত্ববিশিষ্টবদ্ বৃত্তিত্বম' এইরূপ লঘুলক্ষণ স্বীকার করা যায় না। আর লক্ষণটিকে উক্ত প্রকার পরিবর্তন করা সম্ভব না হওয়ায় 'ঘটত্বঘটাকাশসংযোগএতদন্যতরাভাববান গগনত্বাৎ' এই সদ্ধেতুক অনুমিতিস্থলে পূর্ববৎ অব্যাপ্তি থেকেই যায়।

এর উত্তরে নব্য মত অনুসরণ করে মথুরানাথ বলেছেন– "অভাবাভাবস্যাতিরিক্ত-ত্বমতেনৈততল্লক্ষণকরণাৎ তথাচ অধিকরণভেদেনাভাবভেদাৎ সাধ্যবদ্ভিন্নে ঘটে বর্ত্তমানস্য সাধ্যাভাবস্য প্রতিযোগিব্যধিকরণস্য প্রতিযোগিমতি গগনেহসত্ত্বাদব্যাপ্তেরভাবাৎ"[১০] অর্থাৎ অভাবের অভাব প্রতিযোগিস্বরূপ নয় বরং তা অতিরিক্ত অভাবস্বরূপ এবং অধিকরণ ভেদে অভাব ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায়, আলোচ্যস্থলে সাধ্যবদ্ভিন্ন যে ঘট, সেই ঘটে তাদৃশ অন্যতরাভাবাভাবরূপ যে সাধ্যাভাব থাকে, সেই সাধ্যাভাব আর ঘটত্বঘটাকাশসংযোগান্যতরস্বরূপ হবে না বরং পৃথক একটি অভাব স্বরূপ হবে। ফলে সাধ্যবদ্ভিন্নবৃত্তিসাধ্যাভাবাধিকরণ রূপে শুধু ঘটকেই গ্রহণ করা যাবে আকাশকে গ্রহণ করা যাবে না। ফলে সাধ্যবদ্ভিন্নসাধ্যাভাবাধিকরণ ঘটনিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব গগনত্ব হেতুতে থাকায়, ব্যাপ্তি লক্ষণের আর অব্যাপ্তি হয় না।

এখন যদি অভাবের অভাবকে প্রতিযোগিস্বরূপ না বলে অতিরিক্ত অভাবস্বরূপ স্বীকার করা হয়, তাহলে উক্ত অসম্ভবাপত্তি বারণের জন্য 'সাধ্য' পদটি নিবেশের আর প্রয়োজন হয় না। কারণ উক্ত অনুমিতিস্থলটি সাধ্যবদ্ভিন্ন জলহ্রদাদিতে বৃত্তি অভাব বলতে আর

---

[১০] তদেব, পৃষ্ঠা- ৪১।

দ্রব্যত্বাভাবাভাবরূপ দ্রব্যত্বকে গ্রহণ করা যাবে না। ফলে সাধ্যবদ্ভিন্নে দ্রব্যত্ব গৃহীত না হওয়ায় এই দ্রব্যত্বের অধিকরণরূপে পর্বতাদিকে গ্রহণ করে আর ধূম হেতুতে অসম্ভবাপত্তি দেখানো না যাওয়ায় 'সাধ্য' পদের ব্যর্থতাপত্তি থেকেই যায়।

এরূপ আশঙ্কার উত্তরে মথুরানাথ বলেছেন সংযোগ প্রভৃতি অব্যাপ্যবৃত্তি পদার্থের অভাব অধিকরণ ভেদে ভিন্ন হয় অন্য অভাব অধিকরণ ভেদে ভিন্ন হয় না। সুতরাং 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ'- এই স্থলে সাধ্যবদ্ভিন্ন জলহ্রদাদিবৃত্তি যে ঘটাভাব এবং পর্বতাদিবৃত্তি যে ঘটাভাব এই অভাব দুটি অধিকরণ ভেদে ভিন্ন নয়, বরং একই অভাব। কারণ এক্ষেত্রে ঘটাভাবটি প্রতিযোগী ব্যধিকরণই হয়ে থাকে। সুতরাং জলহ্রদ ও পর্বত এই অধিকরণদ্বয়ে বিদ্যমান এক অভিন্ন ঘটাভাব ব্যাপ্যবৃত্তিই হয়। ফলে সাধ্যবদ্ভিন্ন জলহ্রদাদিবৃত্তি যে ঘটাভাব সেই একই অভাব পর্বতাদিতেও বৃত্তি হওয়ায়, এই পর্বতনিরূপিত বৃত্তিতা হেতু ধূমে থাকায় পূর্ববৎ অসম্ভবাপত্তি থেকেই যায়। সুতরাং লক্ষণে 'সাধ্য' পদের নিবেশ করতেই হবে।

৪.১.৩ সাধ্যবৎপ্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্যম্ লক্ষণের ব্যাখ্যা

৪.১.৩.১ লক্ষণের অর্থ নিরূপণ

'অব্যাভিচরিতত্ব' পদপ্রতিপাদ্য ব্যাপ্তির তৃতীয় লক্ষণটি হল- "সাধ্যবৎপ্রতিযোগিকান্যো-ন্যাভাবাসামানাধিকরণ্যম্" অর্থাৎ সাধ্যবৎ বা সাধ্যবিশিষ্ট হয়েছে প্রতিযোগী যার এমন যে অন্যোন্যাভাব সেই অন্যোন্যাভাবের আসামানধিকরণ্যই হল ব্যাপ্তি। যেটি সাধ্যের অধিকরণ সেটি যে অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগী হয় তাই হল সাধ্যবৎ প্রতিযোগিক অন্যোন্যাভাব। সহজকথায় এ হল সাধ্যবদের ভেদ। ওই ভেদের সঙ্গে হেতুর অসমানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি অর্থাৎ

সাধ্যবদের ভেদ যে অধিকরণে থাকে হেতু সেই অধিকরণে বৃত্তি হয় না। সাধ্যবৎ-এর ভেদ বা সাধ্যাভাবের সঙ্গে হেতুর এই অসমানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি। যে হেতু সাধ্যবৎ প্রতিযোগিক অন্যোন্যাভাবের সাথে এক অধিকরণে থাকে না সেই হেতুর যে ধর্ম বা ভাব তাকেই ব্যাপ্তি বলা হয়েছে। যেমন 'পর্বতঃ বহ্নিবান্ ধুমাৎ' এই অনুমানে সাধ্য হল বহ্নি। আর এই সাধ্য বহ্নি চত্বর, গোষ্ঠ, মহানস প্রভৃতি স্থানে থাকায় মহানসাদি হল সাধ্যবৎ। ওই সাধ্যবৎ প্রতিযোগিক অন্যোন্যাভাব হল বহ্নিমৎ মহানসাদির ভেদ। ওই ভেদ যে যে বস্তুতে থাকে সেই সেই বস্তু হেতু ধূমের অধিকরণ হয় না। যেমন বহ্নিমৎ মহানসাদি ভিন্ন যে জলাশয়াদি পদার্থ তারা ধূমের অধিকরণ নয়।

'ধূমবান্ বহ্নেঃ' এই অসদ্ধেতুক অনুমিতির স্থলে সাধ্য হল ধুম। সাধ্যবৎ হল পর্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানস প্রভৃতি। সাধ্যবৎ প্রতিযোগিক অন্যোন্যাভাব হল পর্বতাদি ধূমাধিকরণের ভেদ। ওই ভেদ রয়েছে অয়গোলকে। অন্যদিকে হেতু বহ্নিও রয়েছে অয়োগোলকে। সুতরাং সাধ্যবৎ প্রতিযোগিক অন্যোন্যাভাবের সাথে হেতুর অসামানাধিকরণ্য নেই বরং সামানাধিকরণ্যই রয়েছে। ফলে বহ্নি হেতুতে লক্ষণটির সমন্বয় না হওয়ায় অব্যাপ্তি দোষ হয় না।

৪.১.৩.২ লক্ষণ ঘটক পদসমূহের ব্যাবৃত্তি প্রদর্শন

কাজেই আলোচ্য লক্ষণটি প্রাথমিকভাবে অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি দোষমুক্ত বলে মনে হয়। কিন্তু এই লক্ষণের অন্তর্গত অন্যোন্যাভাব পদটিকে 'প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্ব' অর্থে গ্রহণ করতে হবে কারণ ওই পারিভাষিক অর্থে যদি শব্দটিকে গ্রহণ করা না হয় তাহলে সাধ্যবৎ প্রতিযোগিক অন্যোন্যাভাব কথাটির দ্বারা ব্যাসজ্যবৃত্তিধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অন্যোন্যাভাব বোধিত হতে

পারে; আর সেক্ষেত্রে সাধ্যবৎ প্রতিযোগিক অন্যোন্যাভাব যে অধিকরণে থাকবে সেখানে হেতুর বৃত্তিত্ব থেকে যাবে। তার ফলে কোনো ক্ষেত্রেই সাধ্যবৎ অন্যোন্যাভাবের সঙ্গে হেতুর অসামানাধিকরণ্য পাওয়া যাবে না। ফলস্বরূপ লক্ষণটির ক্ষেত্রে অসম্ভব দোষ দেখা দেবে। বিষয়টি স্পষ্ট করতে গেলে ব্যাসজ্যবৃত্তিধর্ম কী বোঝায় তার পরিচয় দেওয়া দরকার। একত্বের দ্বারা অনবচ্ছিন্ন পর্যাপ্তিক ধর্ম হল ব্যাসজ্যবৃত্তি। সহজ কথায় বললে যে ধর্মটি একত্বরূপ পর্যাপ্তি দ্বারা একাধিক বস্তুকে ব্যাপ্ত করে থাকে, এক অবচ্ছেদে থাকে না, সেই ধর্মকে বলা হয় ব্যাসজ্যবৃত্তি ধর্ম। যেমন দ্বিত্ব, উভয়ত্ব, ত্রিত্ব প্রভৃতি হল ব্যাসজ্যবৃত্তি ধর্ম। আর পর্যাপ্তি হল স্বরূপ সম্বন্ধ বিশেষ। এই পর্যাপ্ত সম্বন্ধেই একত্ব, দিত্ব বা ত্রিত্ব প্রভৃতির উপলব্ধি হয়ে থাকে এই পর্যাপ্তির ক্ষেত্রে সর্বদাই একাধিক বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে একের প্রতীতি হয়ে থাকে। তাই পর্যাপ্তির ধর্মই হল ব্যাসজ্যবৃত্তি। আলোচ্য ব্যাপ্তি লক্ষণের অন্তর্গত অন্যোন্যাভাবটিকে প্রতিযোগ্যবৃত্তিতাবচ্ছিন্ন অন্যোন্যাভাব হিসেবে যদি ধরা না হয় তাহলে কীভাবে ব্যাস্যজ্যবৃত্তিধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অন্যোন্যাভাব এসে পড়ে তা স্পষ্ট করা যাক। ‘বহ্নিমান্ ধূমাৎ’ স্থলে সাধ্যবৎ প্রতিযোগিক অন্যোন্যাভাবকে দুইভাবে দেখা যেতে পারে ১) বহ্নিমৎ পর্বতাদি প্রতিযোগিক অন্যোন্যাভাব এবং ২) বহ্নিমৎ ঘটোভয়ং ন – এই প্রকার বহ্নিমৎ ও ঘট উভয় প্রতিযোগিক অন্যোন্যাভাব। বহ্নিমৎ ও ঘট – এই উভয়ের যে ভেদ বা অন্যোন্যাভাব সেই ভেদ বহ্নিমৎ-এ যেমন উপস্থিত থাকে তেমনই ঘটেও উপস্থিত থাকে। ফল বহ্নিমৎ পর্বত এবং ঘট উভয়ই ওই অন্যোন্যাভাবের অধিকরণ হয়। এই অন্যোন্যাভাবটি ব্যাসজ্যবৃত্তি (উভয়ত্ব) ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অন্যোন্যাভাব। কাজেই এই অন্যোন্যাভাবের অধিকরণ যেমন মহানস এবং ঘট হতে পারে তেমনই পর্বতও হতে পারে।

একথা ঠিক যে পর্বতের ভেদ যেমন পর্বতে নেই তেমনই ঘটের ভেদও ঘটে নেই। কিন্তু পর্বত ও ঘট এতদুভয়ের ভেদ পর্বত, ঘট দুটিতেই আছে। আর এই পর্বত যেমন সাধ্য বহ্নির অধিকরণ হয় তেমনই হেতু ধূমেরও অধিকরণ হতে পারে। ফলে সাধ্যবৎপ্রতিযোগিক অন্যোন্যাভাবের অধিকরণ যে পর্বতাদি, সেই পর্বতাদি নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব হেতু ধূমে থাকে না। কাজেই এখানে সাধ্যবৎপ্রতিযোগিক অন্যোন্যাভাবের অসামানাধিকরণ্য পাওয়া গেল না ফলে লক্ষ্য স্থলে লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ায় এখানে অব্যাপ্তি দোষ দেখা দেয়। এইভাবে প্রতিটি সদ্ধেতুতে ওই দোষ অনিবার্য হওয়ায় লক্ষণটির অসম্ভব দোষ দেখা দেয়।

এইরূপ দোষ বারণ কল্পে মথুরানাথ রহস্যটীকায় বলেছেন – "অন্যোন্যাভাবশ্চ প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্বেন বিশেষণীয়ঃ, তেন সাধ্যবতৌব্যাসজ্যবৃত্তিধর্ম্মাবচ্ছিন্ন- প্রতিযোগিতাকা-ন্যোন্যাভাববতি হেতোর্বৃত্তাবপি নাসম্ভবঃ"[১১] অর্থাৎ সাধ্যবৎপ্রতিযোগিক অন্যোন্যাভাবটিকে 'প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্ব' বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করতে হবে। 'প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্ব' এর অর্থ প্রতিযোগীতে বৃত্তি না হওয়া অর্থাৎ অন্যোন্যাভাবটি তার প্রতিযোগীতে অবৃত্তি হবে। সাধ্যবৎ যদি ব্যাসজ্যবৃত্তি ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয় তাহলে সেই সাধ্যবৎ এর অন্যোন্যাভাবের বৃত্তিতা প্রতিযোগীতে অর্থাৎ সাধ্যবৎ এ থেকে যায়। কিন্তু সাধ্যবৎ এর অন্যোন্যাভাব বলতে যদি প্রতিযোগীতে অবৃত্তি অন্যোন্যাভাবকে গ্রহণ করা হয় তাহলে আর ব্যাসজ্যবৃত্তি ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগীতাক অন্যোন্যাভাবকে গ্রহণ করা যাবে না। কারণ ব্যাসজ্যবৃত্তি ধর্মাবচ্ছিন্ন অন্যোন্যাভাবটি নিজ প্রতিযোগীতে অবৃত্তি না হয়ে যায় প্রতিযোগী বৃত্তি হয়ে যায়। আর এইরকম বললে আলোচ্য দৃষ্টান্তে সাধ্যবৎ প্রতিযোগীতাক অন্যোন্যাভাবের অধিকরণ অর্থাৎ

[১১] তদেব, পৃষ্ঠা- ৪২।

বহ্নিমদ্‌ভেদাদিকরণ জলহ্রদাদিই হয়, পর্বতাদি হয় না। আর এর ফলে জলহ্রদাদি নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব হেতু ধূমে থাকায় হেতুতে সাধ্যবৎ প্রতিযোগীতাক অন্যোন্যাভাবের অসামানাধিকরণ্যই থেকে যায়। ফলে লক্ষ্য স্থলে লক্ষণ সমন্বয় হয় বলে আর পূর্বোক্ত অসম্ভব দোষের আশঙ্কাও থাকে না।

কিন্তু এই সমাধানের কিছু অসুবিধা আছে। প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্ব বিশেষণটি যোগ করলে ব্যাসজ্যবৃত্তি ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অন্যোন্যাভাব পরিত্যক্ত হতে পারে এবং এতে অব্যাপ্তির উত্থাপিত আশঙ্কা দূর হতে পারে। কিন্তু এই সমাধান গ্রহণ করলে নানা অধিকরণ সাধ্যক অনুমিতিতে লক্ষণটির অব্যাপ্তির আশঙ্কা অব্যাহত থাকে। যেমন 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' স্থলে সাধ্য বহ্নির নানা অধিকরণ পর্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানস ইত্যাদি নানা অধিকরণ রয়েছে। এখানে সাধ্যের এক অধিকরণের সাথে অন্য অধিকরণের ভেদ থাকায় প্রত্যেক সাধ্যবৎ-ই অন্য সাধ্যবৎ-এর অন্যোন্যাভাবের অধিকরণ হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সাধ্যবৎ প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাবের অধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাব বা অসমানাধিকরণ্য আর হেতু ধূমে পাওয়া যাবে না। তাই এক অব্যাপ্তি দূর করতে গিয়ে অন্য অব্যাপ্তি এসে পড়বে। এই সমস্যার সমাধান নির্দেশ করেছেন মথুরানাথ। তিনি বলেছেন – "...প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্বমপহায় সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাব বিবক্ষণে"[১২] অর্থাৎ লক্ষণটিকে সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাব হিসাবে ধরতে হবে, ওই প্রতিযোগ্যবৃত্তিত্ব সাধ্যবৎ প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাব রূপে নয়। কারণ সাধ্যবানকে যদি সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন বলা হয় তাহলে আর সাধ্যবৎ এর ব্যাসজ্যবৃত্তি ধর্মাবচ্ছিন্ন হওয়ার কোনো

[১২] তদেব, পৃষ্ঠা- ৪২।

সম্ভাবনা থাকে না। তবে কিনা 'সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্নসাধ্যবৎ প্রতিযোগিতাক অন্যোন্যাভাব' এইভাবে লক্ষণ করলে 'অব্যভিচরিতত্ব' পদপ্রতিপাদ্য যে পঞ্চলক্ষণ রয়েছে তার সঙ্গে তৃতীয় লক্ষণের আর কোনো তফাৎ থাকবে না। কারণ পঞ্চম লক্ষণে সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিক যে অন্যোন্যাভাব, সেই অন্যোন্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব হেতুতে থাকাকেই ব্যাপ্তি বলা হয়েছে। সুতরাং ওইরূপ পরিমার্জন পুনরুক্তি দোষের জন্ম দেয়। আর ওই পুনরুক্তি দোষ এড়াতে যদি 'সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন' পদটিকে পরিমার্জিত তৃতীয় লক্ষণ থেকে বাদ দেওয়া হয় তাহলে নানা অধিকরণ সাধ্যক অনুমিতি স্থলে অব্যাপ্তির উল্লিখিত আপত্তিটি অব্যাহত থাকে।

এই আশঙ্কা দূর করেছেন মথুরানাথ। তাঁর মতে প্রতিযোগিক অন্যোন্যাভাব পদে যদি সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্নকে ধরা হয় তাহলে পঞ্চম লক্ষণের সাথে তৃতীয় লক্ষণের কোনো ভেদ থাকে না বলে যে আপত্তি করা হয়েছে তা ঠিক নয়। কারণ পঞ্চম লক্ষণে সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাববত্বের উল্লেখ আছে আর তৃতীয় লক্ষণে সাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকান্যোন্যাভাবাধিকরণত্বের উল্লেখ আছে। কাজেই দুটি লক্ষণ অভিন্ন এইরূপ আপত্তি যুক্তিযুক্ত নয়। আরও কথা তৃতীয় লক্ষণে 'অধিকরণত্ব' পদের নিবেশ আছে আর পঞ্চম লক্ষণে এই 'অধিকরণত্ব' পদের নিবেশ নেই। তাই দুটি লক্ষণকে কখনই অভিন্ন বলা যায় না।

৪.১.৪ সকল সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিত্বম্ লক্ষণের ব্যাখ্যা

৪.১.৪.১ লক্ষণটির অর্থ নিরূপণ

'অব্যভিচরিতত্ব' পদ প্রতিপাদ্য ব্যাপ্তির চতুর্থ লক্ষণ হল- "সকল সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাব-প্রতিযোগিত্বম্" অর্থাৎ সাধ্যাভাবের সকল অধিকরণ নিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিত্ব হেতুতে থাকাই হল ব্যাপ্তি। সহজকথায় সাধ্যাভাবের যতগুলি অধিকরণ আছে সেই অধিকরণে বর্তমান অভাবের প্রতিযোগিত্ব হেতুতে থাকায় ব্যাপ্তি। এপর্যন্ত ব্যাপ্তির লক্ষণগুলিতে অবৃত্তিত্ব বা অসমানাধিকরণ্যের কথা বলা হয়েছে। এমনকি অন্তিম লক্ষণটিতেও অবৃত্তিত্বের কথাই বলা হয়েছে। কিন্তু এই চতুর্থ লক্ষণে অবৃত্তিত্ব বা অপ্রতিযোগিত্বের কথা না বলে প্রতিযোগিত্বের কথা বলা হচ্ছে। দাবি করা হয়েছে যে সাধ্যাভাববৎ - এর সকল অধিকরণে থাকে যে সকল অভাব, হেতু সেই যাবতীয় অভাবের প্রতিযোগী হবে। এই লক্ষণে যে 'সকল' পদ প্রতিপাদ্য 'সাকল্য' পদটি আছে তা সাধ্যাভাববতের বিশেষণ। 'সকল' শব্দের অর্থ হল যাবৎ আর তাই 'সাকল্য' শব্দটি যাবতত্বকে সূচিত করে। কাজেই এই অর্থে সকল সাধ্যাভাববৎ বলতে যাবতীয় সাধ্যাভাববৎ বা সাধ্যাভাবাধিকরণকে বুঝতে হবে। ফলে সম্পূর্ণ লক্ষণের অর্থ হবে যাবৎ সাধ্যাভাবাধিকরণনিষ্ঠ যে অভাব সেই অভাবীয় প্রতিযোগিত্ব হেতুতে থাকাই হল ব্যাপ্তি।

'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এই সদ্ধেতুক অনুমিতি স্থলে সাধ্যাভাবের বা বহ্ন্য ভাবের অধিকরণ হল জলহ্রদ প্রভৃতি অসংখ্য পদার্থ। ওই যাবতীয় সাধ্যাভাবাধিকরণে যেসব অভাব থাকে তার মধ্যে ধূমের অভাব পড়ে। কারণ ধূম জলাশয়াদি ওই বহ্ন্যভাবাধিকরণগুলির কোনোটিতেই থাকে না। সুতরাং যাবৎ সাধ্যাভাবাধিকরণে বর্তমান অভাবের ধূম প্রতিযোগী। তাই সদ্ধেতুতে এই লক্ষণটি সমন্বয় হয়। 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' এই অসদ্ধেতুক স্থলে ধূম সাধ্য হওয়ায় সাধ্যাভাবের

অধিকরণ হবে সেইসকল পদার্থ যেগুলিতে ধূম থাকে না। ওই অধিকরণ সকলের মধ্যে যেমন জলাশয় রয়েছে তেমনিই রয়েছে অয়গোলক। এর মধ্যে জলাশয়ে যে সকল অভাব রয়েছে তার মধ্যে বহ্নির অভাব পড়ে। আর বহ্নি সেই অভাবের প্রতিযোগী হয় বলে অসদ্ধেতুতে লক্ষণ সমন্বয়ের আশঙ্কা হতে পারে। কিন্তু এই আশঙ্কা দূরীভূত হয় লক্ষণস্থ 'সকল' শব্দটির দ্বারা। ওই সকল শব্দটির দ্বারা একথাই সূচিত হয় যে যাবতীয় সাধ্যাভাবাধিকরণ বৃত্তি অভাবের প্রতিযোগিত্ব হেতুতে থাকবে। এখানে মনে রাখতে হবে আলোচ্য ক্ষেত্রে বহ্নি সাধ্য হওয়ায় যে সকল সাধ্যাভাবাধিকরণ পাওয়া যায় তাদের মধ্যে একটি হল অয়োগোলক। যে অয়োগোলকে বর্তমান অভাবের বহ্নি হল অপ্রতিযোগী। কারণ অয়োগোলকে বহ্নির অভাব থাকে না। এভাবে যেখানে কোনো একটি সাধ্যাভাববৎনিষ্ঠ অভাবের অপ্রতিযোগিত্ব হেতুতে সিদ্ধ হয় সেখানে সকল সাধ্যাভাববৎনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিত্ব হেতুতে থাকতে পারে না। এভাবে 'সকল' শব্দ যোজনার দ্বারা বহ্নি হেতুতে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা দূর হয়।

৪.১.৪.২ লক্ষণ ঘটক পদসমূহের পারিভাষিক অর্থ

প্রাথমিকভাবে লক্ষণটি অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা মুক্ত হলেও যদি লক্ষণ ঘটক পদগুলির সঠিক নিবেশ না হয় তাহলে লক্ষণটি দুষ্ট হয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই 'যাবৎ' শব্দটির উল্লেখ ইতিমধ্যেই হয়েছে। দেখা গেছে 'সকল' বা 'যাবৎ' শব্দটির উল্লেখ যদি লক্ষণে না থাকে তাহলে সাধ্যাভাবাধিকরণ হিসাবে জলাশয়কে ধরে বহ্নি হেতুতে লক্ষণটির অতিব্যাপ্তি দেখানো সম্ভব। সুতরাং লক্ষণে 'যাবৎ' এর উল্লেখ অপরিহার্য।

দ্বিতীয়ত ‘যাবৎ’ শব্দটি লক্ষণের ঘটক হিসাবে গ্রহণ করেও সেটিকে সাধ্যাভাবাধিকরণের বিশেষণ হিসাবে না ধরে যদি সাধ্যাভাব পদের বিশেষণ হিসাবে গ্রহণ করা হয় তাহলে তার ফল হবে হিতে বিপরীত। ‘যাবৎ’ বা ‘সাকল্য’টি যদি সাধ্যাভাবের বিশেষণ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। তাহলে ‘বহ্নিমান্ ধূমাৎ’ এই সদ্ধেতুক অনুমিতির ক্ষেত্রে তাহলে লক্ষণটির অব্যাপ্তি দেখা দেবে। কারণ ‘সাধ্যাভাব’ বলতে বোঝায় সাধ্য প্রতিযোগিক অভাবকে। এই অভাব যেমন সকল সাধ্যাভাবের মধ্যে বর্তমান বহ্ন্যভাব হতে পারে তেমনিই তৎ তৎ হ্রদাদি ইত্যাদি প্রকার বর্তমান যেসব অভাব সেগুলিও হতে পারে। কিন্তু এই প্রকারে যে সাধ্যরূপ বহ্নির অভাব তাদের সমুদায় অধিকরণ অপ্রসিদ্ধ হয়। ফলে লক্ষণটির ক্ষেত্রে অসম্ভব দোষ হয়ে যায় এবং ‘বহ্নিমান্ ধূমাৎ’ স্থলে সেটির প্রয়োগ ব্যর্থ হয়।

এই লক্ষণ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আরও একটি বিষয়ে ধ্যান দিতে বলেছেন টীকাকার মথুরানাথ। তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে ‘সকলসাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিত্ব’ এই লক্ষণে প্রতিযোগিত্ব বলতে হেতুতাবচ্ছেদক ধর্মের অভিন্নত্বকে বুঝতে হবে। যদি লক্ষণস্থ প্রতিযোগিত্বের এইরূপ অর্থ করা না হয় তাহলে ‘দ্রব্যং সত্ত্বাৎ’ প্রভৃতি অসদ্ধেতুক স্থলে ব্যাপ্তির লক্ষণের সমন্বয় হয়ে যায়।

এখানে প্রথমেই বলা দরকার যে সত্তার যাবতীয় অধিকরণে সাধ্য দ্রব্যত্ব থাকে না। যেমন সত্তাধিকরণ গুণ, কর্মে দ্রব্যত্ব না থাকায় সত্তা হেতুটি অসৎ। তা সত্ত্বেও লক্ষণস্থ প্রতিযোগিত্বটি যদি উল্লিখিত অর্থে ধরা না হয় তাহলে ওই অসদ্ধেতুতে অতিব্যাপ্তি অনিবার্য হবে। কেননা আলোচ্য ক্ষেত্রে দ্রব্যত্ব হল সাধ্য। তাই সাধ্যাভাবের অর্থাৎ দ্রব্যত্বাভাবের অধিকরণ হল গুণকর্মাদি। এই গুণকর্মাদিতে বিশিষ্টসত্তার অর্থাৎ গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তার

অভাব থাকে। ফলে গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাভাবের প্রতিযোগিতা যেমন বিশিষ্টসত্তাতে অর্থাৎ গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তাতে থাকে তেমনই শুদ্ধসত্তাতেও থাকে। কারণ নিয়ম হল "বিশিষ্টশুদ্ধাৎ নাতিরুচ্যতে"। আলোচ্য স্থলে শুদ্ধসত্তা হেতু হওয়ায় আর বিশিষ্টসত্তা ও শুদ্ধসত্তা এক হওয়ার কারণে সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাবের প্রতিযোগিত্ব বিশিষ্টসত্তায় থাকায় তা শুদ্ধসত্তাতেও থাকবে একথা স্বীকার করতে হয়। এরফলে 'সাধ্যাভাবাধিকরণ' অর্থাৎ দ্রব্যত্বাভাবাধিকরণ গুণকর্মাদিনিষ্ঠবিশিষ্টসত্তাভাবীয় প্রতিযোগিত্ব হেতু সত্তাতে থেকে যায় বলে লক্ষণ অসদ্ধেতুতে সমন্বয় হয়ে যায় ও অতিব্যাপ্তি দোষ দেখা দেয়।

কিন্তু যদি মথুরানাথ নির্দেশিত অর্থে লক্ষণটিকে গ্রহণ করা হয় তাহলে আর এই সমস্যা হয় না। কারণ 'দ্রব্যং সত্ত্বাৎ' এই স্থলে সাধ্যাভাবাধিকরণ গুণকর্মাদিতে বিশিষ্টসত্তার অভাব বিদ্যমান থাকার কারণে এই অভাবীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয় গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টত্ব ও সত্তাত্ব এই দুটি ধর্মই বিশিষ্টসত্তাত্ব রূপে বিদ্যমান থাকার কারণে আর ওই স্থলে সত্তা হেতু হওয়ার কারণে হেতুতাবচ্ছেদক হয় সত্তাত্বরূপ একটি ধর্ম। এর ফলে এই স্থলে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক ও হেতুতাবচ্ছেদক ভিন্ন হয়ে পড়ে কিন্তু উভয়ের একত্ব প্রতিপাদনই যেহেতু চতুর্থ লক্ষণের লক্ষ্য আর এই কারণেই সাধ্যাভাবের অধিকরণনিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক বিশিষ্টসত্তাত্ব হওয়ার কারণে ওইরূপ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব হেতুতাবচ্ছেদক না হওয়ার কারণে অসদ্ধেতুতে লক্ষণ সমন্বয় হয় না, ফলে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কাও দূরীভূত হয়।

এই লক্ষণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন মথুরানাথ তিনি বলেছেন "প্রতিযোগিতা চ হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্না গ্রাহ্যা"।[১৩] বক্তব্য এই লক্ষণস্থ প্রতিযোগিতাটিকে হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে ধরতে হবে। আর যদি প্রতিযোগিতাকে হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে না ধরে অন্য সম্বন্ধে ধরা হয় তাহলে লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ দেখা দেবে। যেমন 'দ্রব্যং সত্ত্বাৎ' এটি একটি অসদ্ধেতুক অনুমিতিস্থল। এস্থলে সাধ্য হল দ্রব্যত্ব এবং হেতু হল সত্তা। সত্তা হেতুটি দ্রব্য, গুণ ও কর্মে সমবায় সম্বন্ধে থাকে। তাই এখানে হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হল সমবায়। এখন যদি 'সকলসাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাব' বলতে সংযোগ সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক সত্তাভাবকে গ্রহণ করা হয়, তাহলে সাধ্যাভাবাধিকরণ গুণাদিতে সত্তা সংযোগসম্বন্ধে না থাকার কারণে অর্থাৎ সাধ্যাভাবাধিকরণ গুণাদিতে সংযোগসম্বন্ধে সত্তার অভাব থাকায় ওই অভাবীয় প্রতিযোগিতাটি সত্তা হেতুতে থেকে যাওয়ার কারণে অসদ্ধেতুতে লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যাবে ফলে অতিব্যাপ্তি দোষও দেখা দেয়। কিন্তু অভাবীয়প্রতিযোগিতাটিকে যদি হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্নত্ব রূপে গ্রহণ করা হয় তাহলে আর ওই অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। কারণ, এই স্থলে হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ হল সমবায়। এই সমবায় সম্বন্ধে সাধ্যাভাবাধিকরণ গুণাদিতে সত্তার অভাব থাকে না যেহেতু গুণে সমবায় সম্বন্ধে সত্তা থাকে। তাই সাধ্যাভাবাধিকরণনিষ্ঠ অর্থাৎ গুণাদিনিষ্ঠ অভাবীয় প্রতিযোগিতা সত্তা হেতুতে থাকার সম্ভাবনা আর থাকে না। ফলে অসদ্ধেতুতে লক্ষণসমন্বয় না হওয়ায় আর অতিব্যাপ্তি প্রসঙ্গ হয় না। কাজেই সাধ্যাভাবাধিকরণনিষ্ঠ যে অভাব, সেই

[১৩] তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৪।

অভাবের প্রতিযোগিতাকে হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন রূপেই গ্রহণ করতে হবে, তা না হলে অতিব্যাপ্তিদোষ দুর্নিবার হয়ে পড়ে।

এরপর মথুরানাথ লক্ষণঘটক 'সাধ্যাভাব'টি কোন সম্বন্ধ ও কোন ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হবে তা দেখানোর চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর মন্তব্য- "সাধ্যাভাবশ্চ সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকো বোধ্যঃ"[১৪] অর্থাৎ 'সাধ্যাভাব'টিকে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাবরূপে গ্রহণ করতে হবে। তা না হলে অসম্ভবদোষ দেখা দেবে। সাধ্যাভাবকে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধ ও ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবরূপে গ্রহণ না করলে 'পর্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এই প্রসিদ্ধ সদ্ধেতুক অনুমিতিস্থলে লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ার কারণে অব্যাপ্তি দোষ তথা অসম্ভব দোষ অনিবার্য হয়ে পড়বে। কারণ উক্ত অনুমানে হেতু হল ধূম। আর পর্বতে বহ্নি থাকলেও যে কোন বহ্নি থাকে না, কারণ পর্বতে পর্বতীয় বহ্নি থাকলেও গোষ্ঠীয় বহ্নির অভাব, গোষ্ঠে গোষ্ঠীয় বহ্নি থাকলেও মহানসীয় বহ্নির অভাব, চত্বরে চত্বরীয় বহ্নি থাকলেও মহানসীয় বহ্নির অভাব থাকে। এইভাবে বহ্নি প্রভৃতির বিশিষ্টাভাব ধরে প্রতিটি বহ্নির অধিকরণে অন্য বহ্নির অভাব থাকায়, আবার পর্বতে বহ্নি থাকলেও বহ্নি ও জল এই উভয়ের অভাব থাকায় যাবৎ বহ্নির অধিকরণই বহ্ন্যভাবের অধিকরণ হয়ে পড়ে। আর ওই সাধ্যাভাবাধিকরণ পর্বতাদিতে ধুমের অভাব না থাকায় সকল সাধ্যাভাববৎনিষ্ঠ অভাবের ধূম আর প্রতিযোগী হয় না। এভাবে অব্যাপ্তি দোষ দেখা দেয়। আর এইভাবে অব্যাপ্তি যেহেতু

[১৪] তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৪।

সকল স্থলেই দেখানো যায়, তাই কোনো সদ্ধেতুতে লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ায় অসম্ভব দোষের সৃষ্টি হয়।

কিন্তু লক্ষণস্থ সাধ্যাভাবটিকে যদি সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবরূপে গ্রহণ করা হয় তাহলে আর পূর্বোক্ত ওই দোষের সম্ভাবনা থাকে না। কারণ সেক্ষেত্রে বহ্নি সাধ্য হওয়ায় সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্ম হয় বহ্নিত্ব, আর সাধ্যাভাব বলতে সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্মাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবকেই কেবল গ্রহণ করা যায়; তৎ তৎ বহ্নির অভাব হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। ফলে পূর্বের মতো পর্বতাদিতে মহানসীয় বহ্নির অভাব, কিংবা বহ্নি-জল উভয়ের অভাব প্রভৃতিকে আর গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। কারণ এইসব অভাব যথাক্রমে মহানসীয় বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন ও বহ্নিজল উভয়ত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব হয়। কোন অভাবই কেবল বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব নয়। এমতাবস্থায় পর্বতাদিকে আর সাধ্যাভাবাধিকরণরূপে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে জলহ্রদাদিকে বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন বহ্নির অভাবের অধিকরণ ধরতে হয়। আর ওই জলহ্রদাদিতে হেতু ধূমের অভাব থাকায় অভাবীয় প্রতিযোগিত্বই ধূমে সিদ্ধ হয়। কাজে কাজেই অসম্ভব দোষের যে আশঙ্কা তাও দূর হয়।

সাধ্যতাবচ্ছেদকধর্মের পাশাপাশি সাধ্যাভাবটিকে সাধ্যতাবচ্ছেদকসম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন করাও একান্ত আবশ্যক। কারণ সাধ্যাভাবটিকে যদি যেকোনো সম্বন্ধের দ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রতিযোগীর অভাব হিসাবে ধরা হয় তাহলে বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন বহ্নির সমবায় সম্বন্ধে অভাবও ‘সাধ্যাভাব’ পদবাচ্য হবে। সেই সাধ্যাভাবের অধিকরণ চত্বর, গোষ্ঠ, মহানস ইত্যাদিতে ধূম বর্তমান থাকায় হেতু আর সাধ্যাভাবাধিকরণনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগী হবে না। ফলে সদ্ধেতুতে

লক্ষণটির প্রয়োগ ব্যর্থ হয়। কিন্তু সাধ্যতাবচ্ছেদক সংযোগসম্বন্ধে যদি বহ্নির অভাবকে সাধ্যাভাব ধরা হয় তাহলে মহানসাদি আর ওই অভাবের অধিকরণ হতে পারে না; ওই অধিকরণ হয় জলাশয়াদি, যাতে বর্তমান অভাবের প্রতিযোগিত্বই ধূমে সিদ্ধ।

একইভাবে সাধ্যাভাবের অধিকরণতাকে নিরবচ্ছিন্ন বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করাও আবশ্যক। কারণ এই অধিকরণতাকে নিরবচ্ছিন্ন হিসাবে না ধরলে 'কপিসংযোগি এতদ্বৃক্ষত্বাৎ' এই অনুমিতি স্থলে পুনরায় লক্ষণের অব্যাপ্তি প্রসঙ্গ দেখা দেয়। স্মরণে রাখা দরকার যে বৃক্ষের শাখাবচ্ছেদে কপিসংযোগের অধিকরণতা সিদ্ধ। সেই বৃক্ষের মূলাবচ্ছেদে ওই অধিকরণতা অসিদ্ধ। ফলে কপিসংযোগ যেখানে সাধ্য সেখানে মূলাবচ্ছিন্ন বৃক্ষ কপিসংযোগের অভাবের অধিকরণও হতে কোনো বাধা থাকে না। ওই বৃক্ষে এতদ্বৃক্ষত্ব থাকায় হেতুটি যাবৎ সাধ্যবৎ নিষ্ঠ অভাবের অপ্রতিযোগী হয়ে পড়ে। অথচ যাবৎ সাধ্যবৎনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিত্বই ব্যাপ্তি। এইরূপে যে অব্যাপ্তি দেখা দেয় সাধ্যাভাবের অধিকরণতাটিকে নিরবচ্ছিন্ন হিসাবে গণ্য করলে তা থাকে না। কারণ সেক্ষেত্রে কপিসংযোগের অভাব বলতে আর শাখাবচ্ছিন্ন কপিসংযোগের অভাবকে ধরা যায় না। বরং অনবচ্ছিন্ন কপিসংযোগের অভাবকে ধরতে হয়। ওই অভাবের অধিকরণ এতদ্বৃক্ষ ভিন্ন যে সকল পদার্থ হয় সেগুলিতে এতদ্বৃক্ষত্ব না থাকায় হেতুতে সকল সাধ্যাভাববৎনিষ্ঠ অভাবের প্রতিযোগিত্বই সিদ্ধ হয়।

তবে এইরূপে 'কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ' অনুমিতির স্থলটিতে অব্যাপ্তির আশঙ্কা ও তার নিরাকরণ নিরর্থক বলেই মথুরানাথ মনে করেন। কেননা চূড়ান্ত পর্যায়ে গঙ্গেশ একথা প্রমাণ করেছেন যে 'কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ' একটি কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতি স্থল এবং

ওইরূপ কেবলান্বয়ীসাধ্যক যোকোনো অনুমিতির ক্ষেত্রে অব্যভিচরিতত্ব পদপ্রতিপাদ্য পঞ্চ লক্ষণেরই অব্যাপ্তি দোষ হয়।

৪.১.৫ সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বম্ লক্ষণ ব্যাখ্যা

৪.১.৫.১ লক্ষণার্থ নিরূপণ

'সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বম্' এটি হল 'অব্যভিচরিতত্ব' পদপ্রতিপাদ্য ব্যাপ্তির পঞ্চম লক্ষণ। বক্তব্য এই সাধ্যবৎ হতে অন্য বা ভিন্ন হল সাধ্যবদন্য। এই সাধ্যবদন্য দ্বারা নিরূপিত বৃত্তিত্ব হেতুতে না থাকায় ব্যাপ্তি। এই লক্ষণের সঙ্গে 'সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্' লক্ষণটির খুব একটা তফাৎ নেই কারণ 'সাধ্যবদন্য' ও 'সাধ্যাভাববৎ' কার্যত একই। তফাৎ শুধু এখানে যে প্রথম লক্ষণে যেখানে সাধ্যের অভাবের অধিকরণের কথা বলা হয়েছে সেখানে অন্তিম লক্ষণে সাধ্যবৎ অন্য বা সাধ্যবৎ প্রতিযোগিতাক ভেদবৎ-এর কথা বলা হয়েছে।

এখন লক্ষণটি একটি সদ্ধেতুক ও একটি অসদ্ধেতুক অনুমিতি স্থলে প্রয়োগ করে দেখা যাক। 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এই প্রসিদ্ধ সদ্ধেতুক অনুমিতি স্থলে বহ্নি সাধ্য হওয়ায় বহ্নিমৎ পর্বতাদি হল সাধ্যবৎ। সেই সাধ্যবৎ অন্য বা ভিন্ন হল জলাশয়াদি। সেই জলাশয়াদি নিরূপিত বৃত্তিত্ব হেতু ধূমে থাকে না। ফলে সাধ্যবদন্য নিরূপিত অবৃত্তিত্বই হেতুতে পাওয়া যায়। এইভাবে যেমন অব্যাপ্তির আশঙ্কা দূর হয় তেমনই বিবেচনা করলে দেখা যাবে 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' স্থলে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কাও এই লক্ষণে থাকে না। কারণ ধূম যেখানে সাধ্য সেখানে সাধ্যবৎ হল পর্বতাদি সেই সকল পদার্থ যেখানে ধূম থাকে। পক্ষান্তরে ওই ধূমাধিকরণ সমূহ হতে ভিন্ন যে অয়োগোলক তা হয় সাধ্যবদন্য। ওই অয়োগোলক হেতু বহ্নি উপস্থিত থাকায়

সাধ্যবদন্য নিরূপিত বৃত্তিত্বই হেতুতে থাকে অথচ সাধ্যবদন্য নিরূপিত অবৃত্তিত্বই হল ব্যাপ্তি। ফলে ব্যাপ্তির লক্ষণটি অসৎ হেতুতে অতিপ্রসঙ্গ হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই থাকে না।

৪.১.৫.২ লক্ষণ ঘটক পদসমূহের পারিভাষিক অর্থ নিরূপণ

তবে আলোচ্য লক্ষণে 'সাধ্যবদন্য' এবং 'অবৃত্তিত্ব' পদগুলির অর্থ নিরূপণের সময় প্রথম লক্ষণের ন্যায় সুনির্দিষ্ট অর্থকেই গ্রহণ করতে হবে। প্রথমে 'অবৃত্তিত্ব' পদটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথম লক্ষণ ব্যাখ্যার সময় এটি স্পষ্ট হয়েছে যে এই অবৃত্তিত্ব বা বৃত্তিত্বের যেকোনো সম্বন্ধ বা ধর্ম-পুরস্কারে যেকোনো বৃত্তিত্বের অভাব নয় বরং হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ পুরস্কারে বৃত্তিত্ব সামান্যের অভাব। হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধকে বিচারে না রাখলে 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' স্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে। কারণ এখানে সাধ্যবদন্য যেমন জলাশয় হয় তেমনই ধূমাবয়বও হয়। সেই ধূমাবয়বে সমবায় সম্বন্ধে ধূম বর্তমান থাকে। ফলে সাধ্যবদন্য ধূমাবয়ব নিরূপিত বৃত্তিত্বই হেতু ধূমে পাওয়া যায়। কিন্তু সাধ্যবদন্য নিরূপিত বৃত্তিত্বটিকে হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে ধরলে ওই বৃত্তিত্ব আর হেতুতে পাওয়া যাবে না। কারণ 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' স্থলে ধূম সংযোগসম্বন্ধে হেতু হওয়ায় হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হয় সংযোগ। ওই সংযোগসম্বন্ধে ধূম ধূমাবয়বে না থাকায় সাধ্যবদন্য নিরূপিত অবৃত্তিত্বই হেতুতে পাওয়া যায়।

একইভাবে ওই বৃত্তিত্বাভাবটিকে হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে গ্রহণ করেও যদি বৃত্তিত্ব সামান্যের অভাব হিসেবে ধরা না হয় তাহলে ওই বৃত্তিত্ব ও তদ্ভিন্ন কোনো উভয়ের অভাবকে বৃত্তিতাভাব পদে ধরা যেতে পারে। দুটি ক্ষেত্রেই লক্ষণটির অতিব্যাপ্তি দোষ হবে। কারণ 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' স্থলে সাধ্যবদন্য হিসাবে যদি জলাশয়কে ধরা হয় তাহলে সেই জলাশয় নিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাবই বহ্নি হেতুতে পাওয়া যায়। অথচ বৃত্তিত্বাভাব বলতে যদি বৃত্তিত্বার

সামান্যভাবকে ধরা হয় তাহলে সাধ্যবদন্য নিরূপিত যতগুলি বৃত্তিত্ব আছে ততগুলি বৃত্তিত্বের অভাব হেতুতে থাকবে। ফলে জলাশয় নিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাব হেতুতে থাকবে। সেক্ষেত্রে জলাশয় নিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাব বহ্নি হেতুতে পাওয়া গেলেও সাধ্যবদন্য অয়োগোলক নিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাব হেতুতে না থাকায় অসদ্ধেতুতে লক্ষণ সমন্বয়ের আশঙ্কা থাকে না।

বৃত্তিত্বাভাব পদে বৃত্তিত্বের সামান্যভাবকে না ধরলে যেমন বৃত্তিত্ব বিশেষের অভাব (যেমন- জলাশয় নিরূপিত বৃত্তত্বের অভাব) বহ্নিতে পাওয়া যেতে পারে তেমনই সাধ্যবদন্য নিরূপিত বৃত্তিত্ব ও জলত্ব এই উভয়ের অভাবও হেতু বহ্নিতে পাওয়া যায়। অথচ বৃত্তিত্বাভাবটি বৃত্তিত্ব সামান্যের অভাব হিসাবে ধরলে কোনোভাবেই অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। কারণ সেক্ষেত্রে বৃত্তিত্ব বিশেষ কিংবা বৃত্তিত্ব ও তদতিরিক্ত জলত্ব উভয় নিরূপিত বৃত্তত্বের অভাবকে আর ধরা যাবে না।

একইভাবে সাধ্যবদন্য পদটিকেও পারিভাষিক অর্থে গ্রহণ করতে হবে। এর দ্বারা যেমন কিঞ্চিৎ সাধ্যবদ্ভিন্ন বোধিত হতে পারে তেমনিই সকল সাধ্যবদ্ভিন্নও বোধিত হতে পারে। যদি সাধ্যবদন্য পদে কিঞ্চিৎ সাধ্যবদ্ভিন্ন ধরা হয় তাহলে 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' স্থলে অব্যাপ্তি হয়। কারণ সাধ্য বহ্নির অধিকরণ অনেকগুলি হতে পারে। যদি মহানসকে ওই অধিকরণ হিসাবে ধরা হয় তাহলে মহানস ভিন্ন পর্বতাদি হবে সাধ্যবদন্য। সেই সাধ্যবদন্য পর্বতে হেতু ধূম থাকায় সাধ্যবদন্য নিরূপিত বৃত্তিত্বই হেতুতে পাওয়া যাবে। এই কারণেই মথুরানাথ বলেছেন– "সাধ্যবদন্যত্বঞ্চ অন্যোন্যাভাবত্বনিরূপিতসাধ্যবত্ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাববত্ত্বম্"[১৫] অর্থাৎ সাধ্যবদন্য হবে সাধ্যবত্তাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক ভেদবান। অন্য ভাষায় যতগুলি সাধ্য রয়েছে

[১৫] তদেব, পৃষ্ঠা-৪৬।

ততগুলি সাধ্যবতের ভেদবিশিষ্ট। বহ্নি যেখানে সাধ্য সেখানে সাধ্যবৎ হবে বহ্নির সকল অধিকরণ যার মধ্যে পর্বত, চত্বর, গোষ্ঠ, মহানস ইত্যাদি পড়ে। ওই সকল সাধ্যবৎ এর ভেদ বিশিষ্ট হয় জলাশয়াদি। ওই অধিকরণে ধূম না থাকায় সাধ্যবদন্য নিরূপিত অবৃত্তিত্বই হেতুতে পাওয়া যাবে।

৪.২ পঞ্চ লক্ষণে দোষ প্রদর্শন

এপর্যন্ত 'অব্যভিচরিতত্ব' পদপ্রতিপাদ্য ব্যাপ্তির পাঁচটি লক্ষণ ব্যাখ্যাত হয়েছে। যদিও প্রতিটি লক্ষণই পরিশেষে পরিত্যাজ্য বলে বিবেচিত হবে, তথাপি এই লক্ষণ পঞ্চের কিছু বিশেষত্ব আছে, যা উল্লেখের দাবি রাখে। 'সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্' লক্ষণটির বিরুদ্ধে সচরাচর যে আপত্তি উত্থাপন করা যায় দ্বিতীয় লক্ষণটি গ্রহণ করলে সেই আপত্তি থেকে মুক্ত হওয়া যায়। একইভাবে দ্বিতীয় লক্ষণের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য আপত্তি নিরাকৃত হয় তৃতীয় লক্ষণে। আবার তৃতীয় লক্ষণের সমস্যার সমাধান পাওয়া যায় চতুর্থ লক্ষণে। আর চতুর্থ লক্ষণের বিরুদ্ধে যে আপত্তি তোলা যায় পঞ্চম লক্ষণ গ্রহণ করলে সে আপত্তি আর থাকে না। একে একে কীভাবে উত্তরোত্তর লক্ষণগুলি পূর্ব পূর্ব লক্ষণের দোষ থেকে মুক্ত তা বিচার করে দেখা যাক।

প্রথম লক্ষণটি আপাত দৃষ্টিতে সঠিক বলে মনে হলেও তা কিন্তু সঠিক নয় কারণ এমন অনেক স্থল আছে যেখানে ব্যাপ্তির প্রথম লক্ষণটির সমন্বয় ঘটে না। যেমন- 'কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ' এই অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যক অনুমিতির স্থলে প্রথম লক্ষণটির সমন্বয় ঘটে না তাই দ্বিতীয় লক্ষণটির অবতারণা করা হয়েছে। দ্বিতীয় লক্ষণ অনুসারে "সাধ্যবদ্ভিন্ন সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্" অর্থাৎ যা সাধ্যবিশিষ্ট হতে ভিন্ন, তাতে থাকে যে সাধ্যাভাব, সেই

সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বার অভাব হেতুতে থাকাই হল ব্যাপ্তি একথা মানলে আর ওই অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যক অনুমিতির স্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না।

দ্বিতীয় লক্ষণটি পূর্বোক্ত ওই অব্যাপ্তির আশঙ্কা থেকে মুক্ত হলেও তা কিন্তু সর্বপ্রকার অব্যাপ্তির আশঙ্কা থেকে মুক্ত নয়। কারণ দ্বিতীয় লক্ষণে এমন একটি নিয়ম স্বীকার করা হয় যা কিন্তু সর্ববাদিসম্মত নয়। সেই নিয়মটি হল অধিকরণ ভেদে অভাব ভিন্ন ভিন্ন। এই নিয়মটি যদি দ্বিতীয় লক্ষণে না মানা হত তাহলে 'কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ' এই অনুমিতির স্থলে প্রথম লক্ষণের মতো দ্বিতীয় লক্ষণেও অব্যাপ্তি ঘটত। কিন্তু যারা ওই নিয়মটি স্বীকার করেন না তাদের জন্যই তৃতীয় লক্ষণটির অবতারণা। তৃতীয় লক্ষণ অনুসারে "সাধ্যবৎ প্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্যম্" অর্থাৎ সাধ্যবৎ অর্থাৎ সাধ্যবিশিষ্ট হয়েছে প্রতিযোগী যার এমন যে অন্যোন্যাভাব তার আসামানাধিকরণ্য অর্থাৎ ওই অন্যোন্যাভাবের অধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিতার অভাব হেতুতে থাকাই ব্যাপ্তি স্বীকার করে নিলে অধিকরণ ভেদে অভাব ভিন্ন ভিন্ন এই নিয়ম স্বীকার না করেও 'কপিসংযোগী এতদ্বৃক্ষত্বাৎ' অনুমিতির স্থলে আর অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না।

তবে তৃতীয় লক্ষণটিও পুরোপুরি দোষ মুক্ত নয়। কারণ মথুরানাথ দেখিয়েছেন যে এমন অনেক স্থল আছে যেখানে তৃতীয় লক্ষণটির সমন্বয় ঘটে না। যেখানে সাধ্যের অধিকরণ বহু হয় সেখানে তৃতীয় লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ দেখা দেয়। যেমন, 'বহ্নিমান ধূমাৎ' এই প্রসিদ্ধ সদ্ধেতুক স্থলেই তৃতীয় লক্ষণটির অব্যাপ্তি হয়। আর এই অব্যাপ্তি বারণের জন্যই ব্যাপ্তির চতুর্থ লক্ষণের অবতারণা। চতুর্থ লক্ষণে বলা হয়েছে, "সকল সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিত্বম্" অর্থাৎ কিনা সাধ্যাভাবের যে যাবৎ অধিকরণ, সেই

অধিকরণ নিরূপিত অভাবের প্রতিযোগিতা হেতুতে থাকাই ব্যাপ্তি। চতুর্থ লক্ষণের এই যদি অর্থ হয় তাহলে আর 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' অনুমিতির স্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না।

কিন্তু চতুর্থ লক্ষণটিরও সব স্থলে সমন্বয় হয় না, কারণ চতুর্থ লক্ষণে সকল অধিকরণের কথা বলা হয়েছে কিন্তু যেসব স্থলে সাধ্যাভাবের অধিকরণ বহু নয়, সেসব স্থলে অধিকরণের সাকল্য অপ্রসিদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা পুনরায় থেকে যায়। আর এই অব্যাপ্তি নিরসনের জন্যই ব্যাপ্তির পঞ্চম লক্ষণের অবতারণা। সেখানে বলা হয়েছে, "সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বম্" অর্থাৎ সাধ্যবিশিষ্ট হতে যা ভিন্ন, তন্নিরূপিত অবৃত্তিত্ব বা বৃত্তিতার অভাব হেতুতে থাকাই ব্যাপ্তি। এই মাত্র ব্যাপ্তির লক্ষণ বললে তা পূর্বোক্ত ওই অব্যাপ্তির আশঙ্কা থেকে মুক্ত হয়।

এইভাবে মথুরানাথ ব্যাপ্তির পঞ্চলক্ষণের প্রতিটিকেই বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে কিছু নতুন নতুন পদ যোজনার ফলে লক্ষণে আশঙ্কিত অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি দোষ পরিহার করা সম্ভব হয়। আর এভাবে তিনি প্রতিটি লক্ষণের আশঙ্কিত দোষ নিবারণের লক্ষ্যে অপর একটি লক্ষণের অবতারণা করেছেন। শেষ পরিণতিতে তিনি পঞ্চম লক্ষণে উপনীত হয়েছেন, যদিও পঞ্চম লক্ষণটি পূর্ব পূর্ব সকল প্রকার দোষ থেকে মুক্ত। তথাপি সেটি যে ব্যাপ্তির স্বার্থক লক্ষণ হতে পারে না তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন গঙ্গেশ উপাধ্যায়। কেন এই পঞ্চম লক্ষণ তথা পূর্ব পূর্ব লক্ষণগুলি ব্যাপ্তির সার্থক লক্ষণ নয় তা ব্যক্ত করতে গিয়ে মণিকার বলেছেন–"...ন তাবদব্যভিচরিতত্বং ...কেবলান্বয়িন্যভাবাৎ"।[১৬]

[১৬] তদেব, পৃষ্ঠা- ২৭।

'কেবলান্বয়িন্যভাবাৎ' এই সংক্ষিপ্ত সন্দর্ভের দ্বারা মণিকার যে কথা ইঙ্গিত করেছেন তা এই যে, যেহেতু কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতির ক্ষেত্রে প্রতিটি লক্ষণেরই সমন্বয়ের অভাব হয় সেহেতু এদের কোনটিই অদুষ্ট লক্ষণ হতে পারে না। মণিকারের বিবক্ষা উপলব্ধি করতে হলে প্রথমে দেখা দরকার কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতি বলতে কি বোঝায়? যে অনুমানের সাধ্যটি কেবলান্বয়ী সেই অনুমিতিই হল কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতি। এখন প্রশ্ন হল কখন একটি সাধ্যকে কেবলান্বয়ী বলা যায়? কেবলান্বয়ী কথার অর্থ কেবল অন্বয় বিশিষ্ট। কোনো একটি বিষয় যদি এমন হয় যে নিখিল জাগতিক পদার্থে তার অন্বয় বা উপস্থিতি রয়েছে – কোথাও তার অভাব নাই – তাহলে তাকে কেবলান্বয়ী বলে চিহ্নিত করা যায়। কেবলান্বয়ীর লক্ষণ নিরূপণ করতে গিয়ে বলা হয়েছে – "বৃত্তিমদত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিত্বম্"[১৭] অর্থাৎ বৃত্তিমান্ বা বৃত্তি নিয়ামক সম্বন্ধে বর্তমান যে অত্যন্তাভাব তার প্রতিযোগী হতে পারে না এমন যে বস্তু তাই কেবলান্বয়ী। যেমন – জ্ঞেয়ত্ব হল নিখিল পদার্থের ধর্ম, যার অভাব জাগতিক কোনো পদার্থে নেই। যেহেতু এটির অভাব কোথাও থাকে না, তাই এটি কোনো অভাবের প্রতিযোগী হতে পারে না। তাই অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী জ্ঞেয়ত্বকে বলা হয় কেবলান্বয়ী। একইভাবে বাচ্যত্ব, প্রমেয়ত্ব ইত্যাদি হল কেবলান্বয়ী। যে অনুমানের সাধ্যটি জ্ঞেয়ত্ব বাচ্যত্বের ন্যায় অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী হয় তা কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতি হিসেবেই গণ্য হয়। যেমন– 'ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ' এই অনুমানের সাধ্য বাচ্যত্ব কেবলান্বয়ী ধর্ম হওয়ায় এটি কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতি হিসেবে গণ্য।

[১৭] শ্রী মোহন ভট্টাচার্য এবং দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য শাস্ত্রী, ভারতীয় দর্শন কোষ, ১৯৭৮, পৃষ্ঠা- ৫৯।

এবারে দেখা যাক এইরূপ কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতির ক্ষেত্রে কীভাবে 'অব্যভিচরিতত্ব' পদপ্রতিপাদ্য লক্ষণগুলির অব্যাপ্তি দোষ দেখা দেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে মথুরানাথ ব্যাপ্তির পাঁচটি লক্ষণের ক্ষেত্রে একই ধরণের আপত্তি তোলেননি। তিনি কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতিকে দুইভাগে ভাগ করেছেন– ব্যাপ্যবৃত্তি কেবলান্বয়ীসাধ্যক ও অব্যাপ্যবৃত্তি কেবলান্বয়ীসাধ্যক। 'ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ' এ হল ব্যাপ্যবৃত্তি সাধ্যক অনুমিতি। পক্ষান্তরে 'কপিসংযোগাভাববান্ সত্ত্বাৎ' এ হল অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যক অনুমিতি। প্রথম ক্ষেত্রে অর্থাৎ 'ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ' এর ক্ষেত্রে পাঁচটি লক্ষণই অসঙ্গত হয়। অন্যদিকে 'কপিসংযোগাভাববান্ সত্ত্বাৎ' এরূপ অব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যক অনুমিতির ক্ষেত্রে প্রথম লক্ষণটি ব্যতীত অপরাপর লক্ষণগুলির প্রয়োগ ব্যর্থ হয়।

ব্যাপ্যবৃত্তিসাধ্যক কেবলান্বয়ী অনুমিতির ক্ষেত্রে পাঁচটি লক্ষণ কীভাবে ব্যর্থ হয় তার ব্যাখ্যা দেওয়া যাক। "সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্" এই লক্ষণটির ঘটক হল 'সাধ্যাভাববদ্' বা 'সাধ্যাভাবাধিকরণ'। এই অধিকরণ অলোচ্য ক্ষেত্রে অপ্রসিদ্ধ। কারণ বাচ্যত্ব যেহেতু কেবলান্বয়ী তাই তার অভাবের অধিকরণ সিদ্ধ নয়। "সাধ্যবদ্ভিন্নসাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্" লক্ষণটি একই কারণে অযুক্ত। এখানে সাধ্যাভাববৎ- এর পাশাপাশি সাধ্যবদ্ভিন্ন এক অর্থে অপ্রসিদ্ধ; যেখানে সবকিছুই বাচ্যত্ববৎ সেখানে বাচ্যত্ববদ্ভিন্ন কোনোকিছুই থাকে না। একই কারণে তৃতীয় লক্ষণটি অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয়। কারণ সাধ্যবৎ প্রতিযোগিক অন্যোন্যাভাব কোথাও সিদ্ধ নয়। একইভাবে সকল সাধ্যাভাববন্নিষ্ঠ অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগিত্ব সিদ্ধ নয়। কারণ সাধ্যাভাবের অধিকরণ না থাকায় সকল সাধ্যাভাববৎ এর অধিকরণে বর্তমান অভাবের অপ্রতিযোগিতা অসিদ্ধ। আর সাধ্যবদন্য বলে কিছু না থাকায় বা বাচ্যত্ববৎ ভিন্ন বলে কিছু না

থাকায় তা দ্বারা নিরূপিত অবৃত্তিত্ব হেতুতে থাকতে পারে না। তাই পঞ্চম লক্ষণটিও কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে ব্যর্থ হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্যাপ্তির সিংহ-ব্যাঘ্র লক্ষণদ্বয় ও তদ্‌বিষয়ে গঙ্গেশের আপত্তি ব্যাখ্যা

তত্ত্বচিন্তামণিকার গঙ্গেশ উপাধ্যায় 'অব্যভিচরিতত্ব' পদপ্রতিপাদ্য ব্যাপ্তির পঞ্চ লক্ষণের কোনোটিই যে প্রকৃত লক্ষণ হতে পারে না তা দেখানোর পর দার্শনিক সমাজে প্রচলিত 'সিংহ-ব্যাঘ্র' লক্ষণদ্বয়ের উল্লেখপূর্বক তা খণ্ডনে প্রয়াসী হয়েছেন। আলোচ্য অধ্যায়ে ব্যাপ্তির সেই লক্ষণদ্বয় যেমন ব্যাখ্যাত হবে তেমনই ওই লক্ষণদ্বয় সম্বন্ধে গঙ্গেশের বিচারও উপস্থাপিত হবে।

৫.১ সিংহ ও ব্যাঘ্রের পরিচয়

'সিংহ-ব্যাঘ্র' লক্ষণ নামে পরিচিত এই দ্বিবিধ লক্ষণ হল- "সাধ্যাসামানাধিকরণ্যানধিকরণত্বম্"[১] ও "সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যানধিকরণত্বম্"[২]। এই লক্ষণদ্বয়ের প্রণেতা ঠিক কারা অর্থাৎ সিংহ ও ব্যাঘ্র নামের অন্তরালে ঠিক কোন কোন তার্কিক রয়েছেন সে বিষয়ে কোনো সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমস্যার বিষয়। এবিষয়ে সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের ব্যাখ্যা এই যে আনন্দসূরী[৩] ও অমরচন্দ্রসূরী[৪] দুই জৈন নৈয়ায়িক বা তার্কিকই যথাক্রমে 'সিংহ' ও 'ব্যাঘ্র' নামে বোধিত হয়েছেন। এই সম্বন্ধে দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর দাবি এই লক্ষণদ্বয় কোন জৈন নৈয়ায়িকের নয়। কারণ আনন্দ ও অমরচন্দ্র উভয়েই পশ্চিম ভারত-

---

[১] শ্রী কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, *তত্ত্বচিন্তামণি*, ২০১০, পৃষ্ঠা-৪৯।

[২] তদেব।

[৩] Mahamahopādhyāya Satis Chandra Vidyābhusan, *A History of Indian Logic*, 2023, Page-396.

[৪] Ibid.

দেশীয়। আর তৎকালীন সময়ে মিথিলায় বহিরাগত তার্কিকদের প্রবেশের অনুমতি ছিল না। এমনকি ব্যাপ্তিবাদেও মিশ্র প্রমুখ যে সকল নৈয়ায়িকের বহুবিধ লক্ষণ আলোচিত হয়েছে তাঁরা প্রায় সকলেই মিথিলানিবাসী ছিলেন বলে মনে করা হয়। সুতরাং সিংহ-ব্যাঘ্র হিসাবে যাদের নাম পরিচিতি পেয়েছে তাঁরা অবশ্য ন্যায় পরম্পরার কোনো আচার্য। শাস্ত্রের বিচারে এরা যথাক্রমে শশধর (শশীধর)[৫] ও মণিধর[৬]। এই দুই তার্কিক বাল্যকালে এত প্রতিভাশালী ছিলেন যে তাঁরা হস্তী সদৃশ জ্ঞানী প্রতিপক্ষ পণ্ডিতদের অনায়াসে হার মানাতেন। তাই তাদের 'সিংহ-ব্যাঘ্র' নামে অভিহিত করা হত। এই সিংহ-ব্যাঘ্র লক্ষণদ্বয়ের প্রথমটিকে আবার অত্যন্তাভাব ঘটিত লক্ষণ ও দ্বিতীয়টিকে অন্যোন্যাভাব ঘটিত লক্ষণ বলা হয়। মনে করা হয় ওই অত্যন্তাভাব ঘটিত লক্ষণটি মণিধরের যাকে 'ব্যাঘ্র লক্ষণ' বলা হয় এবং অন্যোন্যাভাব ঘটিত লক্ষণটি শশধরের যাকে 'সিংহ লক্ষণ' বলা হয়।

৫.২ সিংহ-ব্যাঘ্র লক্ষণ ব্যাখ্যা

৫.২.১ সাধ্যাসামানাধিকরন্যানধিকরণত্বম্ লক্ষণের ব্যাখ্যা

সিংহ ব্যাঘ্র লক্ষণদ্বয়ের প্রথম লক্ষণটি হল- "সাধ্যাসামানাধিকরন্যানধিকরণত্বম্" অর্থাৎ সাধ্যের অসমানাধিকরণ্যের অনধিকরণত্বই ব্যাপ্তির লক্ষণ। এই লক্ষণে অসামানাধিকরণ্য কথাটির অর্থ স্পষ্ট করা দরকার। যাদের অধিকরণ এক হয় বা যারা একাধিকরণ বৃত্তি হয়, তাদের বলা হয় সমানাধিকরণ্য বা সহচর। এই সমানাধিকরণ্য থাকে সেই দুই পদার্থে যারা সমান অধিকরণে বর্তমান। অসামানাধিকরণ্য হল সামানাধিকরণ্যের অভাব। এই ধর্ম থাকে

---

[৫] Dineshchandra Bhattacharya, *History of navya-nyāya in Mithilā*, 1958, page- 89.

[৬] Ibid.

সেই সব পদার্থে যাদের অধিকরণ ভিন্ন হয় বা যারা সমান অধিকরণ হয় না। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় যারা সমানাধিকরণ তাদের মধ্যে সামানাধিকরণ্য থাকে, অসমানাধিকরণ্য থাকে না। কিন্তু এই ধারণা আপাতভাবে সত্য হলেও সম্পূর্ণত সত্য নয়। কারণ এমন পদার্থ যুগল থাকতে পারে যারা কিছু ক্ষেত্রে সমানাধিকরণ হলেও সকল ক্ষেত্রে সমানাধিকরণ নয়। যেমন– যে ভূতলে একটি ঘট ও একটি পট বর্তমান সেই ভূতলে যেহেতু ঘট ও পট উভয়েই সমানাধিকরণ বৃত্তি হয়, তাই তাদের মধ্যে সামানাধিকরণ্য আছে। এখানে ঘটটি পট সমানাধিকরণ ঘট আর পটটি ঘট সমানাধিকরণ পট। আলোচ্য দৃষ্টান্তে তাই ঘট ও পটের সমানাধিকরণ্য বর্তমান কিন্তু এই ঘট ও পটের মধ্যে সামানাধিকরণ্য থাকলেও অসামানাধিকরণ্যের অভাব নেই। কারণ ওই ভূতল হতে ঘটটি বা পটটি স্থানান্তরে নীত হলে তাদের সামানাধিকরণ্য থাকে না। সুতরাং আলোচ্য ঘটটিকে বা পটটিকে অসামানাধিকরণ্যের অনধিকরণও বলা যায় না। এক অর্থে আলোচ্য স্থলীয় ঘট এবং পট যেমন সামানাধিকরণ্যের অধিকরণ তেমনই অসামানাধিকরণ্যের অধিকরণ। আলোচ্য লক্ষণ অনুসারে ব্যাপ্তি এমন এক প্রকার সম্বন্ধ যেখানে সম্বন্ধী হেতুটি কেবলমাত্র সাধ্য সামানাধিকরণ্যের অধিকরণ হবে। অসামানাধিকরণ্যের অধিকরণ কখনই হবে না। অর্থাৎ তা হবে অসামানাধিকরণ্যের অনধিকরণ। অর্থাৎ কিনা এই সম্বন্ধের সম্বন্ধী হেতুতে সাধ্য সামানাধিকরণ্যের অভাব কখনই থাকবে না। কোন হেতুতে সাধ্যের অসামানাধিকরণ্য থাকতে পারে না তা ব্যাপ্তি সম্বন্ধে সাবেকী ধারণাটি বিশ্লেষণ করলেই ধরা পড়ে। ব্যাপ্তি সম্বন্ধের ক্ষেত্রে হেতু সাধ্যের মধ্যে সামানাধিকরণ্য থাকে। আর সামানাধিকরণ্য থাকা আর অসামানাধিকরণ্যের অভাব থাকা একই কথা। যে ভূতলে ঘট আছে তা যেমন ঘটাভাবের অধিকরণ হতে বাধ্য তেমনই যে

হেতুতে সাধ্যের সামানাধিকরণ্য আছে তা সাধ্য সামানাধিকরণ্যের অনধিকরণ হতে বাধ্য। যেমন- ধূমে বহ্নির সামানাধিকরণ্য আছে। সুতরাং ওই ধূমে বহ্নির অসামানাধিকরণ্যের অভাবও আছে অর্থাৎ কিনা ধূম হল বহ্নির অসামানাধিকরণ্যের অনধিকরণ। এইভাবে ধূমে বহ্নির অসামানাধিকরণ্যের অনধিকরণত্ব সিদ্ধ হওয়ায় ব্যাপ্তির লক্ষণটি আলোচ্য সদ্ধেতুতে সমন্বয় হয়। আর বহ্নির অনুমানে ধূম যেহেতু একটি সদ্ধেতু তাই সদ্ধেতুতে লক্ষণ সমন্বয় হওয়ায় অব্যাপ্তির আশঙ্কা দূর হয়।

পক্ষান্তরে, 'ধুমবান্ বহ্নেঃ' এই স্থলে বহ্নি রূপ অসদ্ধেতুতে লক্ষণটির সমন্বয় হয় না। কারণ অয়োগোলকাদি স্থলে হেতু বহ্নি থাকলেও ধূম উপস্থিত থাকে না ফলে বহ্নিতে ধূমের অসামানাধিকরণ্যই থাকে। বহ্নিটি হয় অসামানাধিকরণ্যের অধিকরণ; অসামানাধিকরণ্যের অনধিকরণ তা হয় না। সুতরাং 'সাধ্যাসামানাধিকরণ্যানধিকরণত্ব' বহ্নি হেতুতে থাকতে পারে না। ফলত অসদ্ধেতুতে লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ায় লক্ষণটিতে অব্যাপ্তির আশঙ্কাও দূর হয়।

এই পর্যন্ত সাধ্যাসামানাধিকরণ্যানধিকরণত্ব লক্ষণটির প্রাথমিকভাবে অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা মুক্ত সেকথা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন দেখা যাক 'সাধ্যাসামানাধিকরণ্য' লক্ষণস্থ এই সন্দর্ভটির অন্তর্গত অসমানাধিকরণ্য কথাটির অর্থ ঠিক কী হতে পারে। শুরুতেই উল্লেখ করা যাক যে এই শব্দটির দুটি অর্থ হতে পারে- 'অধিকরণাবৃত্তি' এবং 'অনধিকরণাবৃত্তিত্ব'। এই অর্থগুলি কীভাবে হতে পারে দেখা যাক। সামানাধিকরণ্য শব্দের প্রাথমিক অর্থ অধিকরণ বৃত্তিত্ব। এর সঙ্গে নঞ্ যোগে অসমানাধিকরণ্য শব্দটিকে নিষ্পন্ন করলে অসমানাধিকরণ্যের অর্থ হবে অধিকরণাবৃত্তিত্ব অর্থাৎ অধিকরণ অবৃত্তিত্ব। এর সঙ্গে

‘সাধ্য’ শব্দটি অন্বয় করলে সাধ্যাসামানাধিকরণ্য শব্দটির ফলিত অর্থ দাঁড়াবে সাধ্যাধিকরণা-বৃত্তিত্ব অর্থাৎ সাধ্যের অধিকরণে অবৃত্তিত্ব।

আরেক ভাবেও অসমানাধিকরণ্য পদটি নিষ্পন্ন হতে পারে। যদি সামানাধিকরণ্য শব্দটির অর্থ যে অধিকরণ বৃত্তিত্ব তার সমগ্রের সঙ্গে অভাব বাচক ‘নঞ্’ শব্দটি যুক্ত না করে তার একাংশ অধিকরণের সঙ্গে ওই ‘নঞ্’ যোজনা করা হয় সেক্ষেত্রে অসমানাধিকরণ্য কথার অর্থ আর অধিকরণাবৃত্তিত্ব হবে না, হবে অনধিকরণবৃত্তিত্ব। যথারীতি ‘সাধ্য’ শব্দটিকে যদি এর সঙ্গে অন্বিত করা হয় তাহলে অর্থ দাঁড়াবে সাধ্যানধিকরণবৃত্তিত্ব।

এবার সাধ্যাসামানাধিকরণ্য শব্দটির এই অর্থ দুটিকে বিচারে রেখে দেখা যাক ব্যাপ্তির প্রথম লক্ষণটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কী সমস্যা দেখা দেয়? সাধ্যাসামানাধিকরণ্য কথার অর্থ যদি সাধ্যের অধিকরণে অবৃত্তিত্ব ধরা হয় তাহলে লক্ষণটির অর্থ হবে সাধ্যাধিকরণ নিরূপিত যে অবৃত্তিত্ব তারই অনধিকরণ। প্রথম ব্যুৎপত্তি স্বীকার করলে সাধ্যাসামানাধিকরন্যানধিকরণত্ব এই লক্ষণটির অর্থ দাঁড়ায় সাধ্যাধিকরণ নিরূপিত অবৃত্তিত্বানধিকরণত্ব অর্থাৎ সাধ্যের অধিকরণ নিরূপিত যে বৃত্তিত্বাভাব তার অনধিকরণত্ব। এই অর্থ করলে ‘বহ্নিমান্ ধূমাৎ’ স্থলে অব্যাপ্তি হয় না। কারণ ‘বহ্নিমান্ ধূমাৎ’ এর ক্ষেত্রে সাধ্য বহ্নির অধিকরণ মহানসাদিতে ধূমের অবৃত্তিত্ব না থাকায় ধূম সেই অবৃত্তিত্বের অধিকরণ না হয়ে অনধিকরণই হয়। ফলে লক্ষণ সমন্বয় হয়। কিন্তু আলোচ্য অর্থে লক্ষণটিকে গ্রহণ করলে অব্যাপ্তি দেখা না দিলেও অতিব্যাপ্তি অপরিহার্য্য হয়ে পড়ে ও অতিব্যাপ্তি স্থল হিসাবে ‘দ্রব্যং সত্ত্বাৎ’ এর উল্লেখ করা হয়েছে। এখন ‘দ্রব্যং সত্ত্বাৎ’ এই স্থলটি বিবেচনা করা যাক। এখানে দ্রব্যত্ব সাধ্য এবং সত্তা হল হেতু। সত্তার সকল অধিকরণে দ্রবত্ব থাকে না। যেমন সত্তাধিকরণ গুণ, কর্মে দ্রবত্ব

নাই। সুতরাং সত্তা একটি অসদ্‌হেতু। অথচ লক্ষণটির আলোচ্য অর্থ গ্রহণ করলে ওই অসদ্ধেতুতে লক্ষণ সমন্বয় হবে। কারণ আলোচ্য দৃষ্টান্তে সাধ্য হল দ্রবত্ব, আর তার অধিকরণ হল দ্রব্য এবং সেই দ্রব্যে সত্তা বিদ্যমান থাকে। ফলে সাধ্যাধিকরণ নিরূপিত অবৃত্তিত্ব হেতু সত্তায় নাই বরং তাদৃশ অবৃত্তিত্বের অনধিকরণত্বই সত্তায় আছে ফলে সাধ্যাধিকরণাবৃত্তিত্বের অনধিকরণত্বই হেতু সত্তায় সিদ্ধ হওয়ায় ব্যাপ্তির লক্ষণটির সমন্বয় হয়। এমনকি প্রসিদ্ধ ‘ধূমবান্ বহ্নেঃ’ এই অসদ্ধেতুক অনুমিতির স্থলটিতেও অতিব্যাপ্তি দেখানো যেতে পারে। ধূম যেখানে সাধ্য সেখানে সাধ্যাধিকরণ মহানসাদিতে হেতু বহ্নি থাকায় সাধ্যাধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বই হেতুতে পাওয়া যায়। ফলে হেতুর সাধ্যাধিকরণ নিরূপিত অবৃত্তিত্বের অনধিকরণই হয়।

সুতরাং ‘সাধ্যাসামানাধিকরণ্য’ প্রথম অর্থ গ্রাহ্য নয়। এবার দ্বিতীয় অর্থের গ্রহণ করলে সমগ্র লক্ষণটির অর্থ হয়- সাধ্যানধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বানধিকরণত্ব। এই রূপ অর্থ গ্রহণ করলে পূর্বের ন্যায় ‘দ্রব্যং সত্ত্বাৎ’ ইত্যাদি অনুমিতির স্থলে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। কারণ এখানে দ্রব্যত্ব সাধ্য হওয়ায় তার অনধিকরণ হয় গুণাদি (কারণ দ্রব্যত্বের অধিকরণ কেবল দ্রব্য হওয়ায়, দ্রব্য ভিন্ন সকল পদার্থ দ্রব্যত্বের অনধিকরণ) সেই গুণাদিতে সত্তা বৃত্তি হওয়ায় দ্রব্যত্বের অনধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বের অধিকরণই হয় সাধ্য। ফলে সাধ্যের অনধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বের অনধিকরণত্ব সত্তায় সিদ্ধ না হওয়ায় লক্ষণটির আর সমন্বয় হয় না। একইভাবে ‘ধূমবান্ বহ্নেঃ’ স্থলে সাধ্য ধূমের অনধিকরণ হল অয়োগোলক তথায় হেতু বহ্নি উপস্থিত রয়েছে। ফলে সাধ্যানধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বই হেতুতে সিদ্ধ অর্থাৎ তা বৃত্তিত্বের অধিকরণ, অনধিকরণ নয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় অর্থে লক্ষণটি গ্রহণ করলে পূর্বে উত্থাপিত অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা দূর হয়। এমনকি অব্যাপ্তিরও কোনো আশঙ্কা থাকে না। কেননা, 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ইত্যাদি সদ্ধেতুক স্থলেও লক্ষণটির সমন্বয় হয়। বহ্নি যেখানে সাধ্য সেখানে সাধ্যানধিকরণ হবে জলাশয়াদি। সেই জলাশয়াদিতে ধূম থাকে না। ফলে সাধ্যানধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাবই ধূমে থাকে অর্থাৎ সাধ্যানধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বের অনধিকরণই হয় ধূম। ফলে লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যায়। তবে এই প্রকার ব্যাখার অব্যাপ্তি বা অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা দূর হলেও একটি গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি হয়। সাধ্যাসামানাধিকরণ্যের অর্থ সাধ্যানধিকরণ্য ধরলে সিংহ-ব্যাঘ্র লক্ষণরূপে পরিচিত দ্বিতীয় লক্ষণের সঙ্গে প্রথম লক্ষণের কোনো তফাৎই অবশিষ্ট থাকে না। কারণ দ্বিতীয় লক্ষণটি সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যানধিকরণত্বের কথা বলে আর আলোচ্য অর্থে প্রথম লক্ষণটি সাধ্যানধিকরণ্যানধিকরণত্বকে বোঝায়। 'সাধ্যবৈয়ধিকরণ' ও 'সাধ্যানধিকরণ' একই কথা। ফলে প্রথম লক্ষণের বিকল্প অর্থটি গ্রহণ করলে দ্বিতীয় লক্ষণটি নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বা বলা চলে দ্বিতীয় লক্ষণটি হয়ে পড়ে প্রথম লক্ষণেরই পুনুরুক্তি।

৫.২.১.১ লক্ষণার্থে অসঙ্গতি নিরাকরণে রঘুনাথ

এই উভয়বিধ সমস্যার সমাধান কল্পে দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণি প্রথম লক্ষণটির ভিন্ন প্রকার অর্থ নির্দেশ করেছেন। সাধ্যাসামানাধিকরণ্য এই সমস্ত পদটির ব্যাসবাক্য করেছেন এইভাবে– প্রথমে "সাধ্য অসমানাধিকরণং যস্য" এইভাবে বহুব্রীহি সমাস করেছেন। তারপর 'তস্য ভাব' এইভাবে ভাব অর্থে 'যন্' প্রত্যয় করেছেন। 'সাধ্যং অসমানাধিকরণং যস্য' কথার অর্থ সাধ্যটি যার অসমানাধিকরণ। তস্য ভাব অর্থাৎ তার ভাব। ফলিত অর্থ সাধ্যটি যার অসমানাধিকরণ তার ভাবই বা ধর্মই সাধ্যাসামানাধিকরণ্য। এরকম সাধ্যাসামানাধিকরণ্যের

অনধিকরণত্ব হেতুতে থাকাই ব্যাপ্তি। এই রকম অর্থ ধরলে 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' স্থলে কীভাবে লক্ষণ সমন্বয় হয় তা দেখা যাক। এখানে সাধ্য বহ্নি যার অসমানাধিকরণ তা কিন্তু হেতু ধূম নয়, কারণ ধূমের সঙ্গে বহ্নির সামানাধিকরণ্য আছে। বহ্নি যার অসমানাধিকরণ সেগুলি হল মীন, শৈবাল প্রভৃতি, কারণ মীন, শৈবাল যে জলাশয়ে থাকে তা বহ্নির অধিকরণ নয়। এখন সাধ্য যার অসমানাধিকরণ, তার ভাব- এই অর্থ ধরলে সাধ্যাসামানাধিকরণ্য হয়ে দাঁড়ায় মীন, শৈবালের ভাব বা ধর্ম (অর্থাৎ মীনত্ব, শৈবালত্ব ইত্যাদি)। ওই ভাব বা ধর্ম হেতু ধূমে থাকে না। তাই ধূম সাধ্যাসামানাধিকরণ্যের অনধিকরণই হয়।

একইভাবে দীধিতিকারের ব্যাখ্যা মানলে 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' স্থলে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। কারণ সাধ্য এখানে ধূম, আর সেই ধূম যার অসামানাধিকরণ তা সন্ধান করতে গেলে অয়োগোলক স্থিত বহ্নিকে পাওয়া যায়। কারণ ওইরূপ বহ্নি যে অয়োগোলক বা তপ্ত লৌহপিন্ডে থাকে সেখানে সাধ্য ধূম থাকে না। ধূম তাই তপ্ত লৌহপিন্ড স্থিত বহ্নির অসামানাধিকরণ। আর ওই বহ্নির ভাব হল অসামানাধিকরণ্য। এই ভাব হল বহ্নিত্ব। সেই বহ্নিত্ব বহ্নিতে থাকাই হেতু বহ্নি সাধ্যাসামানাধিকরণ্যের অধিকরণই হয়, অনধিকরণ হয় না। ফলে হেতুতে সাধ্যাসামানাধিকরণ্যের অনধিকরণ্য সিদ্ধ হতে পারে না। এইভাবে অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা দূর হয়।

সাধ্য যার অসমানাধিকরণ এই কথার অর্থ যদি করা হয় সাধ্য যার অনধিকরণ বৃত্তি তাহলে সাধ্যসামানাধিকরণ্যের অর্থ হবে সাধ্য যার অনধিকরণ বৃত্তি তার ভাব। কিন্তু এইরকম অর্থ গ্রহণ করলে 'দ্রব্যং সত্ত্বাৎ' – এর ক্ষেত্রে পুনরায় অতিব্যাপ্তি দোষ দেখা দেয়। কারণ সাধ্য দ্রব্যত্ব যার অনধিকরণ বৃত্তি তার মধ্যে গুণত্ব রয়েছে কারণ গুণত্বের অধিকরণ গুণে

সাধ্য দ্রব্যত্ব থাকে না। পক্ষান্তরে হেতু সত্তার অনধিকরণ সামান্যাদিতে দ্রব্যত্ব না থাকায় সাধ্য সত্তার অনধিকরণ বৃত্তি হয় না। সুতরাং সাধ্য যার অনধিকরণ বৃত্তি তার ভাব গুণত্বাদিতে থাকলেও সত্তায় থাকে না। ফলে সাধ্য যার অনধিকরণ বৃত্তি তার অনধিকরণত্বই সিদ্ধ হয় সত্তায়। এইভাবে লক্ষণটি অসদ্ধেতুক ক্ষেত্রে সমন্বিত হয়ে পড়ায় অতিব্যাপ্তি দোষ দেখা দেয়।

প্রথম লক্ষণের রঘুনাথকৃত ব্যাখ্যার এই দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করলে অতিব্যাপ্তির পাশাপাশি 'সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ' স্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কাও দেখা দেয়। তাই সাধ্য সত্তা এখানে হেতু দ্রব্যত্বের অনধিকরণ বৃত্তি। কেননা দ্রব্যত্বের অধিকরণ দ্রব্য হওয়ায় গুণ, কর্ম হল তার অনধিকরণ; অনধিকরণ গুণ, কর্মে সত্তা থাকায় সত্তা হয় দ্রব্যত্বের অনধিকরণ বৃত্তি। সাধ্য যার অনধিকরণ বৃত্তি তার ভাব যদি সামানাধিকরণ্য হয় তাহলে ওই ভাব দ্রব্যত্বেই থাকবে। ফলে দ্রব্যত্ব সাধ্যাসামানাধিকরণ্যের অধিকরণই হবে, অনধিকরণ হবে না। ফলে লক্ষণ সমন্বয় না হওয়ায় অব্যাপ্তি দোষ দেখা দেয়।

পক্ষান্তরে, যদি অসমানাধিকরণ কথাটির অধিকরণে অবৃত্তি – এই অর্থ করা হয় এবং সাধ্য যার অধিকরণে অবৃত্তি তার ধর্মকে সামানাধিকরণ্য ধরা হয় তাহলে আর অতিব্যাপ্তি বা অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। সেক্ষেত্রে যার অধিকরণে সাধ্য অবৃত্তি তার ভাবই হবে সামানাধিকরণ্য এবং সেই সামানাধিকরণ্যের অনধিকরণত্বই হবে ব্যাপ্তি। এই অর্থে লক্ষণটিকে গ্রহণ করলে 'দ্রব্যং সত্ত্বাৎ' স্থলে অতিব্যাপ্তি বা 'সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ' স্থলে অব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। কারণ 'দ্রব্যং সত্ত্বাৎ' এই স্থলে সাধ্য দ্রব্যত্ব যার অধিকরণে অবৃত্তি তার মধ্যে সত্তা পড়ে কেননা সত্তার অধিকরণ যে গুণ, কর্ম তার মধ্যে দ্রব্যত্ব থাকে না। কাজেই সাধ্য যার অধিকরণে অবৃত্তি তার ভাব যদি সামানাধিকরণ্য হয় তাহলে সেই ভাব সত্তায় আছে। অর্থাৎ

সত্তা সেই সামানাধিকরণ্যের অধিকরণ অথচ সাধ্যাসামানাধিকরণ্যের অনধিকরণত্বই ব্যাপ্তি। সুতরাং সত্তাই দ্রব্যত্ব সামানাধিকরণ্যের অধিকরণত্ব থাকাই সেখানে লক্ষণ সমন্বয় হচ্ছে না। ফলত অতিব্যাপ্তির আশঙ্কাও থাকছে না। একইভাবে 'সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ' এই সদ্ধেতুক অনুমিতির ক্ষেত্রে অব্যাপ্তির আশঙ্কাও দূরীভূত হয়। কারণ সাধ্য সত্তা কখনই হেতু দ্রব্যত্বের অধিকরণে অবৃত্তি হয় না। দ্রব্যত্বের অধিকরণ কেবল দ্রব্যই হয়। যেখানে সত্তা বর্তমান। সত্তা যাদের অধিকরণে অবৃত্তি হয় তাদের মধ্যে সামান্যত্ব, বিশেষত্ব প্রভৃতি রয়েছে। কেননা সামান্যত্বাদির আশ্রয় যে সামান্যাদি সেগুলিতে সত্তা থাকে না। সাধ্য যার অধিকরণে অবৃত্তি তার ভাব যদি সামানাধিকরণ্য হয় তাহলে ওই ভাব হবে সামান্যত্বনিষ্ঠ সামান্যত্বত্ব ইত্যাদি। ওই সকল ধর্ম দ্রব্যত্বে কখনই থাকে না। সুতরাং হেতু দ্রব্যত্ব সাধ্যাসামানাধিকরণ্যের অনধিকরণই হয়। এভাবে লক্ষণ সমন্বয় হওয়ায় আর অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না।

এই সমাধানকেও কিন্তু প্রকৃত সমাধান বলা যায় না। কারণ এইভাবে যদি সাধ্যাসামানাধিকরণ্য পদটির অর্থান্তর গ্রহণ করা হয় তাহলে 'সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ' স্থলে অব্যাপ্তি বা 'দ্রব্যং সত্ত্বাৎ' স্থলে অতিব্যাপ্তি না হলেও অন্য একটি স্থলে অতিব্যাপ্তি অনিবার্য হয়ে পড়ে। এই স্থলটি হল– 'গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্ট সত্তাবান্ জাতেঃ'। এখানে সাধ্য হল সেই সত্তা যা গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্ট। গুণকর্মান্যত্ব হল গুণ কর্মের ভেদ। সেই ভেদ বিশিষ্টসত্তা অর্থাৎ গুণকর্মভেদ সমানাধিকরণ যে সত্তা তদরূপ সত্তাই আলোচ্য ক্ষেত্রে সাধ্য। অন্যদিকে হেতু হল জাতি। সাধারণভাবে জাতি দ্রব্য, গুণ, কর্মে বিদ্যমান কারণ দ্রব্যে দ্রব্যত্ব, গুণে গুণত্ব ও কর্মে কর্মত্ব জাতি থাকে। আবার ওই দ্রব্য, গুণ, কর্মে সত্তারও অধিষ্ঠান। কিন্তু তারা সকলে বিশিষ্টসত্তার অর্থাৎ গুণ কর্মের ভেদ সমানাধিকরণ সত্তার অধিষ্ঠান নয়। কেননা গুণে গুণ

ভেদ, কর্মে কর্মভেদ না থাকায় সত্তা গুণ কর্মের ভেদ বিশিষ্ট হয়ে গুণ কর্মে থাকতে পারে না। গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্ট হয়ে সত্তা কেবল দ্রব্যেই থাকতে পারে। সুতরাং হেতু জাতির যাবতীয় অধিকরণে বিশিষ্টসত্তা না থাকায় জাতি হেতুটি ব্যভিচারী হয়ে পড়ে। অথচ এই জাতি সাধ্যাসামানাধিকরণ বা সাধ্যের অসমানাধিকরণ নয়। প্রশ্ন হবে কেন? যেহেতু সাধ্য বিশিষ্টসত্তার অনধিকরণ গুণ কর্মে জাতি থাকে তাই তাকে সাধ্যাসামানাধিকরণ বলাই বিধেয়। কারণ হেতুর অধিকরণে যদি সাধ্য অবৃত্তি হয় তাহলে হেতুটি সাধ্যাসামানাধিকরণই হয়। অথচ বাস্তবক্ষেত্রে তা হয় না। কারণ জাতির অধিকরণ হল দ্রব্য, গুণ, কর্ম। সেই অধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্ব সাধ্যে রয়েছে। যদিও গুণ, কর্মে বিশিষ্টসত্তা না থাকায় গুণনিরূপিত বৃত্তিত্ব এবং কর্মনিরূপিত বৃত্তিত্ব সাধ্য বিশিষ্টসত্তায় না থাকায় স্বাভাবিক এবং একমাত্র দ্রব্য নিরূপিত বৃত্তিত্বই বিশিষ্টসত্তায় থাকার কথা। তথাপি 'বিশিষ্টশুদ্ধাৎ নাতিরুচ্যতে' এই নিয়ম মানলে ঘটাকাশ-পটাকাশ যেমন মহাকাশের অতিরিক্ত কিছু নয় তেমনই গুণকর্ম নিরূপিত বৃত্তিত্বও সাধ্য বিশিষ্টসত্তায় পাওয়া যাবে। আলোচ্য নিয়ম অনুসারে বিশিষ্ট শুদ্ধের অতিরিক্ত নয়। ফলে বিশিষ্টসত্তাও শুদ্ধসত্তার অতিরিক্ত নয়। তাই যেখানে যেখানে শুদ্ধসত্তা থাকে সেখানে সেখানে বিশিষ্টসত্তাও থাকে। সত্তা বা শুদ্ধসত্তা দ্রব্য, গুণ ও কর্ম তিনটিতেই থাকে। ফলে দ্রব্যের পাশাপাশি গুণ কর্মেও বিশিষ্টসত্তা থাকবে। তাই দ্রব্যনিরূপিত, গুণনিরূপিত এবং কর্মনিরূপিত বৃত্তিত্ব যেমন সত্তায় থাকবে তেমনই বিশিষ্টসত্তাতেও থাকবে (গুণ, কর্মের ভেদ সমানাধিকরণ যে সত্তা তাতে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম নিরূপিত বৃত্তিত্ব থেকে যায়, অবৃত্তিত্ব থাকে না)। ফলে জাতিকে আর সাধ্যাসামানাধিকরণ বলা যায় না। আর তাই সাধ্যাসামানাধিকরণ্যের

অনধিকরণত্বই জাতি হেতুতে থাকে। এইভাবে ব্যভিচারী হেতুতে ব্যাপ্তির লক্ষণের সমন্বয় হওয়ায় অতিব্যাপ্তি দোষ দেখা দেয়।

সুতরাং সাধ্য যার অধিকরণে অবৃত্তি – এই অর্থে সাধ্যসামানাধিকরণ্যকে গ্রহণ করা সমীচীন হবে না। পরন্তু যদি যার অধিকরণ সাধ্যের অনধিকরণ সাধ্যসামানাধিকরণ্য পদের এইরূপ অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহলে আর উপরোল্লিখিত অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না বলে মনে হয়। কারণ আলোচ্য ক্ষেত্রে হেতুর অধিকরণই সাধ্যের অনধিকরণ হয়। কিন্তু আলোচ্য ক্ষেত্রে হেতু জাতির অধিকরণ যেহেতু শুদ্ধসত্তা থাকে তাই তারা বিশিষ্টসত্তার অনধিকরণ হয় কীভাবে? বিশিষ্ট যেহেতু শুদ্ধ থেকে অতিরিক্ত নয় তাই গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্ট সত্তা সত্তাতিরিক্ত কিছু নয়। আর গুণ, কর্ম সত্তার অধিকরণ হিসাবে প্রসিদ্ধ। ফলে সেই গুণ, কর্ম গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্টসত্তার অনধিকরণ হতে পারে না। এই আপত্তির উত্তরে বলা যায় 'গুণ, গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্ট সত্তাবান' বা 'কর্ম, গুণকর্মান্যত্ববিশিষ্ট সত্তাবান' এরূপ প্রমাত্মক জ্ঞান কদাপি হয় না। সত্তাত্ব ধর্ম পুরস্কারে সত্তা নিরূপিত অধিকরণতা গুণ কর্মে থাকলেও বিশিষ্টসত্তাত্ব ধর্ম পুরস্কারে সত্তা নিরূপিত অধিকরণতা কখনই গুণ কর্মে থাকে না। সুতরাং গুণ কর্মে বিশিষ্টসত্তার অনধিকরণত্বই সিদ্ধ হয়। কাজেই হেতু জাতি সাধ্যাসামানাধিকরণই হয়। ফলে জাতিতে সাধ্যাসামানাধিকরণই থাকে; আর যা সাধ্যাসামানাধিকরণ্যের অধিকরণ তা সাধ্যাসামানাধিকরণ্যের অনধিকরণ হয় কী প্রকারে?

যার অধিকরণ সাধ্যের অনধিকরণ এভাবে সাধ্যাসামানাধিকরণ্যের অর্থ করলে উত্থাপিত অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা দূর হয় বটে কিন্তু 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' প্রভৃতি অসদ্ধেতুক অনুমিতির স্থলে লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যায়। কারণ যার অধিকরণ সাধ্যের অনধিকরণ তার ধর্মই যদি

সামানাধিকরণ্য হয় তাহলে মীন, শৈবালাদির অধিকরণ জলাশয় সাধ্য ধূমের অনধিকরণ হওয়ায় মীন শৈবালে সাধ্যাসামানাধিকরণ্য থাকে এবং সেই মীন শৈবালের ভাব বহ্নিতে না থাকায় হেতু বহ্নি সাধ্যাসামানাধিকরণ্যের অনধিকরণই হয়। এইভাবে লক্ষণে অতিব্যাপ্তি দোষ অব্যাহত থেকে যায়। কিন্তু যার অধিকরণ সাধ্যের অনধিকরণ এই অর্থে সাধ্যাসামানাধিকরণ্যকে ধরলেও একটি বিষয় বিচারে রাখতে হবে। এখানে কোনো বিশেষ তত্ত্বের কথা বলা হয়নি। বস্তুত যার যার অধিকরণ সাধ্যের অনধিকরণ সেই পদার্থের ভাবই এখানে সামানাধিকরণ্য কথার অর্থ। অতএব মীন, শৈবালের অধিকরণ ধূমের অনধিকরণ বলে যেমন মীন, শৈবালের সাধ্যাসামানাধিকরণ্য বর্তমান সেরূপ বিবেচনায় রাখতে হবে বহ্নির অধিকরণ অয়োগোলক সাধ্য ধূমের অনধিকরণ হওয়ায় হেতু বহ্নিতেও ওই সাধ্যাসামানাধিকরণ্যই রয়েছে। ফলে বহ্নিতে আর সাধ্যাসামানাধিকরণ্যের অনধিকরণত্ব পাওয়া যাবে না। অতএব 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' স্থলে আর ব্যাপ্তির লক্ষণটির অতিপ্রসঙ্গ হবে না।

৫.২.১.২ গৌরবের আশঙ্কা ও তা নিরাশে রঘুনাথের বিকল্প ব্যাখ্যা

'ধূমবান্ বহ্নেঃ' স্থলে অতিপ্রসঙ্গ রোধ করতে উপরে যে পদ গ্রহণ করা হয়েছে তা গৌরবাহ বলে আপত্তি উত্থাপিত হতে পারে। কারণ এই ব্যাখ্যা মানলে প্রত্যেকটি সাধ্যাসামানাধিকরণ্যকে বিচারে রাখতে হয় এবং তাদের অনধিকরণত্ব হেতুতে বিদ্যমান তা পরীক্ষা করে দেখতে হয়। এমন সামানাধিকরণ্য সংখ্যায় অসংখ্য। ধূম যেখানে সাধ্য সেখানে সাধ্যসামানাধিকরণ্য মীন, শৈবাল, ঘট, পটাদিনিষ্ঠ হতে পারে তেমনই অনন্তসংখ্যক বস্তুনিষ্ঠ হতে পারে। যেগুলির কোনটি জ্ঞাত কোনটি অজ্ঞাত। জ্ঞাতগুলিকে বিচারে রাখা যেমন

একপ্রকার সমস্যা তেমনই অজ্ঞাতগুলি জ্ঞানগোচর হওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। কাজেই এরূপ অনন্ত সামানাধিকরণ্য ঘটিত লক্ষণ করলে ব্যাপ্তির লক্ষণটির মহাগৌরব দেখা দেয়।

এই ব্যাপারটিকে বিচারে রেখে দীধিতিকার সাধ্যাসামানাধিকরণ্যের একটি বিকল্প অর্থ পরীক্ষা করেছেন। এই অর্থে সাধ্যাসামানাধিকরণ্য হল ''সাধ্যানধিকরণবৃত্তিত্ব'' অর্থাৎ সাধ্যের অনধিকরণ বৃত্তি সাধ্যাসামানাধিকরণ, তার ভাব সাধ্যাসামানাধিকরণ্য। এই ব্যাখ্যা মেনে নিলে সাধ্যানধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বের অনধিকরণত্বই ব্যাপ্তির লক্ষণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে হেতু সাধ্যানধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্ব সামান্যের অনধিকরণ হয়ে দাঁড়ায়। এই সামান্যভাব একটি অনুগত অভাব হওয়ায় পূর্বে কথিত গৌরব দোষের আশঙ্কা থাকে না। আর এমন কথাও বলা যায় না যে এভাবে ব্যাখ্যা করলে 'সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যানধিকরণত্ব' ব্যাপ্তির ওই দ্বিতীয় লক্ষণের পুনরুক্তি ঘটেছে। কারণ এই ব্যাখ্যায় সাধ্যাধিকরণভিন্ন বা সাধ্যবদ্ভিন্ন অর্থে 'সাধ্যানধিকরণ' কথাটিকে গ্রহণ করা হয়নি, পরন্তু সাধ্যনিষ্ঠ আধেয়ত্বের অনিরূপক অধিকরণ হিসাবে তাকে গ্রহণ করা হয়েছে। ফলত সাধ্যনিষ্ঠ আধেয়তার অনিরূপক অধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বের অনধিকরণত্বই ব্যাপ্তির লক্ষণের ফলিত অর্থ হয়।

আপত্তি হতে পারে যে ব্যাপ্তির এরূপ ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' স্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা দেখা দিতে পারে। কারণ সাধ্যানধিকরণ অর্থাৎ সাধ্যনিষ্ঠ আধেয়তার অনিরূপক যে অধিকরণ তার মধ্যে ধূমাবয়ব এসে পড়ে। কেননা এখানে বহ্নি সাধ্য হওয়ায় সেই বহ্নিনিষ্ঠ আধেয়তার নিরূপক ধূমাবয়ব হয় না, বরং অনিরূপকই হয় (কারণ ধূমাবয়বে বহ্নি থাকে না এবং সেই কারণে ধূমাবয়ব নিরূপিত আধেয়তা বহ্নিতে থাকে না)। অথচ সেই ধূমাবয়বে হেতু ধূম সমবায় সম্বন্ধে আধেয় হওয়ায় ধূমাবয়ব নিরূপিত বৃত্তিত্ব ধূমে আছে।

অতএব তাদৃশ বৃত্তিত্ব অনধিকরণত্ব হেতুতে না থাকায় অব্যাপ্তি হয়ে যায়। এই আশঙ্কা দূর করতে হলে সাধ্যনিষ্ঠ আধেয়তার অনিরূপক অধিকরণ নিরূপিত যে বৃত্তিত্ব তাকে হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে ধরতে হবে। এই হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ কথিত স্থলে সংযোগ সম্বন্ধই হয়, সমবায় সম্বন্ধ হয় না। ফলে তাদৃশ সাধ্যানধিকরণ ধূমাবয়ব নিরূপিত সংযোগ সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্ব আর হেতুতে পাওয়া যায় না। ফলে হেতু সাধ্যনিষ্ঠ আধেয়তার অনিরূপক অধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বের অনধিকরণই হয়।

এভাবে সাধ্যনিষ্ঠ আধেয়তার অনিরূপক অধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বকে হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে গ্রহণ করলে আলোচ্য স্থলে সমস্যার সুরাহা হলেও ‘সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ’ ইত্যাদি স্থলে লক্ষণটির অব্যাপ্তি দেখা দেয়। কারণ এস্থলে সত্তা সাধ্য, সাধ্যানধিকরণ অর্থাৎ সত্তানধিকরণ হয় সামান্যাদি পদার্থ। ওই সামান্যাদি পদার্থে সমবায় সম্বন্ধে কোনো কিছুই আধেয় না হওয়ায় সাম্যানাদি নিরূপিত সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্ব অপ্রসিদ্ধ হয়। ফলে বৃত্তিত্ব ঘটিত লক্ষণটিও অসিদ্ধ হয়ে পড়ে। এই অসিদ্ধি বারণ কল্পে সাধ্যনিষ্ট আধেয়তার অনিরূপক অধিকরণতা ব্যাপকীভূতাভাব প্রতিযোগ্যধিকরণতা সামান্যকত্ব ব্যাপ্তি ওইরূপ ফলিতার্থ করতে হবে। যেখানে অনুমিতির হেতুটি সৎ হয় সেখানে সাধ্যের অধিকরণ পদার্থে হেতু কখনই থাকে না। তাই হেত্বধিকরণত্ব সাধ্যানধিকরণে থাকতে পারে না। ফলে হেত্বধিকরণভাব সর্বদায় সাধ্যানধিকরণত্বের ব্যাপক হয় অর্থাৎ যেখানে যেখানে সাধ্যানধিকরণত্ব থাকে সেখানে সেখানে হেত্বধিকরণত্বাভাব থাকে। হেত্বধিকরণত্বাভাব তাই সাধ্যানধিকরণত্বের ব্যাপকীভূত অভাব। ওই ব্যাপকীভূতাভাবের প্রতিযোগ্যধিকরণতাসামান্যকত্বই ব্যাপ্তি।

লক্ষণের এইরূপ পরিমার্জন ঘটালে 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' স্থলে অব্যাপ্তি বা 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' স্থলে অতিব্যাপ্তি হয় না। প্রথম ক্ষেত্রে সাধ্য বহ্নির অনধিকরণত্ব যে সব পদার্থে থাকে সেই সকল পদার্থে ধূমত্বাবচ্ছিন্নের অধিকরণতার অভাব থাকে। ফলে ধূমত্বাবচ্ছিন্নের অধিকরণতাভাব বহ্নির অনধিকরণত্বের ব্যাপক হয়ে দাঁড়ায়। তাদৃশ ধূমত্ববত্ত্ব হেতু ধূমে থাকায় লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যায়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, সাধ্য ধূমের অনধিকরণত্ব যে অয়োগোলক আছে সেই অয়োগোলকে হেত্বধিকরণত্বাভাব নেই। যেহেতু অয়োগোলক হেতু বহ্নির অধিকরণ। ফলে হেত্বধিকরণতাভাবটি আর সাধ্যানধিকরণত্বের ব্যাপকীভূতাভাব হয় না। তাই অসদ্ধেতুতে লক্ষণের সমন্বয় হয় না। এবার দেখা দরকার 'সত্তাবান্ দ্রব্যত্বাৎ' এই স্থলে ওই পরিমার্জিত লক্ষণটির অব্যাপ্তি হয় কিনা। এক্ষেত্রে সাধ্যানধিকরণ সাম্যানাদিতে হেত্বধিকরণতাভাব অর্থাৎ দ্রবত্বত্বাবচ্ছিন্ন অধিকরণতার অভাব রয়েছে। কেননা দ্রব্যত্বত্ব সাম্যানাদিতে না থাকায় দ্রব্যত্বত্বাবচ্ছিন্ন অধিকরণার অভাবটি সামান্যাদিতে থাকে। অর্থাৎকিনা দ্রব্যত্বত্বাবচ্ছিন্ন অধিকরণতাভাবটি সাধ্যানধিকরণত্বের ব্যাপকীভূত অভাব হয়। তাদৃশ দ্রব্যত্বত্বাবত্ব দ্রব্যত্ব হেতুতে থাকে। এভাবে আলোচ্য ক্ষেত্রে লক্ষণটির সমন্বয় হওয়ায় অব্যাপ্তির সমস্যাও আর অবশিষ্ট থাকে না।

৫.২.২ সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যানধিকরণত্বম্ লক্ষণটির ব্যাখ্যা

এখন দ্বিতীয় লক্ষণটির অর্থ উদ্ধারে অগ্রসর হওয়া যাক। এই দ্বিতীয় লক্ষণটি হল ''সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যানধিকরণত্বম্'' অর্থাৎ সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যের অনধিকরণত্বই ব্যাপ্তি। এখানে বৈয়াধিকরণ্য শব্দটির অর্থ স্পষ্ট করা দরকার। 'বি' পূর্বক 'অধি' পূর্বক 'কৃ' ধাতুর দ্বারা বৈয়াধিকরণ শব্দটি নিষ্পন্ন। যার অর্থ ব্যধিকরণ বা বিরুদ্ধ অধিকরণ। ব্যধিকরণস্য ভাব

বৈয়াধিকরণ্য অর্থাৎ কিনা ব্যধিকরণ বা বিরুদ্ধ অধিকরণ বৃত্তিত্বই বৈয়ধিকরণ্য। এর সঙ্গে সাধ্য শব্দটিকে যোগ করলে অর্থ দাঁড়ায় সাধ্যের ব্যধিকরণ বা সাধ্যের অধিকরণের বিরুদ্ধ অধিকরণ বৃত্তিত্ব। অন্যভাষায় সাধ্যবদ্‌ভিন্নবৃত্তিত্ব। আর ওই বৃত্তিত্বে অনধিকরণত্বকেই এখানে ব্যাপ্তি বলা হয়েছে। যে হেতুতে সাধ্যবদ্ভিন্ন বৃত্তিত্বের অভাব থাকে সেই হেতু সাধ্য বৈয়াধিকরণ্যের অনধিকরণ হয়। এইরূপ অনধিকরণত্বই আলোচ্য মতে ব্যাপ্তি।

এই লক্ষণটি অব্যাপ্তি দোষমুক্ত কিনা তা বিচার করা যাক। 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এই সদ্ধেতুক অনুমিতির স্থলে লক্ষণটির প্রয়োগ হয় কিনা তা দেখা যাক। এখানে বহ্নি সাধ্য হওয়ায় সাধ্যবৎ হয় পর্বত মহানসাদি। আর সাধ্যবদ্ভিন্ন বা সাধ্যবৈয়ধিকরণ হয় জলাশয়। সেই জলাশয় বৃত্তি বা বৈয়ধিকরণ্য মীন শৈবালাদিতে থাকে। ফলে মীন, শৈবালাদি সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যের অধিকরণ হয়। কিন্তু ধূমে সেই জলাশয় বৃত্তিত্ব থাকে না। তাই ধূম বহ্নি বৈয়ধিকরণ্যের অধিকরণই হয়। এভাবে হেতু সাধ্য বৈয়ধিকরণ্যের অনধিকরণ হওয়ায় লক্ষণ সমন্বয় হয়।

পক্ষান্তরে, 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' এই অসদ্ধেতুক অনুমিতির স্থলে ধূম সাধ্য হওয়ায় সাধ্যবৎ হয় মহানসাদি। সেই সাধ্যবদ্ভিন্ন হয় অয়োগোলক। ওই অয়োগোলকে বৃত্তিত্বই এখানে সাধ্যবৈয়ধকরণ্য। বহ্নি হেতু অয়োগোলক বৃত্তি হওয়ায় তাতে সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যের অধিকরণত্বই সিদ্ধ হয়, অনধিকরণত্ব সিদ্ধ হয় না। ফলে লক্ষণ সমন্বয় হয় না এভাবে অসদ্ধেতুতে লক্ষণটির অতিপ্রসঙ্গ দূর হয়।

৫.৩ সিংহ-ব্যাঘ্র লক্ষণের বিরুদ্ধে গঙ্গেশের আপত্তি

এই পর্যন্ত 'সিংহ ও ব্যাঘ্র' লক্ষণরূপে পরিচিত ব্যাপ্তির দ্বিবিধ লক্ষণের যে পর্যালোচনা হয়েছে তা ব্যাখ্যা ও বিবেচনার পর প্রাথমিকভাবে ওই দুটি লক্ষণই অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি ইত্যাদি দোষ রহিত বলে পর্যবসিত হয়। কিন্তু মণিকার এই লক্ষণদ্বয়ের কোনোটিকেই অদুষ্ট বলে মেনে নেননি। উপরন্তু অব্যভিচরিতত্ব পদপ্রতিপাদ্য পঞ্চলক্ষণের ন্যায় আলোচ্য দুটি লক্ষণও কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতির স্থলে অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয় বলে দাবি করেছেন। এ প্রসঙ্গে মণিকারের ব্যাখ্যা এইরূপ– ''তদুভয়মপি সাধ্যানধিকরণানধিকরণত্বং তচ্চ তত্র যৎকিঞ্চিৎসাধ্যানধিকরণাধিকরণে ধূমে চাসিদ্ধম্''।[৭] ঠিক কীভাবে এই অব্যাপ্তি দোষ দেখা দেয় গঙ্গেশকে অনুসরণ করে তা ব্যাখ্যা করা যাক।

গঙ্গেশ দেখিয়েছেন ''সাধ্যাসামানাধিকরণ্যানধিকরণত্বম'' এবং ''সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যান-ধিকরণত্বম'' দুটি লক্ষণেরই শেষভাগে 'অনধিকরণত্ব' শব্দের মধ্যে 'অধিকরণত্ব' শব্দটির ব্যবহার হয়েছে। মনিকারের বিচারে দুই ক্ষেত্রেই ওই 'অধিকরণত্ব' শব্দের ব্যবহার নিষ্প্রয়োজন। ওই অধিকরণত্বকে বাদ দিলে দুটি লক্ষণের অর্থ যথাক্রমে দাঁড়ায় 'সাধ্যাসামানাধিকরণ্যাভাব' এবং 'সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যাভাব'। ফলে উভয় লক্ষণেরই 'সাধ্যানধিকরণানধিকরণত্বই' অর্থ হয়। এখন 'সাধ্যানধিকরণানধিকরণত্ব'- এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত যে সাধ্যানধিকরণ অংশ তার মধ্যে প্রকৃষ্ট যে 'নঞ' তার অন্বয় লক্ষণটির শেষ অংশের অনধিকরণত্বের সঙ্গে করতে হবে। এর ফলে সমগ্র বাক্যটির অর্থ দাঁড়ায় 'সাধ্যাধিকরণান-

[৭] শ্রী কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, *তত্ত্বচিন্তামণি*, ২০১০, পৃষ্ঠা- ৪৯।

ধিকরণত্বাভাব'। এখন 'সাধ্যাধিকরণানধিকরণত্বাভাব' এই বাক্যাংশের মধ্যে যে 'সাধ্যাধিক-রণানধিকরণত্ব' অংশ তা 'যদধিকরণম্ অনধিকরণং যস্য সাধ্যস্য' – এই সমাস অনুসারে নিষ্পন্ন। এইরূপ সমাস করলে 'সাধ্যাধিকরণানধিকরণত্বের' অর্থ দাঁড়ায় যার অধিকরণ সাধ্যের অনধিকরণ। যার অধিকরণ সাধ্যের অনধিকরণ এই ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' অনুমিতির স্থলে জলাদি হয় সেই সকল পদার্থ যাদের অধিকরণ বহ্নির অনধিকরণ। কারণ জল থাকে হ্রদে যা বহ্নির অধিকরণ নয়। এবার যার অধিকরণ সাধ্যের অনধিকরণ সেই জলাদি পদার্থ তাদের অন্তর্গত যে ধর্ম অর্থাৎ তত্ত্বাদি তার অভাবই ব্যাপ্তি হয়ে দাঁড়ায়। এই লক্ষণ কিন্তু 'সাধ্যাসামানাধিকরণ্যাভাব' এইরূপ লক্ষণে পর্যবসিত। কেননা যার অধিকরণ সাধ্যের অসমানাধিকরণ তা বাস্তবে সাধ্যের অসমানাধিকরণ্যই হয়। আর সামানাধিকরণ্য হয় তার ভাব বা তত্ত্ব। তার অভাব হয়ে দাঁড়ায় 'সাধ্যসামানাধিকরণ্যাভাব'। এইভাবে 'সাধ্যানধিকরণানধিকরণত্ব' বর্ণনাটি 'সাধ্যাসামানাধিকরণ্যাভাব' এই প্রথম লক্ষণের সঙ্গে সমার্থক।

'সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যানধিকরণত্ব' এই দ্বিতীয় লক্ষণের অর্থ হেতুতে সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যের অধিকরণত্বের অভাব। এখানেও সংক্ষেপে সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যের অভাবকে ব্যাপ্তি বললেই চলে। এর অতিরিক্ত বৈয়ধিকরণ্যের অধিকরণত্ব বলার কোনো প্রয়োজন থাকে না। এইভাবে দ্বিতীয় লক্ষণটির (শেষের অধিকরণাত্বংশই বাদ দিলে) সাধ্যানধিকরণ বৃত্তিত্বের অভাব এইরূপ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং সাধ্যানধিকরণানধিকরণত্ব এইরূপ দুটি লক্ষণের যে সারার্থ গঙ্গেশ করেছেন দ্বিতীয় লক্ষণটি তার সঙ্গে সমার্থক হয়ে যায়। 'সাধ্যানধিকরণং নিরূপকতয়া অধিকরণং যস্য' - এরূপ বিগ্রহে সাধ্যের অনধিকরণ যার অর্থাৎ যন্নিষ্ঠ (জলাদিনিষ্ঠ) আধেয়ত্বের নিরূপক,

সেরূপ জলাদিকে বুঝতে হবে। এরূপ বৃত্তি হবে সাধ্যানধিকরণে বৃত্তি জলাদি, এর সঙ্গে 'ত্ব' প্রত্যয়ের অর্থের অন্বয় করলে সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যকে বোঝাবে। এরূপ সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যের অভাবই ব্যাপ্তি।

এইভাবে 'সিংহ-ব্যাঘ্র' লক্ষণদ্বয়ের উপর মনোনিবেশ করলে ইহা বোধগম্য হয় যে দুটি লক্ষণই সাধ্যানধিকরণত্ব ঘটিত। ফলে 'সাধ্যানধিকরণ্যানধিকরণত্ব' কিংবা 'সাধ্যবৈয়-ধিকরণ্যানধিকরণত্ব' উভয় ক্ষেত্রেই সাধ্যানধিকরণ বৃত্তিত্বের অভাব ব্যাপ্তি লক্ষণের নিকৃষ্ট অর্থ হয়। প্রথম ক্ষেত্রে সাধ্যানধিকরণের অর্থ সাধ্যাভাববদ্। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সাধ্যানধিকরণের অর্থ সাধ্যবদ্ভিন্ন। প্রথমটি গ্রহণ করলে সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিত্বাভাব ব্যাপ্তি বলে গণ্য হয়। দ্বিতীয়টি মানলে সাধ্যবদ্ভিন্নাবৃত্তিত্বই ব্যাপ্তি হবে। দুটিরই অর্থ এক। শুধু প্রথম লক্ষণটি যেখানে অত্যন্তাভাব ঘটিত সেখানে দ্বিতীয়টি অন্যোন্যাভাব ঘটিত।

এই দুটি লক্ষণ যে ব্যর্থ তা স্পষ্ট করতে গঙ্গেশ বলেছেন "চ অসিদ্ধম্" এখানে তত্র শব্দের দ্বারা ব্যাপ্তিপঞ্চকে উল্লিখিত কেবলান্বয়ীসাধ্যক স্থলকে বোঝাতে চেয়েছেন মণিকার। বিষয় এই যেভাবেই আমরা লক্ষণ দুটিকে ব্যাখ্যা করিনা কেন কেবলান্বয়ীসাধ্যক স্থলে সাধ্যাভাব অপ্রসিদ্ধ হওয়ায় দুটি ক্ষেত্রেই অব্যাপ্তি অনিবার্য। 'সাধ্যাভাববদ্' কিংবা 'সাধ্যবদ্ভিন্ন' দুটিই কেবলান্বয়ীসাধ্যক স্থলে অপ্রসিদ্ধ। যেখানে সাধ্যটি কেবলান্বয়ী সেখানে সাধ্যাভাবের অধিকরণ বা সাধ্যাভাববদ কোনো পদার্থই হতে পারেনা। একইভাবে, যেখানে সকল পদার্থই সাধ্যবদ সেখানে সাধ্যবদ্ভিন্ন বলে আর কিছু থাকে না। ফলে 'সাধ্যাভাববদ্বৃত্তিত্বাভাব' কিংবা 'সাধ্যবদ্ভিন্নাবৃত্তিত্ব' কোনো লক্ষণই সিদ্ধ হতে পারে না।

‘ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ’– পূর্বকথিত এই কেবলান্বয়ীসাধ্যক স্থলটিতে বিবেচনা করলে এই আপত্তির যথার্থতা উপলব্ধি হবে। এখানে বাচ্যত্ব সাধ্য এবং জ্ঞেয়ত্ব হেতু। সকল কিছুই বাচ্য বা অভিধেয় হওয়ায় এখানে সাধ্যাভাববদ্ বা বাচ্যত্বাভাববদ্ কোন পদার্থই না থাকাই সাধ্যাভাববদ্ নিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাব সিদ্ধ হয় না। ঠিক এরূপ সমস্যা ব্যাপ্তির পঞ্চলক্ষণের অন্তর্গত ‘সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম’ এর ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছিল। পক্ষান্তরে, বাচ্যত্ব যেহেতু জাগতিক সকল পদার্থের সাধর্ম তাই নিখিল জাগতিক পদার্থ হল বাচ্যত্ববৎ বা সাধ্যবৎ। তদ্ভিন্ন বা সাধ্যবদন্য বলে আর কিছুই থাকতে পারে না। ফলে ওই সাধ্যবদ্ভিন্নে বৃত্তিত্ব, অবৃত্তিত্ব কোনোটিই সম্ভব হয় না। এই সমস্যা পঞ্চলক্ষণের অন্তর্গত সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বম এই চতুর্থ লক্ষণটির ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছিল।

এখানে একটি সমাধান প্রস্তাবিত হতে পারে। বলা যেতে পারে যদি পূর্ব লক্ষণের যৎকিঞ্চিৎ সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বাভাব এইরূপ অর্থ করা হয় তাহলে কেবলান্বয়ীসাধ্যক স্থলে সাধ্যাভাবের অপ্রসিদ্ধি হয় না, বরং তা প্রসিদ্ধই হয়। কেননা বিশিষ্টাভাব, উভয়াভাবাদি অর্থে ওই অভাবকে গ্রহণ করলে যৎকিঞ্চিৎ সাধ্যের অভাব কেবলান্বয়ী স্থলেও প্রসিদ্ধ হয়। একইভাবে, দ্বিতীয় লক্ষণেরও যদি যৎকিঞ্চিৎ সাধ্যবদ্ভিন্নাবৃত্তিত্ব এইরূপ অর্থ করা হয় তাহলে কেবলান্বয়ীসাধ্যক স্থলে যৎকিঞ্চিৎ সাধ্যবদ যে সকল পদার্থ তাদের ভেদবৎ প্রসিদ্ধ হওয়ায় এইভাবে এই লক্ষণেরও কেবলান্বয়ীসাধ্যক স্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কার মোকাবিলা করা যেতে পারে।

কিন্তু এইরূপ সমাধানের দ্বারা লক্ষণদ্বয়ের যুক্তিযুক্ততা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। কারণ এইরূপ সমাধান দ্বারা কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতির স্থলে অব্যাপ্তির অভিযোগ থেকে রেহায়

মিললেও ‘বহ্নিমান্ ধূমাৎ’ ইত্যাদি অন্বয়ব্যতিরেক অনুমিতির ক্ষেত্রে লক্ষণের অব্যাপ্তি আসন্ন হয়। কারণ যৎকিঞ্চিৎ সাধ্যের অভাববিশিষ্টকে সাধ্যভাববৎ এর অর্থ করলে পর্বতীয় বহ্নির অভাববৎ হবে মহানসাদি। ওই মহানসাদিতে হেতু ধূম উপস্থিত থাকায় সাধ্যাভাববৎ নিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাব আর হেতুতে পাওয়া যাবে না। এভাবে অব্যাপ্তি অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে। একইভাবে সাধ্যবদ্ভিন্ন বলতে যদি কিঞ্চিৎ সাধ্যবদ্ভিন্ন অর্থ করা হয় তাহলে কিঞ্চিৎ সাধ্যবৎ হবে পর্বত। তদ্ভিন্নত্ব মহানসে থাকে এবং তথায় ধূম বৃত্তি হওয়ায় সাধ্যবদ্ভিন্নাবৃত্তিত্ব আর ধূমে পাওয়া যায় না। এভাবে সিংহ-ব্যাঘ্র লক্ষণদ্বয় রক্ষার অন্তিম চেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন অভাব-ঘটিত চতুর্দশ লক্ষণ বিচার

'অব্যভিচরিতত্ব' পদের প্রতিপাদ্য যে পঞ্চ লক্ষণের পরিচয় আমরা পেয়েছি তাদের বিরুদ্ধে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের চূড়ান্ত আপত্তি হল এই, ওই লক্ষণগুলির কোনোটিই কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতি স্থলে প্রযুক্ত (কেবলান্বয়ী অভাবাৎ) হয় না। এই প্রসঙ্গে 'ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ' অনুমিতির স্থলটি উল্লেখ করা হয়েছে। বাচ্যত্ব সাধ্যক এই অনুমিতির ক্ষেত্রে প্রতিটি ব্যাপ্তি লক্ষণের অব্যাপ্তি অনিবার্য হয়ে পড়ে কেননা বাচ্যত্ব সর্ব পদার্থ সাধারণ ধর্ম হওয়ায় তা কেবলান্বয়ী। এমতাবস্থায় সাধ্যাভাববৎ অর্থাৎ বাচ্যত্বাভাববৎ কোন অধিকরণ যেমন সিদ্ধ হতে পারে না তেমনই বাচ্যত্ববদ্ভিন্ন বাচ্যত্বাভাববৎ, বাচ্যত্ববৎ প্রতিযোগিক অন্যোন্যাভাববৎ, সকল বাচ্যত্বাভাববৎনিষ্ঠ কিংবা বাচ্যত্ববদন্য পদার্থ প্রসিদ্ধ হতে পারে না। ফলস্বরূপ আলোচ্য অনুমিতিতে ব্যাপ্তির কোন লক্ষণেরই সমন্বয় হয় না। অব্যভিচরিতত্ব ব্যাপ্তি লক্ষণে এই সমস্যা উপলব্ধি করে পণ্ডিত সৌন্দড় উপাধ্যায় কথিত অনুমিতির স্থলটিতে লক্ষণের সমন্বয় প্রদর্শনে তৎপর হন। প্রথমত ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন অভাবকে স্বীকার করে তিনি দেখান যে অব্যভিচরিতত্ব পদপ্রতিপাদ্য ব্যাপ্তির প্রথম লক্ষণ কেবলান্বয়ীসাধ্যক উল্লিখিত অনুমিতির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে। দ্বিতীয়ত, এই পঞ্চ লক্ষণের অতিরিক্ত ব্যাপ্তির স্বতন্ত্র দুটি লক্ষণের উপন্যাস করেন যেগুলি তাঁর মতে দোষ শূন্য। সৌন্দড়ের এই ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা যেমন এই অধ্যায়ের অন্যতম আলোচ্য হবে তেমনই গঙ্গেশ উপাধ্যায় ঠিক কী যুক্তিতে এই লক্ষণগুলি বর্জন করেন তার বিশ্লেষণও অধ্যায়টির অন্যতম উপজীব্য বিষয় হবে।

৬.১ ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন অভাবের পরিচয়

সৌন্দড় কীভাবে বাচ্যত্ব সাধ্যক অনুমিতিটির ক্ষেত্রে সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব এই ব্যাপ্তি লক্ষণের সমন্বয় ঘটান তা উপলব্ধি করতে গেলে যে ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবের বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছেন সেই অভাবের পরিচয় দিতে হয়। প্রথমে ব্যধিকরণধর্ম বলতে ঠিক কী বোঝায় তার পরিচয় দেওয়া দরকার। ব্যধিকরণ কথার অর্থ হল অসমানাধিকরণ। তুল্য বা সমান অধিকরণে যারা বর্তমান তাদের বলা হয় সমানাধিকরণ। যেমন ধূম ও বহ্নি মহানস, চত্বর ইত্যাদি সমান অধিকরণে বিদ্যমান। যারা এইরকম একই অধিকরণে বৃত্তি নয় তাদের বলা হয় অসমানাধিকরণ। যেমন মনুষ্যত্ব ও পশুত্ব কখনই একই অধিকরণে বর্তমান থাকে না তাই বহ্নি যেখানে ধূম সমানাধিকরণ সেখানে মনুষ্যত্ব হল পশুত্ব অসমানাধিকরণ বা পশুত্ব ব্যধিকরণ।

এবার দেখা যাক ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন অভাব বলতে কী বোঝায়। ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক যে অভাব অর্থাৎ যে অভাবের প্রতিযোগী ব্যধিকরণ ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন তাই হল ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন অভাব। যেকোনও অভাবের ক্ষেত্রে যে অধিকরণে ওই অভাব থাকে তাকে বলে অভাবের অনুযোগী আর যে পদার্থের অভাব তাকে বলে প্রতিযোগী। অভাব মাত্রই তাই প্রতিযোগিতাক বা প্রতিযোগির দ্বারা নিরূপিত অভাব। যেমন- ঘটের অভাব হল ঘট প্রতিযোগিকঅভাব। এখন যে ধর্ম অভাবের প্রতিযোগিতে থাকে না তা হল প্রতিযোগিতার ব্যধিকরণধর্ম। যেমন- ‘পটত্বেন ঘটোনাস্তি’ এখানে যার নাস্তিত্ব বা অভাব ব্যক্ত হয়েছে সেই প্রতিযোগী হল ঘট; যার ধর্ম হল ঘটত্ব। কিন্তু পটত্ব কদাপি ঘটে থাকে না তাই পটত্ব হল ঘটের ব্যধিকরণধর্ম। সেই কারণে অভাবটি ঘটের প্রতিযোগিক হলেও তা ঘটত্বাবচ্ছিন্ন

প্রতিযোগিতাক অভাব নয় বরং পটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব। এরূপ অভাবই ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব।

এইরকম ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন অভাবের উদ্ভাবক সৌন্দড় উপাধ্যায় এবং সেই সঙ্গে কোনো কোনো আচার্য ওইরূপ অভাবকে সমর্থনও করে থাকেন। সৌন্দড় মতে এইরূপ অভাবের বিষয়ে প্রত্যক্ষই প্রমাণ। তিনি মনে করেন 'ঘটত্বেন পটোনাস্তি' ইত্যাদি আকারে ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবের প্রতীতি অনুভব সিদ্ধ। এইরূপ অভাবের একটি অদ্ভূত বৈশিষ্ট্য হল জগতের সকল পদার্থেই এইরূপ অভাব থাকে। যেমন- 'ঘটত্বেন পটোনাস্তি' এখানে অভাবটি শুধু যে পটের অধিকরণে থাকে তাই নয় এমনকি ঘটের অধিকরণেও থাকে। কারণ পটের অধিকরণে পট থাকে পটত্ব ধর্ম পুরস্কারে; ঘটত্ব ধর্ম-পুরস্কারে তা কোন অধিকরণেই প্রসিদ্ধ নয়। এইভাবে পটের অধিকরণ অনধিকরণ সাধারণ বলে এরূপ অভাব হল কেবলান্বয়ী। বস্তুত ঘটত্বাবচ্ছিন্ন পট বলে কিছু হয় না অর্থাৎ ঘটত্বাবচ্ছিন্ন পট অপ্রসিদ্ধ। সেই কারণে ওইরূপ ঘটত্বাবচ্ছিন্ন পট প্রতিযোগিক অভাব সর্বত্র সিদ্ধ।

৬.২ তাদৃশ অভাব স্বীকারে কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতির স্থলে লক্ষণ সমন্বয়

এখন দেখা যাক এইরকম ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবের সম্ভাবনাকে স্বীকার করলে অব্যভিচরিতত্ব পদপ্রতিপাদ্য সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্ এই প্রথম লক্ষণটির নির্দোষত্ব কীভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়। এখানে মনে রাখা দরকার 'ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ' এরূপ কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতির ক্ষেত্রে সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্ ইত্যাদি লক্ষণ পঞ্চের অব্যাপ্তি প্রদর্শন করা হয়েছিল এই যুক্তিতে যে ওইরূপ অনুমিতির ক্ষেত্রে সাধ্যাভাবই অপ্রসিদ্ধ। ফলে সাধ্যাভাববৎ নিরূপিত অবৃত্তিত্বাদি হেতুতে সিদ্ধ হতে পারে না। কিন্তু ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন

অভাবের সম্ভাবনাকে স্বীকার করলে সাধ্যাভাবটি আর অপ্রসিদ্ধ থাকবে না। একথা ঠিক যে বাচ্যত্ব জাগতিক সকল পদার্থেই বর্তমান হওয়ায় তার অভাব সাধারণভাবে সিদ্ধ নয়। কিন্তু সমবায়িতয়া বাচ্যত্বাভাব অসম্ভব নয়। কারণ সমবায়িত্ব বাচ্যত্বের ব্যধিকরণধর্ম হওয়ায় সমবায়িত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক বাচ্যত্ব প্রতিযোগিক যে অভাব তা কেবলান্বয়ী হয়। বিষয়টি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা করা প্রয়োজন। প্রথমেই বলা দরকার যে সমবায়িত্ব বলতে বোঝায় সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তিত্ব। যে সকল পদার্থ সমবায় সম্বন্ধে কোন অধিকরণে বিদ্যমান থাকে তাদের বলা হয় সমবায়ী; এদের ধর্মই সমবায়িত্ব। যেমন- দ্রব্যাদি পঞ্চ পদার্থের স্বাধর্ম হল সমবায়িত্ব।[১] কারণ সাবয়ব দ্রব্য মাত্রই তৎ তৎ অবয়বে সমবায় সম্বন্ধে থাকে; একইভাবে গুণ, কর্ম সমবায় সম্বন্ধে থাকে তাদের আশ্রয় দ্রব্যে। সামান্য আবার দ্রব্য, গুণ, কর্ম তিনটিতেই সমবেত হতে পারে। পঞ্চম পদার্থ বিশেষ নিত্য দ্রব্য সমবেত হয়। সুতরাং সমবায়িত্ব দ্রব্য থেকে বিশেষ সকল পদার্থের ধর্ম কিন্তু তা বাচ্যত্বে অবৃত্তি ধর্ম। কারণ বাচ্যত্ব জাতি বা সামান্য নয়; বরং উপাধি যা তার আশ্রয়ে স্বরূপ সম্বন্ধে থাকতে পারে। এখানে বাচ্যত্ব বলতে কী বোঝায় তা স্পষ্ট করা দরকার। বাচ্যত্ব হল "অস্মাচ্ছব্দাদয়মর্থো বোধব্য ইতীশ্বরেচ্ছাবিষয়ত্বং পদার্থান্তরং বা বাচ্যত্বম্, নতু তাদৃশেচ্ছামাত্রম্"।'[২] এইরূপ ঈশ্বর ইচ্ছা বিষয়ত্ব। এই বিষয়ত্ব বিষয়ে স্বরূপ সম্বন্ধেই থাকে এবং তা থাকে বাচ্যত্বত্ব ধর্ম পুরস্কারে। কিন্তু সমবায়িত্ব তার ব্যধিকরণধর্ম। সুতরাং সমবায়িত্বধর্মাবচ্ছিন্নবাচ্যত্বপ্রতিযোগিকঅভাব একটি ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নঅভাব। এই অভাবের প্রতিযোগী বাচ্যত্ব, বাচ্যত্বত্ব তার বিশেষণ, সমবায়িত্ব তার প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্মবিশিষ্ট প্রতিযোগির সঙ্গে অভাবের

---

[১] "দ্রব্যাদয়ঃ পঞ্চভাবা অনেকে সম্বায়িনঃ" *ভাষাপরিচ্ছেদ* - ১৪।

[২] স্বামী শ্রীরামপ্রপন্নাচার্যঃ, *জাগদীশীব্যধিকরণম্*, ২০০৩, পৃষ্ঠা- ৫।

স্বাভাবিক বিরোধ। প্রথমটি, যে অধিকরণে থাকে সেখানে দ্বিতীয়টি থাকতে পারে না। এখন প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট প্রতিযোগিটি এখানে অপ্রসিদ্ধ কারণ সমবায়িত্বাবচ্ছিন্ন বাচ্যত্ব সম্ভব নয়। সুতরাং তার অভাব অর্থাৎ সমবায়িত্বাবচ্ছিন্ন বাচ্যত্বের অভাব সর্বত্র প্রসিদ্ধ। ঘটাদি যাবতীয় পদার্থ তার অধিকরণ হতে পারে। ফলে পূর্বে কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতির ক্ষেত্রে সাধ্যাভাবের যে অপ্রসিদ্ধি দাবি করা হয়েছে তা সঠিক বলা যায় না। এইভাবে উত্থাপিত আপত্তি থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব বলে সৌন্দড় মনে করেন।

৬.৩ সৌন্দড়ীয় ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে মণিকারের আপত্তি

'অব্যভিচরিতত্ব' ব্যাপ্তি লক্ষণের সমর্থনে সৌন্দড়াচার্যের এরূপ ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন অভাবের কল্পনা সম্বন্ধে গঙ্গেশ উপাধ্যায় যে অবহিত ছিলেন তা তার পূর্বপক্ষ বিস্তার থেকেই স্পষ্ট – "অথেদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাদিত্যত্র সমবায়িতয়া বাচ্যত্বাভাবোঘট এব প্রসিদ্ধঃ, ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকাভাবস্য কেবলান্বয়িত্বাৎ"।[৩] তবে পূর্বপক্ষের এই আত্মপক্ষ সমর্থন যে মণিকারকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি তা স্পষ্ট হয়ে যায় যখন তিনি বলেন কেবলান্বয়ী ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন অভাবকে কেবলান্বয়ী বলে মেনে নিলে যে কোন হেতুর অধিকরণে সাধ্যাভাব উপলব্ধ হবে ফলে লক্ষ্যাপ্রসিদ্ধি দোষ দেখা দেবে। বিষয়টি ব্যাখ্যার পূর্বে একথা বলা দরকার যদিও সৌন্দড় এবং তাঁর কোন কোন অনুগামী ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন অভাব স্বীকার করেন। গঙ্গেশ ওইরূপ অভাবকে মান্যতা দেননি। ঠিক কী কারণে ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন অভাবকে তিনি বর্জন করেন তা ব্যাখ্যার পূর্বে ওইরূপ অভাব স্বীকার করলে এবং সাধ্যাভাবকে কেবলান্বয়ী বললে কীভাবে সমস্যা দেখা দেয় তার পরিচয় দেওয়া যাক। 'ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ'

---

[৩] শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, *তত্ত্বচিন্তামণি*, ২০১০, পৃষ্ঠা- ৫৩।

এরূপ ক্ষেত্রে সাধ্যাভাব হল বাচ্যত্বাভাব। এখন যদি একে বাচ্যত্বত্বাবচ্ছিন্ন অভাব না ধরে সমবায়িত্বাবচ্ছিন্ন বাচ্যত্বাভাব হিসাবে ধরা হয় তাহলে সেই অভাব কেবলান্বয়ী বা সর্বত্র স্থায়ী হবে। ফলে যেকোনো হেতুর অধিকরণে ওই সাধ্যাভাব থাকতে কোনো বাধা থাকে না। এইভাবে সাধ্যাভাবের অধিকরণে হেতু থাকায় যেকোনো হেতু যেকোনো সাধ্যের ব্যভিচারী হয়ে পড়ে; অথচ ব্যভিচারী হেতু কখনই ব্যাপ্তি লক্ষণের লক্ষ্য হতে পারে না। বরং ব্যভিচারী হেতু মাত্রই ব্যাপ্তি লক্ষণের অলক্ষ্য। এমতাবস্থায় অব্যভিচারী হেতু বলে আর কিছুই থাকে না। ফলস্বরূপ ব্যাপ্তি লক্ষণের লক্ষ্য বলেই কিছু থাকে না। সুতরাং সৌন্দড় সিদ্ধান্ত মেনে নিলে ব্যাপ্তি লক্ষণের লক্ষ্যাপ্রসিদ্ধি দোষ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

৬.৪ সৌন্দড় অনুসরণে আপত্তি নিরসনের চেষ্টা

লক্ষ্যাপ্রসিদ্ধির এই আশঙ্কা সিদ্ধান্তী ও পূর্বপক্ষী কেউই সমর্থন করেন না। সুতরাং এরূপ আশঙ্কা নিরসন করা সৌন্দড়পন্থীদেরও কর্তব্য। তাই ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন অভাবকে স্বীকার করলেও তারা ব্যভিচারী হেতুর চিরাচরিত লক্ষটিকেই গ্রহণ করেন। চিরাচরিত লক্ষণ অনুসারে সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বই ব্যভিচারিত্ব অর্থাৎ সাধ্যের অভাবের অধিকরণে যে হেতু বর্তমান থাকে তাই ব্যভিচার। কিন্তু এখানে সাধ্যাভাব বলতে যেকোনোও রূপে সাধ্যের অভাব বুঝলে চলবে না বা সাধ্যের ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবকে বুঝলেও চলবে না। বরং সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক সাধ্যের যে অভাব তাকে সাধ্যাভাব পদে গ্রহণ করতে হবে (ওইরূপ সাধ্যাভাবের অধিকরণে যে হেতু বর্তমান একমাত্র তাই প্রকৃত অর্থে ব্যভিচারী বলে গণ্য)। আলোচ্য ক্ষেত্রে, সাধ্যতাবচ্ছেদক হল বাচ্যত্বত্ব, ওই বাচ্যত্বত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক বাচ্যত্বের যে অভাব তাই এক্ষেত্রে সাধ্যাভাব। ওই সাধ্যাভাব কিন্তু ঘটাদি

পদার্থে থাকে না কারণ বাচ্যত্বত্বাবচ্ছিন্ন বাচ্যত্বই ঘটাদিতে থাকে। ফলে ঘট আর সাধ্যাভাববৎ হয় না। সুতরাং জ্ঞায়ত্ব ঘটাদি বৃত্তি হলেও তা সাধ্যাভাববদবৃত্তি হয় না। এভাবে হেতু মাত্রের ব্যভিচারিত্বের যে আশঙ্কা ব্যক্ত হয়েছে তা অমূলক হয়ে দাঁড়ায়। পূর্বপক্ষীর এই সিদ্ধান্ত গঙ্গেশ প্রকাশ করেছেন এইভাবে – "নচৈবং ঘট এব ব্যভিচারঃ, সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতা-কাভাববদ্বৃত্তিত্বং হি ব্যভিচারঃ, ন চ বাচ্যত্বাভাবস্তাদৃশোঘটে ইতি চেৎ"।[৪]

এইভাবে সৌন্দড়পন্থীরা যদি হেতু মাত্রের ব্যভিচারিত্বের আশঙ্কা দূর করতে সমর্থ হনও তথাপি প্রশ্ন থেকে যায় যে লক্ষণকে রক্ষার স্বার্থে তারা ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবের ধারণাটি অবতারণা করেছেন সেই উদ্দেশ্য কি আদৌ সিদ্ধ হয়? কেননা 'ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ' এরূপ অনুমিতির স্থলে সমবায় সম্বন্ধে বাচ্যত্বাভাব হল সাধ্যাভাব। এই সাধ্যাভাবের অধিকরণ হল ঘটাদি পদার্থ তাতে জ্ঞেয়ত্ব হেতু থাকে এবং সেই কারণে হেতুতে সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাব থাকে না। এমতাবস্থায় পঞ্চ লক্ষণের অন্যতম যে প্রথম লক্ষণ সেই সাধ্যাবদবৃত্তিত্ব বা সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাব লক্ষণটি আর রক্ষিত হয় না (যেহেতু বাচ্যত্বাভাবের অধিকরণ ঘটাদি নিরূপিত বৃত্তিত্বই জ্ঞায়ত্বে থাকে)। তাই কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতির স্থলে উক্ত লক্ষণ সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবের কল্পনা যারা করেন সেই সৌন্দড়পন্থীদের "অথ ইদং বাচ্যং" ইত্যাদি আশঙ্কা তাদের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়ে।

এই অসামঞ্জস্য দূর করার লক্ষ্যে সৌন্দড়পন্থীরা একটি উপায় অবলম্বন করেন। তাঁরা বলেন সাধ্যাভাব নিরূপণের ক্ষেত্রে যেমন ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবের

[৪] তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৩।

ধারণাটি প্রয়োগ করা হয়েছে সেইরূপ সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব নির্ধারণের সময়ও ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবের ধারণাটিকেই প্রয়োগ করা হবে। আলোচ্য স্থলে সাধ্যাভাবাদিকরণ ঘটাদি। সেই ঘটাদিতে অবৃত্তিত্ব বা ঘটাদি নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবটিকে হেতুতাবচ্ছেদক ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব হিসাবে তা ঘটত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব হয়। কিন্তু গুণত্ব বা সত্তাকে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম হিসাবে ধরলে তা হয়ে দাঁড়ায় গুণত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক ঘটাভাব। এখানে গুণত্ব ঘটের ব্যধিকরণধর্ম হওয়ায় সাধ্যাভাবাধিকরণ ঘট নিরূপিত অভাবটি ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন অভাব রূপে সর্বত্র সিদ্ধ হয়। ফলে হেতু জ্ঞায়ত্বে এই অভাবকে রাখা যায় এবং লক্ষণ সমন্বয় হয়।

ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবের ধারণাকে সাধ্যাভাব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার পাশাপাশি যদি ওই একই অভাবকে সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাব নিরূপণের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তাহলে অন্য সমস্যার আর্বিভাব হয়। সেক্ষেত্রে ‘ধূমবান্ বহ্নেঃ’ এইরূপ অসদ্ধেতুক অনুমিতিতে লক্ষণের সমন্বয় প্রসক্ত হয়ে পড়ে। কারণ সাধ্য ধূমের অভাবের অধিকরণ যে অয়োগোলক তা নিরূপিত বৃত্তিত্বই বহ্নিতে থাকে বলে আমাদের জানা। কিন্তু অয়োগোলক নিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাবটিকে যদি ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব হিসাবে গ্রহণ করার স্বাধীনতা থাকে তাহলে এইরূপ অভাব সর্বত্র সিদ্ধ হবে। এমনকি হেতু বহ্নিভেদ ওই অভাবে পাওয়া যাবে। ফলে ধূমাভাবাধিকরণ অয়োগোলকাদি নিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাব বহ্নিতে লব্ধ হওয়ায় অসদ্ধেতুতে লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যায়। এভাবে অব্যাপ্তি দূর করতে গিয়ে অতিব্যাপ্তির আবাহন ঘটে যায়।

এরূপ অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা এড়াতে গিয়ে সৌন্দড় অনুগামীরা একটি পথ নেন। তাঁরা দাবি করেন যে জাতীয় অভাবকে সাধ্যাভাব নিরূপণের সময় মানা হবে বৃত্তিত্বাভাব নিরূপণের সময়ও সেই একই জাতীয় অভাবের কথা বলতে হবে। এখানে তাঁরা দুই জাতীয় অভাবের কথা বলেন - ১) সমানাধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব এবং ২) ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব। সাধ্যভাব নিরূপণের সময় যদি সমানাধিকরণ ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব গ্রহণ করা হয় তাহলে বৃত্তিত্বাভাব নিরূপণের ক্ষেত্রেও একই ধারা অনুসরণ কর্তব্য। একইভাবে যদি ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব হিসাবে সাধ্যবৎকে ধরা হয় তবে বৃত্তিত্বাভাব ধরার সময় সেই একই জাতীয় অভাবকে গ্রহণ করতে হবে। এখন ব্যাপ্তির লক্ষণটির মধ্যে যেহেতু সাধ্যাভাব ও বৃত্তিত্বাভাব দুটিই অন্তর্ভূক্ত হয়েছে তাই লক্ষণটির পরিমার্জন ঘটিয়ে বলতে হবে- "সাধ্যাভাব স্বজাতীয় সাধ্যাভাবাধিকরণনিরূপিত বৃত্তিত্বাভাববত্ত্ব ব্যাপ্তি"। এইভাবে ব্যাপ্তির লক্ষণটির সংস্কার সাধন করলে আর 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' স্থলে অতিব্যাপ্তির সম্ভাবনা থাকে না। কারণ সেখানে সাধ্যাভাবটিকে সমানাধিকরণ ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব হিসাবে ধরে বৃত্তিত্বাভাবটি ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব হিসাবে ধরা হয়েছিল। যদি সাধ্যাভাবের মতো বৃত্তিত্বাভাবটি সমানাধিকরণ ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব ধরা হয় তাহলে অয়োগোলক নিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাব হেতু বহ্নিতে আর পাওয়া যাবে না। ফলে 'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' স্থলে ব্যাপ্তি লক্ষণের সমন্বয়ের সমস্যা তিরোহিত হয়।

৬.৫ প্রমেয়সাধ্যক অনুমিতির স্থলে অব্যাপ্তির আশঙ্কা ও তার পরিহার

ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক ভাববাদীদের বিরুদ্ধে একটি গুরুতর আপত্তি করা যেতে পারে। বলা যেতে পারে তাঁরা যে ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবের কথা বলেন সেই অভাব সর্বত্র সিদ্ধ নয়। 'ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ' এরূপ যে দৃষ্টান্তের কথা তাঁরা বলেন সেখানে সমবায়িত্বেন বাচ্যত্বাভাব ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা দ্বারা নিরূপিত অভাব হতে পারে; কিন্তু সাধ্যটি যেক্ষেত্রে প্রমেয় হয় সেক্ষেত্রে এরূপ ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব সম্ভব হয় কী? এখানে বলা দরকার যা কোথাও বৃত্তি হয় না তাকে কখনই ধর্ম বলা যায় না। আর যা কিছু ধর্ম হয় তা কোথাও না কোথাও বৃত্তি হয়। যে অধিকরণে একটি ধর্ম বৃত্তি হয় সেই অধিকরণটিও প্রমেয়ই হয়। নিখিল জাগতিক পদার্থ প্রমা জ্ঞানের বিষয় হিসাবে প্রমেয়। কাজেই ধর্ম মাত্রই প্রমেয় বৃত্তি। প্রমেয়ে অবৃত্তি কোনো ধর্মই নেই। এমতাবস্থায় ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক প্রমেয়াভাব অপ্রসিদ্ধ হয়ে পড়ে। সুতরাং যেখানে প্রমেয়টি সাধ্য হয় সেই প্রমেয়সাধ্যক অনুমিতির হেতুটি যদি সন্দেতুক হয় তাহলে সেখানে আলোচ্য লক্ষণের অব্যাপ্তি হতে বাধ্য। এই সমস্যার কিরূপ সমাধান হতে পারে তার দিক নির্দেশ মণিকার করেননি। তবে দীধিতিকার রঘুনাথ শিরোমণি এই সমস্যার একটি সমাধানের ইঙ্গিত করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন 'গগনত্বেন প্রমেয়াভাব'কে এখানে সাধ্যাভাব হিসাবে সিদ্ধ করা যায়। একথা ঠিক যে গগনত্ব অন্যান্য ধর্মের মতোই প্রমেয়ে অবৃত্তি নয়। তা সত্ত্বেও গগনত্বেন প্রমেয়াভাব ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবের মতোই কেবলান্বয়ী বা সর্বত্র স্থায়ী। কারণ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট প্রতিযোগীর সঙ্গে অভাবের একটি বিরোধ আছে অর্থাৎ ওইরূপ প্রতিযোগীর যা অধিকরণ নয় সেখানে ওই অভাব থাকে। আলোচ্য ক্ষেত্রে

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট যে প্রতিযোগী তা হল গগন। এই গগন অবৃত্তি পদার্থ হওয়ায় কোনও কিছু তার অধিকরণ হয় না। আর তাই উল্লিখিত অভাবটি সর্বত্র থাকে। কাজেই প্রমেয়সাধ্যক অনুমিতির স্থলে সাধ্যাভাব সিদ্ধ নয় এমন আপত্তি আর টেকে না। একইভাবে বলা যায় ঘটত্ব ও পটত্ব দুটিই প্রমেয়বৃত্তি হলেও ঘটত্ব-পটত্ব কোনো প্রমেয়েই থাকে না। তাই এরূপ বিরুদ্ধ ধর্ম বিশিষ্ট কোনো প্রমেয় হতে পারে না। ওইরূপ উভয়ধর্মবিশিষ্ট প্রমেয় কোথাও হয় না বলে ওই উভয়ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক যে প্রমেয়াভাব তা সর্বত্রই থাকে। সুতরাং 'ঘটত্বপটত্বোভয়াভ্যাং প্রমেয়ং নাস্তি' এই প্রকারের সাধ্যাভাবও সিদ্ধ করা যায়।

উল্লিখিত উপায়ে প্রমেয়সাধ্যক সদ্ধেতুক অনুমিতির ক্ষেত্রে অব্যাপ্তির আশঙ্কা হয়তো দূর হতে পারে কিন্তু এমন কিছু স্থল আছে যেখানে অব্যাপ্তির আশঙ্কা থেকেই যায়। যারা ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব স্বীকার করেন তাঁদের দৃষ্টিতে ব্যভিচার বলতে বোঝায় সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বকে। পক্ষান্তরে অব্যভিচার বলতে তাঁরা বোঝেন ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বকে। এখন ব্যভিচার জ্ঞান যে ব্যাপ্তি জ্ঞানের বাধক হয়ে অনুমিতির বাধক হয় তা সর্বজনবিদিত। কাজেই ব্যাপ্তি ও ব্যভিচারের মধ্যে বিরুদ্ধতা অবশ্যই থাকবে। এখানে মনে রাখা দরকার যারা সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বকে ব্যাপ্তি হিসাবে গণ্য করেন তাঁদের মতে ব্যাপ্তি আসলে অব্যভিচার। এই অব্যভিচারই সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব ইত্যাদি পঞ্চবিধ রূপ লাভ করেছে। এমতাবস্থায় অব্যভিচার যে সব অর্থকে নির্দেশ করে তাদেরই ব্যাপ্তি বলতে হয়। এখানে অব্যভিচার শব্দটির অর্থ স্পষ্ট করা দরকার। এটি একটি সমাসবদ্ধ পদ যা 'ন ব্যভিচারঃ অব্যভিচারঃ' এইভাবে 'নঞ' তৎপুরুষ সমাস যোগে নিষ্পন্ন এবং এর দ্বারা ব্যভিচারাভাবই বিবক্ষিত। এই ব্যাঞ্জনা

গ্রহণ করলে যেমন সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বকে ব্যভিচার বলা হয় সেরকম সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বের অভাবই ব্যাপ্তিরূপে গ্রাহ্য। এমতাবস্থায় সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বকে যদি ব্যভিচারের স্বরূপ হিসাবে মানা হয় তাহলে তাদৃশ সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বের অভাবই ব্যাপ্তি হিসাবে গণ্য হবে। কিন্তু সমস্যা হল সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব যদি ব্যভিচার হিসাবে গণ্য হয় তাহলে ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বাভাবকে আর ব্যাপ্তি বলা যাবে না। কারণ ওইরূপ ব্যাপ্তি যেমন ব্যভিচারাভাব নয় তেমনই ব্যভিচার বিরুদ্ধও নয়। এক্ষেত্রে 'ন ব্যভিচারঃ অব্যভিচারঃ' – এই ব্যাখ্যা মেনে নিলে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বাভাবকে ব্যাপ্তি বলতে হয়। এই পরিস্থিতিতে 'ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ' ইত্যাদি অনুমিতির স্থলে অব্যাপ্তির সম্ভাবনা অব্যাহতই থেকে যায়। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে অব্যভিচার পদপ্রতিপাদ্য ব্যাপ্তির যে লক্ষণগুলিকে সমর্থন করতে গিয়ে ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবের কল্পনা সেই লক্ষণগুলির অদুষ্টতা প্রমাণের প্রয়াস ব্যর্থই হয়। কাজেই ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাববাদীদের বিচারেও সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বাদি ব্যাপ্তি হতে পারে না বলে স্বীকার করতে হয়। আর ঠিক এই যুক্তিতেই মণিকার গঙ্গেশ ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবের কল্পনা যে একটি নিরর্থক কল্পনা তা প্রকাশ করেছেন এইভাবে- "প্রতিযোগ্যবৃত্তিশ্চ ধর্ম্মো ন প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকঃ"।[৫]

[৫] তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৪।

৬.৬ 'অব্যভিচার' শব্দের রঘুনাথকৃত ব্যাখ্যা এবং পূর্বপক্ষী সম্মত চতুর্দশ লক্ষণের বিস্তার

এইভাবে 'অব্যভিচার' শব্দের একটি বিশেষ অর্থের কল্পনা পূর্বক সেই অর্থের সঙ্গে ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবের ধারণার অসঙ্গতি প্রদর্শন পূর্বক ওইরূপ অভাবের কল্পনাকে নিরর্থক বলে দাবি করা খুব একটা যুক্তিযুক্ত বলে দীধিতিকার মনে করেন না। কারণ এখানে অব্যভিচার কথার নানা রূপ অর্থ হতে পারে। রঘুনাথ 'অব্যভিচার' অভিধাটির নানাবিধ পারিভাষিক অর্থের উল্লেখ করেছেন, যে অর্থগুলি কোনো না কোনো সম্প্রদায় দ্বারা অনুমোদিত। একমাত্র ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবকে মেনে নিলেই এই সকল অর্থে অব্যভিচার ব্যাপ্তি হিসাবে গণ্য হতে পারে। ব্যধিকরণ গ্রন্থে দীধিতি টীকায় 'অব্যভিচার' পদের যে সব অর্থ আলোচিত হয়েছে সেগুলির মধ্যে প্রথম দুটি হল– ১) "যৎসমানাধিকরণাঃ সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নব্যাপকতাবচ্ছেদকপ্রতিযোগিতাকা যাবন্তোহভাবাঃ প্রতিযোগিসমানা-ধিকরণাস্তত্ত্বম্"[৬], ২) যৎ সামনাধিকরণানাং সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নব্যপকতা-বচ্ছেদকরূপাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকানাং যাবদভাবানাং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসামানা-ধিকরণ্যং তত্ত্বম্"।[৭] এই অর্থ দুটি মূলত সৌন্দড়ের অভিমত বলে মনে করা হয়। একে একে 'অব্যভিচার' কথাটির ওই দুই অর্থ ব্যাখ্যা করা যাক।

৬.৬.১ 'অব্যভিচার' পদের সৌন্দড়ীয় অর্থ ও রঘুনাথ কল্পিত ব্যাপ্তির দ্বিবিধ লক্ষণ

উপরিউক্ত লক্ষণদ্বয়ের অর্থ একে একে স্পষ্ট করা যাক -

---

[৬] শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, *তত্ত্বচিন্তামণি দিধিতি-বিবৃত্তি*, ১৯১০, পৃষ্ঠা- ৩০৫।

[৭] তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৪৮।

প্রথম লক্ষণঃ

"যৎসমানাধিকরণাঃ সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নব্যাপকতাবচ্ছেদকপ্রতিযোগিতাকা যাবন্তোহভাবাঃ প্রতিযোগিসমানাধিকরণাস্তত্ত্বম্"- এই লক্ষণটিতে 'যৎ' শব্দটির দ্বারা হেতু বিবক্ষিত। 'যৎ সমানাধি-করণ' অর্থাৎ হেতু সমানাধিকরণ। হেতুর সমানাধিকরণে বর্তমান যতগুলি অভাবের প্রতি-যোগিতা সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপকতার অবচ্ছেদক হয় ওই সকল অভাব যদি আপন আপন প্রতিযোগীর সমানাধিকরণ হয় অর্থাৎ নিজের প্রতিযোগীর অধিকরণে বৃত্তি হয় তাহলে হেতু সাধ্যের ব্যাপ্য হয়।

'বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এই স্থলে ধূম হল হেতু তার অধিকরণ পর্বতাদিতে থাকে ঘটত্ব পুরস্কারে বহ্নির অভাব, পটত্ব পুরস্কারে বহ্নির অভাব ইত্যাদি। ওইসব অভাবের বহ্নিনিষ্ঠ প্রতিযোগিতা বহ্নিত্বাবচ্ছিন্ন বহ্নির ব্যাপকতার অবচ্ছেদক হয়। কারণ বহ্নির অধিকরণে কোথাও ওই অভাবের প্রতিযোগী বহ্নির অভাব না থাকায় ওই অভাবের প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদক এবং ওই সকল অভাবই তাদের প্রতিযোগী বহ্নির অধিকরণে বিদ্যমান। কাজেই ধূম বহ্নির ব্যাপই হয়। সুতরাং এখানে অব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না। একইভাবে 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' স্থলে বহ্নি হল হেতু। ওই হেতু বহ্নির অধিকরণ তপ্ত অয়োগোলকে বর্তমান অয়োগোলকভেদাভাবের অয়োগোলকভেদনিষ্ঠ প্রতিযোগীত্ব ধূমত্বাবচ্ছিন্ন ধূমের ব্যাপকতাবচ্ছেদক। কারণ ধূমের অধিকরণ কোথাও অয়োগোলকভেদাভাবের প্রতিযোগী অয়োগোলকভেদ থাকে না। কাজেই দেখা যাচ্ছে এই অভাব নিজের প্রতিযোগী অয়োগোলকভেদের অধিকরণেই থাকে না। অতএব হেতু সমানাধিকরণ যে অভাবের

প্রতিযোগিত্ব সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন ব্যাপকতার অবচ্ছেদক হয় ওইসকল অভাবের নিজ প্রতিযোগির সমানাধিকরণ না হওয়ার কারণে বহ্নি ধূমের ব্যাপ্য নয়।

'বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ' এই অনুমিতির স্থলেও জ্ঞেয়ত্বের সমানাধিকরণ 'সমবায় সম্বন্ধে বাচ্যত্বের অভাব', 'ঘটত্বাদি পুরস্কারে বাচ্যত্বের অভাব' ইত্যাদি প্রতীতির দ্বারা সিদ্ধ অভাবগুলি বাচ্যত্বনিষ্ঠ প্রতিযোগিত্ব বাচ্যত্বত্বাবচ্ছিন্ন বাচ্যত্বের ব্যাপকতার অবচ্ছেদক হয়। কোনো বাচ্যত্বাধিকরণে ওই অভাবগুলির প্রতিযোগীর অভাব না থাকায় ওই অভাবগুলির প্রতিযোগী ব্যাপক আর প্রতিযোগিত্ব হল সাধ্য ব্যাপকতার অবচ্ছেদক এবং ওই সব অভাবই নিজের প্রতিযোগী বাচ্যত্বের অধিকরণে থাকে অতএব জ্ঞায়ত্ব বাচ্যত্বের ব্যাপ্যই হয়।

দ্বিতীয় লক্ষণঃ

"যৎ সামনাধিকরণানাং সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নব্যপকতাবচ্ছেদকরূপাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকা-নাং যাবদভাবানাং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসামানাধিকরণ্যং তত্ত্বম্"। এখানে যৎ পদের দ্বারা হেতুকে বুঝতে হবে। 'যৎ সমনাধিকরণানাং' অর্থাৎ সেই হেতুর অধিকরণ সমূহে বিদ্যমান। ওই হেত্বধিকরণে বিদ্যমান যে অভাবের প্রতিযোগিতা সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের ব্যাপকতাবচ্ছেদক রূপাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ ব্যাপকতাবচ্ছেদক ধর্মাবচ্ছিন্ন। তাদৃশ অর্থাৎ সেইরূপ যাবতীয় ভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবচ্ছিন্নের সমানাধিকরণই হল ব্যাপ্তি। এখানে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের ব্যাপকতাবচ্ছেদক কথার অর্থ যে ধর্মাবচ্ছিন্নের অভাব সাধ্যের অধিকরণে থাকে না, সেই প্রকার ধর্ম। এইরূপ ধর্ম যেমন সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্ম হয় তেমনই সাধ্যতাবচ্ছেদকের ব্যাপকতাবচ্ছেদক ধর্মও হয়। যেক্ষেত্রে হেতুটি সৎ হয় সেক্ষেত্রে হেতুর অধিকরণে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন সাধ্য যেমন উপস্থিত থাকে তেমনই ওই সাধ্যতাবচ্ছেদকের

ব্যাপকীভূত ধর্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন যা কিছু সেগুলিও উপস্থিত থাকে। কারণ হেতুকে বিচারে রাখলে সাধ্য যেমন তার ব্যাপক হয় তেমনই সাধ্যটি যার ব্যাপ্য তাও হেতুর ব্যাপকই হয়। ধূম হেতুর ক্ষেত্রে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন যে সাধ্য তা হল বহ্নি তেমনই ওই সাধ্যতাবচ্ছেকের ব্যাপকীভূত ধর্মাবচ্ছিন্ন হল দ্রব্য। ধূম যেখানে হেতু সেখানে বহ্নি যেমন তার ব্যাপক হয় তেমনই দ্রব্যও তার ব্যাপক হয়। অতএব হেতুর অধিকরণে সাধ্যের ব্যাপকীভূত যেমন থাকে তেমনই সাধ্য ব্যাপক যা তাও থাকে। অতএব হেতুর অধিকরণে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের ন্যায় সাধ্যব্যাপকতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন নিয়ত উপস্থিত থাকায় তদবচ্ছিন্নের সামানাধিকরণ ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক যে অভাব তা থাকে না। যদি ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন অভাবকে সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্মপুরস্কারে কিংবা সাধ্যতাবচ্ছেদক ব্যাকপকীভূত ধর্ম-পুরস্কারে গ্রহণ করা হয় তাহলে সাধ্যাতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নব্যাপকতাবচ্ছেদকরূপাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব হেতু সমানাধিকরণ হতে পারে। সুতরাং এই লক্ষণ ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব স্থলে সমন্বিত হতে পারে।

'বহ্নিবান্ ধূমাৎ' দৃষ্টান্তটি বিবেচনা করা যাক। এখানে সাধ্যতাবচ্ছেদক বহ্নিত্বের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বহ্নির ব্যাপকতাবচ্ছেদক যে সকল ধর্ম হতে পারে তাদের মধ্যে রয়েছে বহ্নিত্ব, তেজত্ব, দ্রব্যত্ব ইত্যাদি। কারণ এই ধর্মগুলির দ্বারা অবচ্ছিন্নের অভাব বহ্নির অধিকরণে থাকে না। আবার অন্যদিকে ওই ধর্মগুলির দ্বারা অবচ্ছিন্ন সকল বস্তুই ধূমের অধিকরণে বর্তমান থেকে ধূমের ব্যাপক হয়ে থাকে। আর সে কারণে বহ্নিত্ব ধর্ম-পুরস্কারে ঘটাভাব, তেজত্ব ধর্ম-পুরস্কারে ঘটাভাব বা দ্রব্যত্ব ধর্ম-পুরস্কারে গুণাভাব এইভাবে যদি ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন অভাব গ্রহণ করা হয় তাহলে এই অভাবগুলি কেবলান্বয়ী হওয়ায় হেতুর অধিকরণেও তারা বর্তমান

থাকে। 'বহ্নিবান্ ধূমাৎ' স্থলে ওইসকল অভাব হেতুসমানাধিকরণ সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন ব্যাপকতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব হয়ে দাঁড়ায়। এদের প্রত্যেকটি আপন আপন প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের সঙ্গে সমানাধিকরণ হয়। উদাহরণ স্বরূপ 'বহ্নিত্ব ধর্ম-পুরস্কারে ঘটের অভাব' এই অভাবের প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক যে বহ্নিত্ব সেই বহ্নিত্ববিশিষ্ট বহ্নির অধিকরণ পর্বতে বর্তমান। এইভাবে সদ্ধেতু স্থলে ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক যাবতীয় অভাব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন সমানাধিকরণ হয়।

এইভাবে দেখলে যেখানেই অনুমানের হেতুটি সদ্ধেতু হয় সেখানেই হেতুর অধিকরণে সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন ব্যাপকতাবচ্ছেদক ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবরূপে সাধ্যতাবচ্ছেদক কিংবা তার ব্যাপক ধর্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব সকলে বর্তমান থাকে আর ওইরূপ সব অভাবই কেবলান্বয়ী। তাই তারা প্রতিযোগির অধিকরণে থাকতে পারে। তাই সকল সদ্ধেতুর স্থলেই লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যায়।

একইভাবে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে যে 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' এরূপ অসদ্ধেতুক স্থলেও অতিব্যাপ্তিরও কোনো সম্ভাবনা নেই। 'ধূমবান্ বহ্নেঃ' স্থলে হেতু হল বহ্নি। সেই বহ্নির অধিকরণ হিসাবে অয়োগোলককে ধরলে সেখানে 'ধূম নাস্তি' এইরকম সমানাধিকরণ ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব হয় হেতুর সমানাধিকরণ। ওই হেতু সমানাধিকরণ অভাব সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের ব্যাপকতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক যে সকল অভাব তাদের অন্তর্ভূক্ত হয়। অথচ সমানাধিকরণ ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের অধিকরণে থাকে না। ফলে অভাবটি আর প্রতিযোগিতা-

বচ্ছেদকাবচ্ছিন্নের সমানাধিকরণ হয় না। এইভাবে লক্ষণের সমন্বয় না হওয়ায় অতিব্যাপ্তির আশঙ্কা থাকে না।

এবার কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতি স্থলটির কথা বিবেচনা করা যাক। এখানে হেতু জ্ঞেয়ত্বের অধিকরণ হল সকল পদার্থ। তন্মধ্যে ঘটাদিতে বাচ্যত্বত্ব ধর্ম-পুরস্কারে পটত্বের যে অভাব তা রয়েছে। যেহেতু বাচ্যত্বত্ব ধর্ম-পুরস্কারে পটত্ব কোথাও থাকে না। এই অভাব ব্যভিচারধর্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকঅভাব। তাই কেবলান্বয়ী বা সর্বত্র স্থায়ী। ফলে ওই অভাব হেতু বাচ্যত্বের অধিকরণে থাকতে কোনো বাধা নেই। এই অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হল বাচ্যত্বত্ব তা সাধ্য বাচ্যত্বের ব্যাপকতাবচ্ছেদক। একইভাবে জ্ঞায়ত্ব ধর্ম-পুরস্কারে ঘটত্বাদির যে অভাব তা হেতু সমানাধিকরণ সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন ব্যাপকতাবচ্ছেদক ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব হয়। এই জাতীয় যাবতীয় অভাব ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব হওয়ায় প্রতিযোগী সমানাধিকরণও হবে। সুতরাং 'ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ' এই আকারের কেবলান্বয়ীসাধ্যক যাবতীয় হেতুতেই ব্যাপ্তি লক্ষণের সমন্বয় হয়। এইভাবে অব্যভিচার পদের পারিভাষিক অর্থ গ্রহণ করে সকল সদ্ধেতুতে লক্ষণের সমন্বয় ঘটান ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাববাদীরা।

৬.৬.২ শ্রীনাথ ভট্টাচার্য (চক্রবর্ত্তী) প্রদত্ত ব্যাপ্তির লক্ষণত্রয়

ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব ঘটিত যে সব লক্ষণের পরিচয় পাওয়া যায় তন্মধ্যে যেমন সৌন্দড় পণ্ডিত সম্মত 'অব্যভিচার' পদপ্রতিপাদ্য দুটি লক্ষণ রয়েছে তেমনই চক্রবর্ত্তী প্রমুখ আচার্যকৃত দ্বাদশ লক্ষণও রয়েছে। রঘুনাথ তার দীধিতিতে এই সকল লক্ষণের একটি সংকলন প্রদান করেছেন। এই দ্বাদশ লক্ষণের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে চক্রবর্ত্তী, প্রগল্‌ভ, মিশ্র

ও সার্ব্বভৌম প্রত্যেকের তিনটি করে লক্ষণ। একে একে ওই লক্ষণগুলির উপর আলোকপাত করা যাক।

প্রথমেই চক্রবর্ত্তী সম্মত তিনটি লক্ষণের উপর আলোকপাত করা যাক। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে চক্রবর্ত্তী এখানে একটি উপাধি মাত্র। পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতকে মিথিলায় ভট্টাচার্য পণ্ডিতদের এই উপাধি দেওয়া হত। এখানে এই চক্রবর্ত্তী উপাধিটি যার নামের বাচক তিনি আসলে শ্রীনাথ ভট্টাচার্য বলেই মনে করা হয়। যাইহোক চক্রবর্ত্তী সম্মত প্রথম লক্ষণটি হল— "ব্যাপ্যবৃত্তের্হেতুসমানাধিকরণসাধ্যাভাবস্য প্রতিযোগিতায়া অনবচ্ছেদকং যৎসাধ্যতাবচ্ছেদকং তদবচ্ছিন্নসামানাধিকরণ্যম্ ব্যাপ্তিঃ"[৮] অর্থাৎ যে সাধ্যতাবচ্ছেদকটি ব্যাপ্যবৃত্তি হেতু সমানাধিকরণ সাধ্যাভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক হয়, সেই সাধ্যতাবচ্ছেদকের দ্বারা অবচ্ছিন্ন সাধ্যের সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি। অন্য ভাষায় ব্যাপ্যবৃত্তি হেতু সমানাধিকরণ যে সাধ্যাভাব তার প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক থেকে ভিন্ন যে সাধ্যতাবচ্ছেদক, সেই সাধ্যতাবচ্ছেদকবিশিষ্টের সাথে সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি।

'বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ' এই স্থলে হেতু হল জ্ঞেয়ত্ব। সেই জ্ঞেয়ত্বের সমানাধিকরণ অভাব হল ঘটত্বাদি ধর্ম-পুরস্কারে বাচ্যত্বের অভাব। ওই প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক যে সাধ্যতা-বচ্ছেদক তা হল বাচ্যত্বত্ব। ওই বাচ্যত্বত্ব দ্বারা অবচ্ছিন্ন বাচ্যত্বের অধিকরণ ঘটাদিতে থাকার কারণে জ্ঞেয়ত্ব বাচ্যত্বের সমানাধিকরণ হয়। আর জ্ঞেয়ত্ব বাচ্যত্বের ব্যাপ্যই হয়।

---

[৮] তদেব, পৃষ্ঠা-৩৬০।

দ্বিতীয় লক্ষণঃ

"ব্যাপ্যবৃত্তের্হেতুসমানাধিকরণাভাবস্য প্রতিযোগিতায়াঃ সামানাধিকরণ্যেনানবচ্ছেদকং যৎসাধ্যতাবচ্ছেদকং তদবচ্ছিন্নসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ"[৯] অর্থাৎ ব্যাপ্যবৃত্তি হেতুর সামানাধিকরণ অভাবের প্রতিযোগিতার সামানাধিকরণ্য যুক্তের অনবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক তা দ্বারা অবচ্ছিন্নের সঙ্গে সামানাধিকরণ্যই ব্যাপ্তি।

'বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ' এই স্থলে ব্যাপ্যবৃত্তি হেতু সমানাধিকরণ সাধ্যাভাব হল ঘটত্ব ধর্ম-পুরস্কারে বাচ্যত্বের অভাব। ওই অভাবের প্রতিযোগিতার অনবচ্ছেদক যে সাধ্যতাবচ্ছেদক তা হল বাচ্যত্বত্ব। ওই সাধ্যতাবচ্ছেদকের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বাচ্যত্বের অধিকরণ ঘটাদিতে থাকার কারণে জ্ঞেয়ত্ব বাচ্যত্বের সমানাধিকরণ হয়। তাই জ্ঞেয়ত্ব বাচ্যত্বের ব্যাপই হয়।

তৃতীয় লক্ষণঃ

"হেতুসমানাধিকরণপ্রতিযোগিব্যাধিকরণাভাবপ্রতিযোগিতায়াঃ সামানাধিকরণ্যেনানবচ্ছেদকং যৎসাধ্যতাবচ্ছেদকং তদবচ্ছিন্নসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ"[১০] অর্থাৎ হেতুর সমানাধিকরণ প্রতিযোগী ব্যধিকরণাভাবের প্রতিযোগিতার সামানাধিকরণ যে অবচ্ছেদক, তা থেকে ভিন্ন যে সাধ্যতাবচ্ছেদক, সেই সাধ্যতাবচ্ছেদকের দ্বারা অবচ্ছিন্ন সাধ্যের অধিকরণে থাকাই ব্যাপ্তি।

---

[৯] তদেব, পৃষ্ঠা-৩৬০।

[১০] তদেব।

'বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ' এই স্থলে হেতুর অধিকরণে বিদ্যমান প্রতিযোগীর ব্যধিকরণাভাব হল বাচ্যত্বাভাব; এটি বাচ্যত্বাদি ধর্ম-পুরস্কারে ঘটাদির অভাব হবে না। কারণ বাচ্যত্বাভাব কোথাও প্রসিদ্ধ নয়। আর বাচ্যত্বত্ব ধর্ম-পুরস্কারে ঘটাদির অভাবের প্রতিযোগিতার সমানাধিকরণ অপ্রসিদ্ধ। অতএব হেতুর সমানাধিকরণ প্রতিযোগিতার ব্যধিকরণ অভাব ঘটাদির অভাবই হবে। ওই অভাবের প্রতিযোগিতার সমানাধিকরণ অবচ্ছেদক ঘটত্বাদি হতে ভিন্ন সাধ্যতাবচ্ছেদক বাচ্যত্বের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বাচ্যত্বের অধিকরণে থাকার কারণে জ্ঞেয়ত্ব বাচ্যত্বের ব্যাপ্যই হয়।

৬.৬.৩ প্রগল্‌ভ সম্মত ব্যাপ্তির ত্রিবিধ লক্ষণ

এই লক্ষণগুলি উপস্থাপনের পর রঘুনাথ প্রগল্‌ভকৃত তিনটি লক্ষণ পেশ করেছেন। এই তিনটি লক্ষণ একে একে উল্লেখ করা যাক –

প্রথম লক্ষণঃ

"সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণ্যাবচ্ছেদকস্বসমানাধিকরণসাধ্যাভাবত্বকত্ত্বম্"[১১]-

এই হল প্রথম লক্ষণ। এই লক্ষণ মধ্যবর্তী 'স্বসমানাধিকরণ' কথাটির অর্থ হেতুসমানাধিকরণ অর্থাৎ সম্পূর্ণ লক্ষণটির অর্থ দাঁড়ায় এইরকম- হেতুর অধিকরণে বর্তমান সকল সাধ্যাভাব যদি সাধ্যতাবচ্ছেদক দ্বারা অবচ্ছিন্ন সাধ্যের অধিকরণে বর্তমান থাকে তাহলে সেই হেতু সাধ্যের ব্যাপ্য হয়। 'বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ' এই স্থলে জ্ঞেয়ত্ব হেতুর অধিকরণ ঘটাদিতে বর্তমান

[১১] তদেব, পৃষ্ঠা-৩৮৭।

বাচ্যত্বত্ব ধর্ম-পুরস্কারে ঘটাভাবাদি সবই সাধ্যাভাব। সাধ্যতাবচ্ছেদক বাচ্যত্বত্বের দ্বারা অবচ্ছিন্ন বাচ্যত্বের অধিকরণে বর্তমান থাকার কারণে জ্ঞেয়ত্ব বাচ্যত্বের ব্যাপ্যই হয়।

দ্বিতীয় লক্ষণঃ

প্রগল্‌ভকৃত দ্বিতীয় লক্ষণটি হল- "যৎসমানাধিকরণসাধ্যাভাবপ্রমায়াং সাধ্যবত্তাজ্ঞানপ্রতি-বন্ধকত্বং নাস্তি তত্ত্বম্"।[১২] এখানে 'যৎ' শব্দটি হেতুর বাচক। যৎ সমানাধিকরণের অর্থ হেতুর সমানাধিকরণ। এটি প্রমার বিশেষণ। যার নিহিতার্থ হল হেতুমৎ বিশেষ্যক। সুতরাং যা হেতুমৎ বিশেষ্যক অর্থাৎ প্রকৃতই হেতুমান্ সেই হেতুমানে সাধ্যাভাব বিষয়ক যতগুলি প্রমা সম্ভব ওই সকলে যদি সাধ্য প্রকারক জ্ঞানের প্রতিবন্ধকতার অভাব থাকে তাহলে বলা যায় হেতু সাধ্যের ব্যাপ্য।

'বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ' এই স্থলে হেতুমান্ ঘটাদিতে বাচ্যত্বত্ব ধর্ম-পুরস্কারে ঘটাদির অভাবরূপ সাধ্যাভাব বিষয়ক যতগুলি প্রমাজ্ঞান আছে ওই সকলে 'বাচ্যত্ববান্ ঘটাদিঃ' এই সাধ্য প্রকারক জ্ঞানে প্রতিবন্ধকতার অভাব আছে। কারণ সাধ্য বাচ্যত্বের সাথে বাচ্যত্বত্ব ধর্ম-পুরস্কারে ঘটাটির অভাবের কোনো বিরোধ নেই। অতএব এই লক্ষণ অনুসারেও জ্ঞেয়ত্ব বাচ্যত্বের ব্যাপ্যই হবে।

---

[১২] তদেব।

তৃতীয় লক্ষণঃ

তৃতীয় লক্ষণটি হল – "সাধ্যাভাববতি যদ্বৃত্তৌ প্রকৃতানুমিতিবিরোধিত্বং নাস্তি তত্ত্বম্"[১৩]। এখানে 'সাধ্যভাববতি' কথার অর্থ যা সাধ্যাভাববিশিষ্ট। 'যৎবৃত্তৌ' কথাটি যৎবৃত্তি কথা থেকে এসেছে। এখানে 'যৎ' হল হেতু আর 'যৎবৃত্তি' কথার অর্থ হল হেতুনিষ্ঠ বৃত্তিত্ব সামান্য। সুতরাং লক্ষণটির ফলিতার্থ দাঁড়ায় হেতুতে যতগুলি সাধ্যভাববৎ নিরূপিত বৃত্তিত্ব আছে সেই সকলে প্রকৃত অনুমিতির বিরোধিত্বের অভাব যদি থাকে তাহলে হেতু সাধ্যের ব্যাপ্য হয়।

'বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ' এখানে জ্ঞেয়ত্ব হেতুতে বাচ্যত্বত্ব ধর্ম-পুরস্কারে ঘটাভাববৎ নিরূপিত যতগুলি বৃত্তিত্ব আছে ওইসকলেই অনুমিতির (জ্ঞেয়ত্বের দ্বারা বাচ্যত্বের অনুমিতির) বিরোধিতার অভাব থাকায় জ্ঞেয়ত্ব বাচ্যত্বের ব্যাপ্যই হয়। বক্তব্য এই দাঁড়ায় হেতুতে সাধ্যাভাববৎ নিরূপিত বৃত্তিত্ব হল হেতুগত সাধ্যের ব্যভিচার। এই ব্যভিচারের জ্ঞান অনুমিতির জনক ব্যাপ্যর জ্ঞানবিরোধী হওয়ার কারণে প্রকৃত অনুমিতির বিরোধী হয়। 'বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ' এই স্থলে সাধ্যাসামান্যাভাবের অপ্রসিদ্ধি হওয়ায় হেতুনিষ্ঠ সাধ্যাভাববৎ নিরূপিত বৃত্তিত্বরূপে সাধ্যাসামান্যাভাববৎ নিরূপিত বৃত্তিত্ব পাওয়া যায় না, পরন্তু ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক সাধ্যাভাববৎ নিরূপিত বৃত্তিত্বই পাওয়া যায়। আর তা ব্যভিচার না হওয়ায় ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক জ্ঞানের বিষয় হয় না। এর সঙ্গে তাই প্রকৃত অনুমিতির বিরোধ নেই। অতএব জ্ঞেয়ত্বনিষ্ঠ সাধ্যাভাববৎ নিরূপিত বৃত্তিত্ব সামান্যে প্রকৃত অনুমিতির বিরোধিত্বের অভাব থাকায় প্রকৃত লক্ষণ অনুসারে জ্ঞায়ত্বে বাচ্যত্বের ব্যাপ্তি সহজেই সম্ভব হয়।

---

[১৩] তদেব, পৃষ্ঠা-৩৯১।

৬.৬.৪ পক্ষধর মিশ্র-কৃত ব্যাপ্তির লক্ষণ সমূহ

প্রগল্‌ভের এই লক্ষণগুলি উল্লেখের পর দীধিতিকার মিশ্রসম্মত সাজাত্য ঘটিত তিনটি লক্ষণের উল্লেখ করেছেন। এই মিশ্র ঠিক কোন মিশ্র সে ব্যাপারে বিতর্ক আছে। তবে লব্ধ তথ্যপ্রমাণ অনুযায়ী মনে করা হয় ইনি আসলে পক্ষধর মিশ্রই। যেহেতু মিশ্র প্রদত্ত লক্ষণগুলির মধ্যে সজাতীয়তার উল্লেখ আছে তাই এগুলিকে সাজাত্য ঘটিত লক্ষণ বলা হয়। এর মধ্যে তৃতীয় লক্ষণটি লঘু লক্ষণ হিসাবে পরিচিত। ওই লক্ষণগুলি নিম্নরূপ –

প্রথম লক্ষণঃ

সাজাত্য ঘটিত প্রথম লক্ষণটি হল– "যাবন্তঃ সাধ্যাভাবাঃ প্রত্যেকং তত্তৎসজাতীয়া যে তত্তদধিকরণবৃত্তিত্বাভাবস্তদ্বাত্তং তত্ত্বম্"[১৪] অর্থাৎ যতগুলি সাধ্যাভাব প্রত্যেকটি তার তার সজাতীয় যারা সেই সেই অধিকরণ বৃত্তিত্বের অভাব ইহাই তত্ত্ব অর্থাৎ যতগুলি সাধ্যাভাব সাধ্যব্যাপকতাবচ্ছেদক ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাব হয়, তাদের মধ্যে প্রত্যেকটি সেই সেই অভাবের সজাতীয় তৎ তৎ ভাবাধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বাভাবের আশ্রয় হওয়ায় ব্যাপ্তি।

'বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ' স্থলে যতগুলি সাধ্যাভাব সম্ভব তার মধ্যে বাচ্যত্বাভাব পড়ে না। কিন্তু বাচ্যত্বত্ব ধর্ম-পুরস্কারে ঘটাদির অভাব পড়ে। কারণ বাচ্যত্বত্ব ধর্ম-পুরস্কারে ঘটাদির অভাব ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব হওয়ায় তা সর্বত্র সিদ্ধ। অতএব এর স্বজাতীয় বাচ্যত্বত্ব ধর্ম-পুরস্কারে ঘটাদির অভাবের অধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বের ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন

[১৪] তদেব, পৃষ্ঠা- ৪০৪।

প্রতিযোগিতাক অভাব হবে। আর জ্ঞেয়ত্ব হেতুতে ওই অভাব থাকে। সুতরাং জ্ঞেয়ত্ব এই অনুমানের ব্যাপ্য হেতু হতে কোনো বাধা নেই।

দ্বিতীয় লক্ষণঃ

"যাবন্তস্তাদৃশাঃ সাধ্যাভাবাঃ প্রত্যেকং তেষাং সজাতীয়স্য ব্যাপকীভূতস্য ব্যাপ্যবৃত্তেরভাবস্য প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকেন ধর্ম্মেণ যদ্রূপাবচ্ছিন্নং প্রতি ব্যাপকত্বমবচ্ছিদ্যতে তদ্রূপবত্ত্বং তত্ত্বম্"[১৫] অর্থাৎ সাধ্যতাবচ্ছেদক রূপাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক যতগুলি অভাব আছে তাদের সাধ্যাভাব হিসেবে ধরলে ওই অভাবগুলির প্রত্যেকের সজাতীয় তথা ব্যাপক ও ব্যাপ্যবৃত্তি অভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম যে ধর্মাবচ্ছিন্নের ব্যাপকতাবচ্ছেদক হয় সেই রূপের অর্থাৎ সেই হেতুতাবচ্ছেদকের আশ্রয় হওয়ায় ব্যাপ্তি।

'বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ' এই স্থলে সাধ্যাভাব হল বাচ্যত্বত্ব ধর্ম-পুরস্কারে ঘটাভাব, পটাভাব ইত্যাদি। এদের মধ্যে প্রত্যেক অভাবের সজাতীয় অর্থাৎ ব্যাপক ও ব্যাপ্য বৃত্তি অভাব হল ওই ওই অভাব। এদের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম হল বাচ্যত্বত্ব। এই বাচ্যত্বত্ব হেতুতাবচ্ছেদক জ্ঞেয়ত্বত্ব দ্বারা অবচ্ছিন্ন জ্ঞেয়ত্বের ব্যাপকতাবচ্ছেদক। কাজেই জ্ঞেয়ত্বত্বের আশ্রয় যে জ্ঞেয়ত্ব তা বাচ্যত্বের ব্যাপ্যই হয়।

---

[১৫] তদেব, পৃষ্ঠা-৪২৭।

তৃতীয় লক্ষণঃ

"যাবন্তস্তাদৃশাঃ সাধ্যাভাবাঃ প্রত্যেকং তৎপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকেন ধর্ম্মেণ যদ্রূপাবচ্ছিন্নং প্রতি ব্যাপকত্বমবচ্ছিদ্যতে তদ্রূপবত্ত্বং বা তত্ত্বম্"[১৬] অর্থাৎ সাধ্যব্যাপকতাবচ্ছেদক ধর্ম দ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক যেসব অভাব থাকে তাদের যদি সাধ্যাভাব হিসেবে ধরা হয় তাহলে তাদের প্রত্যেকের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম যে ধর্ম দ্বারা অবচ্ছিন্নের ব্যপকতাবচ্ছেদক হয় সেই ধর্মের আশ্রয় হওয়ায় ব্যাপ্তি।

'বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ' এখানে বাচ্যত্বত্ব ধর্ম-পুরস্কারে ঘটাভাব, পটাভাব ইত্যাদি হল সাধ্যাভাব। এদের মধ্যে প্রত্যেকের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক বাচ্যত্বত্ব হল হেতুতাবচ্ছেদক জ্ঞেয়ত্বত্ব দ্বারা অবচ্ছিন্ন জ্ঞেয়ত্বের ব্যাপকতাবচ্ছেদক। কাজেই জ্ঞেয়ত্বত্বের আশ্রয় জ্ঞেয়ত্ব হল বাচ্যত্বের ব্যাপ্য।

৬.৬.৫ ব্যাপ্তির লক্ষণ নিরূপণে সার্ব্বভৌম

পক্ষধরকৃত এই ত্রিবিধ লক্ষণ উপস্থাপনের অনন্তর রঘুনাথ যে তিনটি অন্তিম লক্ষণ উপস্থাপন করেছেন সেগুলি বাসুদেব সার্ব্বভৌমের লক্ষণ হিসাবে পরিগণিত হয়। এই লক্ষণগুলিকে কূটাঘটিত লক্ষণও বলা হয়। লক্ষণ তিনটি একে একে পর্যালোচনা করা যাক–

[১৬] তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৩৬।

প্রথম লক্ষণঃ

"বৃত্তিমদ্বৃত্তয়ো যাবন্তঃ সাধ্যাভাবদ্বৃত্তিত্বাভাবাস্তদ্রূপত্বং ব্যাপ্তিঃ"[১৭] অর্থাৎ সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্বের যতগুলি অভাব হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধে বৃত্তিমান পদার্থে থাকে ওই সমস্তগুলির অভাব হওয়ায় ব্যাপ্তি। যেমন – 'পর্বতঃ বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এই অনুমিতির ক্ষেত্রটি বিবেচনা করা যাক। বৃত্তিমান্ বস্তুতে বর্তমান যাবতীয় সাধ্যাভাবাধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বের অভাবে বহ্নিত্ব ধর্ম-পুরস্কারে ঘটাভাববিশিষ্ট বৃত্তিত্বে ঘটত্ব ধর্ম-পুরস্কারে অভাবের সমাবেশ হওয়ায় এবং তা ধূমে বিদ্যমান থাকায় লক্ষণ সমন্বয় হয়।

দ্বিতীয় লক্ষণঃ

"বৃত্তিমদ্‌বৃত্তয়ো যাবন্তঃ সাধ্যাভাবসমুদায়াধিকরণবৃত্তিত্বাভাবাস্তদ্বত্ত্বম্"[১৮] অর্থাৎ সাধ্যাভাব সমুদায়ের অধিকরণ দ্বারা নিরূপিত হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিতার যতগুলি অভাব হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ দ্বারা বৃত্তিমানে বর্তমান হয় সেই সমস্তের আশ্রয় হওয়ায় ব্যাপ্তি। এখানে সাধ্যাভাব বলতে সাধ্যতাবচ্ছেদক সমনিয়ত প্রতিযোগিতাক অভাব বুঝতে হবে।

'বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ' এই স্থলে হেতুতাবচ্ছেদক স্বরূপ সম্বন্ধে বৃত্তিমান বাচ্যত্বাদিতে বর্তমান সাধ্যাভাবের সমুদায় অধিকরণ বৃত্তিত্বাভাবের মধ্যে ঘটত্বাদি রূপে বাচ্যত্বের অভাব সমুদায়ের অধিকরণ ঘটাদি দ্বারা নিরূপিত বৃত্তিত্বের সামান্যাভাব থাকে না। কারণ ঘটত্ব ধর্ম-পুরস্কারে বাচ্যত্বের অভাব সমুদায়ের অধিকরণের বৃত্তিত্বই প্রতিটি বৃত্তিমানে বর্তমান থাকে।

---

[১৭] তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৩৯।

[১৮] তদেব, পৃষ্ঠা- ৪৬০।

তৃতীয় লক্ষণঃ

"সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নব্যাপকতাবচ্ছেদকরূপাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকব্যাপ্যবৃত্তিস্বসমানাধিকরণ-যাবদভাবাধিকরণবৃত্তিত্বাভাবা যাবন্তো বৃত্তিমদ্বৃত্তয়স্তদ্বত্ত্বম্"[১৯]। এখানে স্ব-সমানাধিকরণের অর্থ হেতু সমানাধিকরণ। সাধ্যতাবচ্ছেকাবচ্ছিন্নের ব্যাপকতাবচ্ছেদকের দ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা নিরূপক যতগুলি অভাব হেতুসমানাধিকরণ ও ব্যাপ্য বৃত্তি হয় ওই সব অভাবের অধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বার যতগুলি অভাব বর্তমান থাকে ওই সকলের আশ্রয় হওয়ায় ব্যাপ্তি।

'বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ' এই স্থলে হেতু সমানাধিকরণ ব্যাপ্য-বৃত্তি, সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন ব্যাপকতার অবচ্ছেদক রূপাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতার নিরূপক অভাবের মধ্যে 'বাচ্যত্বত্ব ধর্ম-পুরস্কারে ঘটাভাব' 'বাচ্যত্বত্ব ধর্ম-পুরস্কারে পটাভাব' ইত্যাদি যতগুলি অভাব পড়ে, ওই সবগুলির অধিকরণ ঘটাদি নিরূপিত বৃত্তিত্বার বৃত্তিমদ্ বৃত্তি অভাব সকলের মধ্যে 'বাচ্যত্বত্ব পুরস্কারে ঘটাভাবাদি'র অধিকরণ ঘটাদি নিরূপিত বৃত্তিত্বের সামান্যাভাব পড়ে না। কারণ সব বৃত্তিমান অর্থাৎ অধিকরণে বাচ্যত্বত্ব পুরস্কারে ঘটাদির অভাবের অধিকরণ বৃত্তিত্ব থাকার কারণে এদের সামান্যাভাব কোনো বৃত্তিমানে বর্তমান থাকে না। তবে বৃত্তিত্বাভাব সমূহের মধ্যে বাচ্যত্বত্ব পুরস্কারে ঘটাদির অভাবের অধিকরণ নিরূপিত বৃত্তিত্বার ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন অভাবই পড়ে। আর জ্ঞেয়ত্ব তার আশ্রয় হওয়ার কারণে তা বাচ্যত্বের ব্যাপ্য হতে পারে না।

---

[১৯] তদেব, পৃষ্ঠা- ৫০১।

৬.৭ ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন অভাব-ঘটিত চতুর্দশ লক্ষণ খণ্ডন

সরাসরিভাবে এই চতুর্দশ ব্যাপ্তি লক্ষণের উল্লেখ বা খণ্ডন কোনোটিই গঙ্গেশ করেননি। এই লক্ষণগুলির বিস্তার মূলত রঘুনাথের রচনাতেই দৃষ্ট হয়। ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন অভাবের ধারণাটিকে মেনে নিলে 'অব্যভিচার' পদপ্রতিপাদ্য যে সকল লক্ষণ হতে পারে সেগুলির কেবল উল্লেখ করেছেন দীধিতিকার। তবে ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন অভাবের ধারণাকে অস্বীকার করলে যে এই চতুর্দশ লক্ষণের কোনোটিই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয় না সেকথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন রঘুনাথ।

এখন দেখা যাক কীভাবে ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবের ধারণাকে নস্যাৎ করেন গঙ্গেশ উপাধ্যায়। গঙ্গেশের যুক্তি এই যে ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবই সম্ভব নয়। কারণ প্রতিযোগির ব্যধিকরণধর্ম কখনই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক ধর্ম হতে পারে না। এ বিষয়ে গঙ্গেশের স্পষ্ট উক্তি "প্রতিযোগ্যবৃত্তিশ্চ ধর্ম ন প্রতিযোগিতা-বচ্ছেদকঃ"[২০] অর্থাৎ প্রতিযোগিতে অবৃত্তি যে ধর্ম তা প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হতে পারে না। যেমন ঘটাভাবের ক্ষেত্রে ঘট হল প্রতিযোগী; এই ঘটে যে ধর্ম থাকে না, যেমন– পটত্বাদি, তা ঘট প্রতিযোগিক অভাবের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হতে পারে না। ঘটত্ব যেহেতু ঘটে বিদ্যমান তাই ওই ঘটত্বই এক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হতে পারে, পটত্বাদি নয়। সহজকথায় যা প্রতিযোগির ধর্ম নয় তা প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয় না। এইভাবে প্রতিযোগিতা প্রতিযোগ্যবৃত্তি ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন না হওয়ায় বাচ্যত্বত্বের দ্বারা পটত্বের যে অভাবের কথা পূর্বপক্ষীরা বলেন তা সিদ্ধ হতে পারে না। কারণ এই অভাবের প্রতিযোগী

[২০] শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ, *তত্ত্বচিন্তামণি*, ২০১০, পৃষ্ঠা- ৫৪।

হল পটত্ব, তাতে পটতত্ব ধর্ম বর্তমান কিন্তু বাচ্যতত্ব ধর্মটি তাতে বিদ্যমান নয়। এমতাবস্থায় বাচ্যতত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক পটত্বাভাব সিদ্ধ হতে পারে না। একইভাবে সমবায় সম্বন্ধ পুরস্কারে বাচ্যত্বের যে অভাবের কথা পূর্বপক্ষীরা বলে থাকেন সেই অভাবও সিদ্ধ হয় না। কারণ এখানে প্রতিযোগী হল বাচ্যত্ব। তাতে সমবায় সম্বন্ধে কোনো কিছুই আধেয় হয় না। ফলে সমবায়িত্ব ধর্ম-পুরস্কারে যে বাচ্যত্ব তা সম্ভবই হয় না। ফলস্বরূপ সমবায়িত্বাবচ্ছিন্ন বাচ্যত্বাভাব প্রসিদ্ধ হয় না। এমনকি ঘটত্ব-পটত্ব উভয়ের দ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রমেয়াভাবও অসিদ্ধ হয়ে পড়ে। কারণ ওই অভাবের প্রতিযোগী কোনো প্রমেয়েই ঘটত্ব-পটত্ব উভয়ধর্মবৃত্তি হয় না। সকল পদার্থ প্রমেয় হওয়ায় ঘটত্বধর্ম বিদ্যমান থাকে এমন পদার্থ সম্ভব। কিন্তু ঘটত্ব-পটত্ব উভয়বৃত্তি হয় এরকম কোনো প্রমেয়ই সম্ভব নয়। কারণ ঘটত্ব ও পটত্ব বিরুদ্ধ ধর্ম; যেখানে ঘটত্ব থাকে সেখানে পটত্ব থাকে না এবং যেখানে পটত্ব থাকে সেখানে ঘটত্ব থাকে না। ফলে উভয় ধর্ম সকল প্রমেয়ে অবৃত্তি হওয়ায় তারা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হতে পারে না।

এখন প্রশ্ন হল প্রতিযোগিতে অবৃত্তি যে ধর্ম তা প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হতে বাধা কোথায়? একটু বিবেচনা করলেই এর উত্তর স্পষ্ট হবে। অভাবের জ্ঞান মাত্রই প্রতিযোগির জ্ঞানকে অপেক্ষা করে। এই প্রতিযোগী একটি ধর্ম-পুরস্কারে ও একটি সম্বন্ধ পুরস্কারে সিদ্ধ হয়। যেমন- ঘটাভাবের ক্ষেত্রে ঘট হল প্রতিযোগী। এই ঘট ঘটত্ব ধর্ম-পুরস্কারে এবং সংযোগসম্বন্ধ পুরস্কারে সিদ্ধ। তাই ঘটাভাবটি আসলে ঘটত্বাবচ্ছিন্ন সংযোগসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকঅভাব। যদি ওইধর্ম ও সম্বন্ধ পুরস্কারে প্রতিযোগীটি সিদ্ধ হয় তাহলে অভাবটি সিদ্ধ হয়, অন্যথায় অভাবটি সিদ্ধ হতে পারে না। এখন এই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকধর্ম বা

সম্বন্ধটি যদি অসিদ্ধ হয় তাহলে প্রতিযোগীটি অসিদ্ধ হয়ে পড়ে। কারণ বিশেষণ সিদ্ধ না হলে বিশিষ্ট সিদ্ধ হতে পারে না। ফলে বিশিষ্টাভাবটিও অপ্রসিদ্ধ হয়। একথাই স্পষ্ট হয়েছে মণিকারের ব্যাখ্যায়- ''তদ্বিশিষ্টজ্ঞানস্যাভাবধীহেতুত্বাৎ''।[২১] সহজকথায় যেহেতু প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট প্রতিযোগীর জ্ঞান অভাব বুদ্ধির প্রতি কারণ তাই ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন কোনো প্রতিযোগীই না থাকায় তার অভাব বুদ্ধি হতে পারে না। ন্যায় পরিভাষায় বলা যায় তদ্‌ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব বুদ্ধির প্রতি তদ্‌ধর্মবিশিষ্টের জ্ঞান কারণ হয়। সুতরাং 'ঘটত্বেন পটোনাস্তি' অর্থাৎ 'ঘটত্ব ধর্ম-পুরস্কারে পট নাই' – এরকম জ্ঞান সম্ভব নয়। কারণ ঘটত্ব ধর্ম-পুরস্কারে পটের জ্ঞান সম্ভব না হওয়ায় তদ্‌ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগির অভাবের জ্ঞানও সম্ভব নয়। কারণভাবে কার্যাভাব সর্বসম্মত। তদ্‌বিশিষ্টাভাবের জ্ঞানের ক্ষেত্রে তদ্‌বিশিষ্টের জ্ঞান কারণ হওয়ায় এবং সেই তদ্‌বিশিষ্ট বুদ্ধি সম্ভব না হওয়ায় বিশিষ্টাভাব বুদ্ধিও ব্যাহত হয়।

এখানে পূর্বপক্ষী অযথার্থ জ্ঞানের দৃষ্টান্ত ব্যবহার করে তদ্বিশিষ্ট বুদ্ধির অভাবেও তদ্‌বিশিষ্টাভাবের বুদ্ধি সম্ভব বলে দাবি করতে পারে। যেমন- পটে ঘটত্বের ভ্রমাত্মক জ্ঞান। ঘট-পটত্ব উভয়ধর্ম-পুরস্কারে প্রমেয়ের জ্ঞান, সমবায়িত্ব ধর্ম-পুরস্কারে বাচ্যত্বের জ্ঞান যথার্থ না হলেও ওইরূপ ভ্রমজ্ঞান সম্ভব। ফলে ভ্রমাত্মকবিশিষ্ট বুদ্ধি হতে বিশিষ্টাভাবের বুদ্ধি অসম্ভব নয়। এরূপ পূর্বপক্ষের সমাধানে বলা যায় যেখানে বিশিষ্টবুদ্ধিটি ভ্রমাত্মক হয়, সেখানে অভাব বুদ্ধিটিও ভ্রমাত্মক হয়। ঘটে পটত্বের ভ্রমাত্মক জ্ঞানের সম্ভাবনা যদি স্বীকার করা হয় তাহলে ঘটে পটত্বের অভাবের জ্ঞানটিও ভ্রম বলে মেনে নিতে হয়। আর ভ্রমের দ্বারা কোনো বস্তুই

---

[২১] তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৪।

প্রমাণিত হতে পারে না। আরও কথা ঘটে পটত্বের ভ্রমে বা পটে ঘটত্বের ভ্রমের অনন্তর যে অভাব বুদ্ধি উৎপন্ন বুদ্ধি উৎপন্ন হয় তা 'ঘটত্বেন পটোনাস্তি' বা 'পটত্বেন ঘটোনাস্তি' এই আকারের হয় না। কারণ প্রথম ক্ষেত্রে পটত্ববিশিষ্ট পট এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ঘটত্ববিশিষ্ট ঘট অভাবাংশে বিশেষণ হয়। কিন্তু তারা অভাবাংশে প্রকার হতে পারে না। কারণ প্রকার কেবল জ্ঞানের ক্ষেত্রেই থাকে আর আলোচ্য ক্ষেত্রগুলিতে পটত্ববিশিষ্ট পট বা ঘটত্ববিশিষ্ট ঘট পূর্ব জ্ঞানের বিষয় নয়। তাই ওইরকম ভ্রমবুদ্ধির ক্ষেত্রে যে অভাবের জ্ঞান হয় তার আকার বড় জোর 'ঘটো নাস্তি' বা 'পটো নাস্তি' হতে পারে। সুতরাং ওই বুদ্ধিগুলিতে ঘটাভারূপে পটাভাব বা পটাভারূপে ঘটাভাব বিষয় হবে। সুতরাং 'ঘটত্বেন পটোনাস্তি' বা 'পটত্বেন ঘটোনাস্তি' এরকম যেসব আকারে অভাবের কথা ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকাভাববাদীরা বলেন তা কার্যত সম্ভব হয় না।

এই পরিস্থিতিতে 'তৎবিশিষ্টাভাব বুদ্ধির প্রতি তৎবিশিষ্টের জ্ঞান কারণ'– এই নিয়মকেই অস্বীকার করতে পারেন পূর্বপক্ষী। তিনি বলতে পারেন তৎধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা অভাববুদ্ধির প্রতি তৎ ধর্মবিশিষ্ট প্রতিযোগীর জ্ঞান কারণ। এইরূপ স্বীকার করে নিলে ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকা অভাব অপ্রসিদ্ধ হয় একথা ঠিকই কিন্তু ওইরূপ কার্যকারণভাব স্বীকারেরে প্রয়োজন কী? ওই নিয়মকে অস্বীকার করলে ঠিক কি সমস্যা দেখা দেবে তা গঙ্গেশ ইঙ্গিত করেছেন এইভাবে– ''অন্যথা নির্বিকল্পাদপি ঘটোনাস্তীতি প্রতীত্যাপত্তেঃ''[২২] অর্থাৎ উক্ত নিয়মের অন্যথা হলে নির্বিকল্পক থেকেও 'ঘট নেই' এইরূপ প্রতীতির আপত্তি হবে। তাৎপর্য এই যে কোনো অভাব বুদ্ধির প্রতি

[২২] তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৫।

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট প্রতিযোগীর জ্ঞানই কারণ হয়, এই নিয়ম সর্বজনসম্মত একটি নিয়ম। এর অন্যথা ঘটালে জ্ঞানের কোনো শৃঙ্খলা থাকে না। যেকোনো জ্ঞান হতেই অভাব বুদ্ধির আপত্তি হয়। ঘট ঘটত্ব বিষয়ক যে নির্বিকল্পক জ্ঞান তা থেকেও 'ঘটো নাস্তি' এরকম জ্ঞানের সম্ভাবনা স্বীকার করতে হয়। আর একবার এই অনিয়ম প্রশ্রয় দিলে যে কোনো বিষয় হতেই যে কোনো অভাব বুদ্ধির উৎপত্তি মেনে নিতে হয়। যেমন সম্মুখস্ত ভূতলে অনন্ত বস্তুর অভাব বর্তমান রয়েছে; যার মধ্যে ঘট, পট, গো, মেষাদি নানা বিষয়ের অভাব রয়েছে। তাই বলে একটি নির্দিষ্ট সময়ে যাবৎ অভাবের প্রত্যক্ষ আমাদের হয় না। একটি অভাবের প্রত্যক্ষে যে ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ অপেক্ষিত হয় সেই সন্নিকর্ষটি উপস্থিত থাকলে ওই অধিকরণ অর্থাৎ ভূতলে উপস্থিত যাবতীয় অভাবের সন্নিকর্ষ উপস্থিত থাকে। যেমন ঘটাভাবের ঘটক সন্নিকর্ষ হল সংযুক্ত বিশেষণতা। ওই একই সন্নিকর্ষ গো-মেষাদিরও অভাব প্রত্যক্ষের ঘটক হতে পারে। তাই যখন ওই সংযুক্ত বিশেষণতা উপস্থিত থাকে তখন ঘটাভাব, পটাভাব, গো-মেষাদির অভাব ইত্যাদি সকল অভাবেরই প্রত্যক্ষ হওয়ার কথা অথচ বাস্তবে তা হয় না। কাল বিশেষে একটি বিশেষ অভাবের প্রত্যক্ষই আমাদের হয়। এই সময় বিশেষে অভাব বিশেষের প্রত্যক্ষকে ব্যাখ্যা করতে গেলে মেনে নিতে হয় যে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট প্রতিযোগিতার বুদ্ধি উপস্থিত থাকে। সেই প্রতিযোগীর অভাবেরই প্রত্যক্ষ হয়। ভূতলে যদি ঘট থাকত তাহলে সেই ঘটের প্রত্যক্ষ হত। এই বুদ্ধি সময় বিশেষে উপস্থিত থাকে বলেই ঘটের অভাবের প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়। অতএব সাধারণভাবে এই কথা বলা চলে যে ধর্মীতে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট প্রতিযোগীর বুদ্ধি উপস্থিত থাকে সেই ধর্মীতে সেই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট প্রতিযোগীর অভাবের প্রত্যক্ষ হয়। তৎবিশিষ্টাভাবের জ্ঞানে

তৎবিশিষ্টের জ্ঞান কারণ হয়– এটা মেনে নিলেই কদাচিৎ কালে কদাচিৎ অভাবই কদাচিৎ কালে কদাচিৎ অভাবের প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যা সম্ভব হয়। তাই ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবের প্রত্যক্ষ কখনই হতে পারে না। প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকবিশিষ্ট প্রতিযোগীর জ্ঞান যা অভাব প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ– তা ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবের ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। আর ওইরূপ অভাবের জ্ঞান অন্য কোনো প্রমাণের দ্বারা হতে পারে না। এই সকল যুক্তির মাধ্যমে গঙ্গেশ উপাধ্যায় ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকঅভাবের সম্ভাবনা নস্যাৎ করেছেন।

ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাকঅভাবের প্রত্যক্ষ হয় না– গঙ্গেশের এই দাবি সৌন্দড়পন্থীরা অস্বীকার করতে পারেন। ওইরূপ অভাবের প্রত্যক্ষ যে হয় তার সমর্থনে দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করতে গিয়ে তারা গোতে শশশৃঙ্গের অভাবের কথা বলতে পারেন। 'গোতে শশশৃঙ্গ নাই' – এই ধরনের অভাবের প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে। এই অভাবের ধর্মী বা অধিকরণ হল গো। অন্যদিকে এই অভাবের প্রতিযোগী হল শৃঙ্গ; আর প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক শশসম্বন্ধ অর্থাৎ কিনা শশসম্বন্ধবিশিষ্ট যে শৃঙ্গ গোতে তারই অভাবের জ্ঞান হচ্ছে এখানে। এই ক্ষেত্রে প্রতিযোগী শৃঙ্গে শশসম্বন্ধ থাকে না; কাজেই তা প্রতিযোগী অবৃত্তি ধর্ম। প্রতিযোগী অবৃত্তি ওই ধর্মবিশিষ্ট প্রতিযোগীরই অভাবের জ্ঞান গোতে হচ্ছে অর্থাৎ এই অভাবটি প্রতিযোগী অবৃত্তি শশসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন শৃঙ্গনিষ্ঠ প্রতিযোগিতাক অভাব। সুতরাং ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব প্রত্যক্ষসিদ্ধ। এরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ অভাবের বাস্তবতা অস্বীকার করতে তদ্‌ধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব বুদ্ধির প্রতি তদ্‌ধর্মবিশিষ্টের জ্ঞান কারণ – এরূপ

নিয়মের কল্পনা নিরর্থক। কার্যকারণভাবের কল্পনা প্রমাণসিদ্ধ বস্তুর উপপত্তির জন্যই করা হয়। কিন্তু কল্পিত কার্যকারণ বিধির অনুরোধে প্রমাণসিদ্ধ বস্তুকে অমান্য করা যায় না।

এই পূর্বপক্ষ বিস্তার যে অযৌক্তিক তা স্পষ্ট করতে গিয়ে গঙ্গেশ বলেন – "গবি শশশৃঙ্গং নাস্তীতিপ্রতীতেরপ্রসিদ্ধেঃ শশশৃঙ্গং নাস্তীতি চ শশে শৃঙ্গভাবইত্যর্থঃ"।[২৩] বক্তব্য এই 'গো'তে শশশৃঙ্গের অভাব বুদ্ধি প্রসিদ্ধ নয়; কারণ 'শশশৃঙ্গ নাই' একথার অর্থ শশে শৃঙ্গ নাই। যে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর করে সৌন্দড়পন্থীরা ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন অভাবকে প্রসিদ্ধ বলে দাবি করেন তাদৃশ প্রত্যক্ষ যে হয় না সেই কথায় স্পষ্ট করেন গঙ্গেশ। শশশৃঙ্গের অভাব ব্যবহারিক জীবনে অনুভব সিদ্ধ বলে আমাদের মনে হয়। কেননা বস্তু যে নেই তেমন কথা আমরা দৈনন্দিন জীবনে প্রায় বলে থাকি। যেমন- 'আকাশকুসুম নাই', 'বন্ধ্যাপুত্র নাই', 'শশশৃঙ্গ নাই' – এহেন উক্তি প্রায় শ্রুত হয়। কিন্তু এ ধরণের উক্তির দ্বারা কোনো অসিদ্ধ বস্তুর প্রতিষেধ হয় না বরং সিদ্ধেরই প্রতিষেধ হয়। 'আকাশকুসুম নাই' – এর দ্বারা আকাশে কুসুমের অভাব বোধিত হয়। একইভাবে বন্ধ্যাপুত্রের নিষেধ দ্বারা বন্ধ্যা নারীতে পুত্রের অভাবই ব্যক্ত হয়। 'শশশৃঙ্গের অভাব' এই বিষয়টি ইঙ্গিত করে যে শৃঙ্গ গোমেষাদিতে প্রসিদ্ধ তা শশে অসিদ্ধ। ফলে সর্বত্র সিদ্ধেরই নিষেধ হয়। ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন পদার্থ সিদ্ধ না হওয়ায় তার নিষেধ বা অভাব হতে পারে না। ন্যায় পরিভাষায় বলা যায়- যদি শশীয়ত্বাবচ্ছিন্ন শৃঙ্গনিষ্ঠ প্রতিযোগিতাক অভাব – এরূপ জ্ঞানের বিষয়কে মান্যতা দেওয়া হয় তাহলেই বলা যায় ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব স্বীকৃত হল। কিন্তু 'শশশৃঙ্গ নাই' – এইরূপ জ্ঞানে শশীয়ত্বাবচ্ছিন্ন শৃঙ্গনিষ্ঠ প্রতিযোগিতার অভাব বিষয় হয় না; পরন্তু শৃঙ্গে শশীয়ত্বাভাবই এরূপ

---

[২৩] তদেব।

জ্ঞানের বিষয় হয় অর্থাৎ এই অভাবের অনুযোগী ‘গো’ এবং প্রতিযোগী শশশৃঙ্গ নয়, বরং এখানে শৃঙ্গই অনুযোগী এবং শশীয়ত্ব তার প্রতিযোগী। এর দ্বারা শৃঙ্গে শশসম্বন্ধই অস্বীকৃত হয়, শশশৃঙ্গ অস্বীকৃত হয় না। অন্যভাষায় এই অভাবটি শশীয়ত্বাবচ্ছিন্ন শশীয়ত্ব প্রতিযোগিতাক অভাব। এই অভাবের প্রতিযোগী শশীয়ত্ব, প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক শশীয়ত্বত্ব। এই শশীয়ত্বত্ব প্রতিযোগীর ব্যধিকরণধর্ম নয় কারণ প্রতিযোগী শশীয়ত্বে তা বিদ্যমান। ফলত অভাবটিকে ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব হিসাবে গণ্য করার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

উপসংহার

এ যাবৎ লিঙ্গলিঙ্গী সম্বন্ধ বিষয়ে ভারতীয় সম্প্রদায়গুলির নানাবিধ মতের পরিচয় প্রদান করা হয়েছে। দেখা গিয়েছে চার্বাক ভিন্ন ভারতীয় সকল সম্প্রদায়ই এই সম্বন্ধটিকে যেমন স্বীকার করেন তেমনই ওই সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার উপায়ও যে রয়েছে সে বিষয়ে মতৈক্য পোষণ করেন। তবে সম্বন্ধটির বাস্তবতা এবং প্রামাণিকতা বিষয়ে সহমত হলেও সম্বন্ধটির নামকরণ এবং স্বরূপ নির্বাচন প্রসঙ্গে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্যের অন্ত নেই। শুধু যে সম্প্রদায়ভেদে এই মতান্তর তা নয় এমনকি একই পরম্পরায় আস্থাশীল আচার্যদের মধ্যেও বিস্তর মতপার্থক্য দৃষ্ট হয় এবিষয়ে। লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধ নির্দেশ করতে গিয়ে যেসব বাচক শব্দ ব্যবহার হয়েছে তাদের মধ্যে আছে – 'সম্বন্ধ', 'স্বাভাবিক সম্বন্ধ', 'অব্যভিচার সম্বন্ধ', 'অবিনাভাব সম্বন্ধ', 'কাৎর্ম্ন্যেন সম্বন্ধ' 'অনুমানাঙ্গ সম্বন্ধ', 'স্বাভাবিক সম্বন্ধ' 'নিয়মরূপ সম্বন্ধ', 'প্রতিবন্ধ-প্রতিবন্ধ ভাব সম্বন্ধ', 'নান্তরীয়কার্থ দর্শন', 'বিধি', 'সময়', 'সহচারী'। এই বাচকগুলি কোথাও সম্প্রদায় বিশেষে, কোথাও আচার্য বিশেষ দ্বারা ব্যবহৃত। তবে 'অবিনাভাব', 'ব্যাপ্তি' পরিভাষাগুলি বহু সম্প্রদায় ও আচার্য ব্যবহৃত। 'অবিনাভাব' শব্দটি মূলত বৌদ্ধ সমর্থিত হলেও জৈনরাও শব্দটির ব্যবহার অনুমোদন করেন। এমনকি ভাসর্বজ্ঞ, উদ্দ্যোতকর প্রমুখ নৈয়ায়িকও লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধের বিবক্ষায় 'অবিনাভাব' বর্ণনাটি প্রয়োগ করেছেন। পক্ষান্তরে 'ব্যাপ্তি' কথাটি বহুল সমর্থিত হলেও এর প্রয়োগ প্রধানত ন্যায়-বৈশেষিক আচার্যদের দ্বারাই ঘটেছে। এছাড়াও মীমাংসা দর্শনে হেতু সাধ্যের সম্বন্ধকে বোঝাতে শব্দটির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

এই ব্যাপ্তি সম্বন্ধের স্বরূপ নানাভাবে বর্ণনা করেছে নানা সম্প্রদায়। বৌদ্ধ মতে ব্যাপ্তি হল অবিনাভাব সম্বন্ধ। বৌদ্ধের মতো জৈন তার্কিকরাও ব্যাপ্তিকে অবিনাভাব বলেছেন।

বৈশেষিক দর্শনে স্পষ্টভাবে ব্যাপ্তির পরিচয় প্রদান করা হয়নি বা ব্যাপ্তিবাচক কোনো শব্দের উল্লেখ করা হয়নি। প্রশস্তপাদই বৈশেষিক পরম্পরায় প্রথম ব্যাপ্তি বাচক শব্দের প্রয়োগ করেছেন। ব্যাপ্তিকে বোঝাতে 'বিধি', 'সময়', ও 'সহচারী' শব্দের প্রয়োগ করেছেন তিনি। সাংখ্য দর্শনে ব্যাপ্তিকে ব্যাপ্য-ব্যাপকভাব বলে বর্ণনা করা হয়েছে। মীমাংসা দর্শনের ভাষ্যকার শবরস্বামী লিঙ্গ-লিঙ্গীর সম্বন্ধকেই ব্যাপ্তি বলে অভিহিত করেছেন। ব্যাপ্তির পরিচয় দিতে গিয়ে বেদান্ত পরিভাষাকার বলেছেন অশেষ সাধনের আশ্রয়ে আশ্রিত যে সাধ্য তার সঙ্গে হেতুর সামানাধিকরণ্যই হল ব্যাপ্তি। আলোচ্য গবেষণাকর্মের মুখ্য উপজীব্য ছিল গঙ্গেশ কর্তৃক প্রচলিত ব্যাপ্তির লক্ষণগুলি খণ্ডন। তবে উপরোক্ত লক্ষণগুলির ব্যুৎপাদন গঙ্গেশ উপাধ্যায় তাঁর "তত্ত্বচিন্তামণি" গ্রন্থে করেননি। মণিকার ব্যাপ্তি বিষয়ে স্বমত প্রতিষ্ঠার পূর্বে পূর্বপক্ষ হিসাবে ব্যাপ্তি বিষয়ে নববিধ লক্ষণ ব্যাখ্যা ও বিচার উপস্থাপন করেছেন। ওই লক্ষণগুলির মধ্যে 'অব্যভিচরিতত্ব' পদ প্রতিপাদ্য মীমাংসক সম্মত পঞ্চ লক্ষণ যেমন রয়েছে তেমনই 'সিংহ-ব্যাঘ্র' নামে প্রসিদ্ধ দুই আচার্যের ব্যাপ্তি লক্ষণ রয়েছে, সেই সঙ্গে সৌন্দড় পণ্ডিত সম্মত ব্যাপ্তির দুটি লক্ষণও রয়েছে। সৌন্দড় পণ্ডিত ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবের সম্ভাবনাকে স্বীকার করে ব্যাপ্তির যে দ্বিবিধ লক্ষণ পেশ করেছেন সেই লক্ষণদ্বয়কে অনুসরণ করে পরবর্তীকালে ব্যাপ্তির দ্বাদশ প্রকার লক্ষণ প্রদান করেছেন শ্রীনাথ ভট্টাচার্য (চক্রবর্ত্তী), প্রগল্‌ভাচার্য, পক্ষধর মিশ্র, বাসুদেব সার্ব্বভৌম প্রমুখ। ওই লক্ষণগুলির উল্লেখ বা বিচার "তত্ত্বচিন্তামণি" গ্রন্থে দৃষ্ট না হলেও তাঁর "দীধিতি" টীকায় রঘুনাথ এই দ্বাদশ লক্ষণের উল্লেখ ও বিচার পেশ করেছেন। এইভাবে ব্যাপ্তির সম্ভাব্য একবিংশতি প্রকার লক্ষণের বিচার উপস্থাপিত হয়েছে এই গবেষণাকর্মে। ঠিক কী কী কারণে ওই একবিংশতি প্রকার লক্ষণ

অগ্রাহ্য বলে মণিকার ও তাঁর টীকাকাররা মনে করেন সংক্ষেপে সেগুলির পুনরোল্লেখ প্রয়োজন। 'অব্যভিচরিতত্ব' পদ প্রতিপাদ্য ব্যাপ্তির পঞ্চবিধ লক্ষণ হল-

১) "সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্"

২) "সাধ্যবদ্‌ভিন্নসাধ্যাভাববদবৃত্তিত্ব"

৩) "সাধ্যবৎপ্রতিযোগিকান্যোন্যাভাবাসামানাধিকরণ্যম্"

৪) "সকলসাধ্যাভাববন্নিষ্ঠাভাবপ্রতিযোগিত্বম্"

৫) "সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বম্"

এই লক্ষণগুলির অসারতা প্রমাণে গঙ্গেশের যুক্তি হল এদের কোনোটিই কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতির স্থলে প্রযুক্ত হয় না। কারণ ওই লক্ষণগুলিতে হয় 'সাধ্যাভাববৎ' এর ধারণা প্রযুক্ত কিংবা 'সাধ্যবৎপ্রতিযোগিক ভেদবৎ' এর ধারণা প্রযুক্ত। কিন্তু 'ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ' ইত্যাদি অনুমিতি স্থলে 'বাচ্যত্ব' কেবলান্বয়ী সাধ্য হওয়ায় তার অভাবের অধিকরণ যেমন প্রসিদ্ধ হয় না তেমনই 'সাধ্যবৎপ্রতিযোগিক ভেদবৎ' অর্থাৎ 'বাচ্যত্ববৎ' - এর ভেদবিশিষ্ট কোনো পদার্থই সম্ভব হয় না। এমতাবস্থায় কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতির ক্ষেত্রে উল্লেখিত পঞ্চ লক্ষণের প্রয়োগ ব্যর্থ হয়।

একই আপত্তি 'সিংহ-ব্যাঘ্র' লক্ষণ নামে পরিচিত লক্ষণদ্বয়ের ক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য। ওই লক্ষণদ্বয়ের মধ্যে "সাধ্যাসামানাধিকরণ্যানধিকরণত্বম্" এই লক্ষণটি সাধ্যের অসমানাধিকরণ দ্বারা নিরূপিত অনধিকরণত্বকে ব্যাপ্তি বলে দাবি করে। আর দ্বিতীয়

''সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যানধিকরণত্বম্'' লক্ষণটি সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যের অনধিকরণত্বকেই ব্যাপ্তি বলে দাবি করে। দুটি লক্ষণ সাধ্যের অসমানাধিকরণ ও সাধ্যের বৈয়ধিকরণ ধারণার উপর নির্ভর। কিন্তু যেখানে সাধ্য কেবলান্বয়ী সেখানে 'সাধ্যাসামানাধিকরণ' বা 'সাধ্যবৈয়ধিকরণ' বলে কোনো কিছুই থাকে না। একারণে পূর্বের পঞ্চ লক্ষণের ন্যায় এই লক্ষণদ্বয়ও কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতির ক্ষেত্রে অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হয়।

কি 'অব্যভিচরিতত্ব' পদপ্রতিপাদ্য পঞ্চ লক্ষণ, কি 'সিংহ-ব্যাঘ্র' লক্ষণ এই সপ্তলক্ষণের বিরুদ্ধে সাধারণ আপত্তি হল কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতির স্থলে যেহেতু 'সাধ্যাভাববৎ' বা 'সাধ্যবৎপ্রতিযোগিক ভেদবৎ' প্রসিদ্ধ নয় তাই কেবলান্বয়ী স্থলে লক্ষণগুলির অব্যাপ্তি দোষ হয়। এই সমস্যার সমাধান নির্দেশ করতে গিয়ে সৌন্দড় উপাধ্যায় 'ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবে'র ধারণাটি উদ্ভাবন করেন। তাঁর দাবি এরূপ অভাবের সম্ভাবনাকে মেনে নিলে যেক্ষেত্রে সাধ্যটি কেবলান্বয়ী সেইরূপ ক্ষেত্রেও সাধ্যাভাবাধিকরণটি আর অপ্রসিদ্ধ থাকে না। যেমন- 'ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ' এই অনুমিতির ক্ষেত্রে সাধ্যাভাব বলতে যদি সমবায় সম্বন্ধ পুরস্কারে বাচ্যত্বের অভাবকে ধরা হয় তাহলে বাচ্যত্বাভাবটি আর অসিদ্ধ হয় না। সাধারণভাবে বাচ্যত্বের অভাব কোনো পদার্থে সিদ্ধ না হলেও সমবায়িত্বেন বাচ্যত্বাভাব সকল পদার্থেই সিদ্ধ (কারণ বাচ্যত্ব সমবায় সম্বন্ধে কোনো স্থলে কদাপি থাকে না)। এইভাবে সাধ্যাভাবের অধিকরণ সিদ্ধ হওয়ায় কেবলান্বয়ী স্থলে 'সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বম্' ইত্যাদি লক্ষণগুলির বিরুদ্ধে অব্যাপ্তির আপত্তি আর থাকে না। এই ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন অভাবের বাস্তবতা মেনে নিয়ে সৌন্দড়কে অনুসরণ করে ব্যাপ্তির দুটি লক্ষণ গড়ে তুলেছেন রঘুনাথ শিরোমণি। এগুলি যথাক্রমে –

১) "যৎসমানাধিকরণাঃ সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নব্যাপকতাবচ্ছেদক প্রতিযোগিতাকা যাবন্তোহ-ভাবাঃ প্রতিযোগিসমানাধিকরণাস্তত্ত্বম্"

২) "যৎসমানাধিকরণানাং সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন-ব্যাপকতাবচ্ছেদকরূপাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতা-কানাং যাবদভাবানাং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসামানাধিকরণ্যং তত্ত্বম্"।

শুধু এই দুটি লক্ষণই নয় এই ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবের সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নিয়ে ব্যাপ্তির আরও বহু লক্ষণ প্রদান করেছেন নানা আচার্য। এই লক্ষণগুলির একটি সংকলন রঘুনাথ তাঁর দীধিতিতে রেখেছেন। এই দ্বাদশ লক্ষণ নিম্নরূপ-

১) "ব্যাপ্যবৃত্তের্হেতুসমানাধিকরণসাধ্যাভাবপ্রতিযোগিতায়া অনবচ্ছেদকং যৎসাধ্যতাবচ্ছেদকং তদবচ্ছিন্নসামানাধিকরণ্যম্ ব্যাপ্তিঃ"

২) "ব্যাপ্যবৃত্তের্হেতুসমানাধিকরণাভাবস্য প্রতিযোগিতায়াঃ সামানাধিকরণ্যেনানবচ্ছেদকং যৎসাধ্যতাবচ্ছেদকং তদবচ্ছিন্নসামানাধিকরণ্যম্ ব্যাপ্তিঃ"

৩) "হেতুসমানাধিকরণপ্রতিযোগিব্যাধিকরণাভাবপ্রতিযোগিতায়াঃ সামানাধিকরণ্যেনানবচ্ছেদ-কং যৎসাধ্যতাবচ্ছেদকং তদবচ্ছিন্নসামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ"

৪) "সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নসাধ্যসামানাধিকরণ্যাবচ্ছেদকস্বসমানাধিকরণসাধ্যাভাবত্বকত্ত্বম্"

৫) "যৎসমানাধিকরণসাধ্যাভাবপ্রমায়াং সাধ্যবত্তাজ্ঞানপ্রতিবন্ধকত্বং নাস্তি তত্ত্বম্"

৬) "সাধ্যাভাববতি যদ্বৃত্তৌ প্রকৃতানুমিতিবিরোধিত্বং নাস্তি তত্ত্বম্"

৭) "যাবন্তঃ সাধ্যাভাবাঃ প্রত্যেকং তত্ততসজাতীয়া যে তত্তদধিকরণবৃত্তিত্বাভাবস্তদ্বত্ত্বং তত্ত্বম্"

৮) "যাবন্তস্তাদৃশাঃ সাধ্যাভাবাঃ প্রত্যেকং তেষাং সজাতীয়স্য ব্যাপকীভূতস্য ব্যাপ্যবৃত্তেরভাবস্য প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকেন ধর্ম্মেণ যদ্রূপাবচ্ছিন্নং প্রতি ব্যাপকত্বমবচ্ছিদ্যতে তদ্রূপবত্ত্বং তত্ত্বম্"

৯) "যাবন্তস্তাদৃশাঃ সাধ্যাভাবাঃ প্রত্যেকং তৎপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকেন ধর্ম্মেণ যদ্রূপাবচ্ছিন্নং প্রতি ব্যাপকত্বমবচ্ছিদ্যতে তদ্রূপবত্ত্বং বা তত্ত্বম্"

১০) "বৃত্তিমদ্বৃত্তয়ো যাবন্তঃ সাধ্যাভাবদ্বৃত্তিত্বাভাবাস্তদ্রূপত্বং ব্যাপ্তিঃ"

১১) "বৃত্তিমদ্‌বৃত্তয়ো যাবন্তঃ সাধ্যাভাবসমুদায়াধিকরণবৃত্তিত্বাভাবাস্তদ্বত্ত্বম্"

১২) "সাধ্যতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নব্যাপকতাবচ্ছেদকরূপাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাকব্যাপ্যবৃত্তিস্বসমানাধি-করণযাবদভাবাধিকরণবৃত্তিত্বাভাবা যাবন্তো বৃত্তিমদ্বৃত্তয়স্তদ্বত্ত্বম্"

এই দ্বাদশ লক্ষণের প্রথম তিনটি হল চক্রবর্ত্তীর, দ্বিতীয় তিনটি প্রগল্‌ভাচার্যের, তৃতীয় তিনটি পক্ষধর মিশ্রের এবং শেষের তিনটি সার্ব্বভৌমের।

এই চতুর্দশ লক্ষণের উল্লেখ বা খণ্ডন মণিকার গঙ্গেশ করেননি। যে অভাবের সম্ভাবনাকে স্বীকার করে এই চর্তুদশ লক্ষণ বিকশিত হয়েছে সেই ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাব অপ্রসিদ্ধ বলে দাবি করেন গঙ্গেশ। তাঁর যুক্তি হল প্রতিযোগির ব্যধিকরণধর্ম কখনই প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদকধর্ম হতে পারে না। এ বিষয়ে গঙ্গেশের স্পষ্ট উক্তি- "প্রতিযোগ্যবৃত্তিশ্চ ধর্ম ন প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক" অর্থাৎ প্রতিযোগীতে অবৃত্তি যে ধর্ম তা প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হতে পারে না। যেমন– ঘটাভাবের ক্ষেত্রে ঘট হল প্রতিযোগী; এই ঘটে যে ধর্ম থাকে না, যেমন- পটত্বাদি, তা ঘট প্রতিযোগিক অভাবের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হতে পারে না। ঘটত্ব যেহেতু ঘটে বিদ্যমান তাই ওই ঘটত্বই এক্ষেত্রে

প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হতে পারে, পটত্বাদি নয়। সহজকথায় যা প্রতিযোগির ধর্ম নয় তা প্রতিযোগিতার অবচ্ছেদক হয় না। সুতরাং যে সমবায় সম্বন্ধে বাচ্যত্ব কোনো অধিকরণেই সিদ্ধ নয় সেই সমবায় সম্বন্ধ পুরস্কারে বাচ্যত্ব কখনই প্রতিযোগিতাবচ্ছেদক হতে পারে না। এই একই যুক্তি রঘুনাথ ব্যবহার করেছেন পূর্বপক্ষী সম্মত চতুর্দশ লক্ষণ নিরাকরণের ক্ষেত্রে।

এইভাবে পুর্বপক্ষী সম্মত ব্যাপ্তি লক্ষণ সমূহের অসারতা প্রদর্শনের পর গঙ্গেশ ব্যাপ্তির সিদ্ধান্ত লক্ষণ উপস্থাপন করেছেন– "প্রতিযোগ্যসমানাধিকরণযৎসমানাধিকরণাত্যন্তা-ভাবপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্নং যন্ন ভবতি তেন সমং তস্য সামানাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিঃ" অর্থাৎ প্রতিযোগীর অধিকরণে থাকে না অথচ হেতুর অধিকরণে অর্থাৎ হেত্বধিকরণে আছে যে অত্যন্তাভাব, সেই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন ভিন্ন যে সাধ্য সেই সাধ্যের সাথে হেতুর সামানাধিকরণ্য হল ব্যাপ্তি।

ইতিমধ্যে মহামতি গঙ্গেশ ও রঘুনাথ যেসব যুক্তির সাহায্যে ব্যাপ্তির প্রচলিত লক্ষণগুলি নিরাকরণ করেছেন তার একটি রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হল যেসব আপত্তির অবতারণা করে গঙ্গেশ পূর্বপক্ষ সম্মত ব্যাপ্তি লক্ষণ সমূহের নিরাশে তৎপর হয়েছেন তাঁর সেই আপত্তিগুলি কতখানি যুক্তিযুক্ত? প্রথমেই যে আপত্তিতে তিনি ব্যাপ্তির প্রথম সাতটি লক্ষণ বর্জন করেন সেই আপত্তি বিচার করে দেখা যাক। 'অব্যভিচরিতত্ব' পদ প্রতিপাদ্য পঞ্চলক্ষণ এবং 'সিংহ-ব্যাঘ্র' লক্ষণদ্বয়ের বিরুদ্ধে মণিকারের আপত্তি ছিল এই যে কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতির স্থলে এই লক্ষণগুলির অব্যাপ্তি হয়। এখানে প্রশ্ন উঠে এই আপত্তি কতখানি সমীচীন? একটি লক্ষণের ক্ষেত্রে অব্যাপ্তি দোষ হয় তখনই যখন সদ্ধেতুক অনুমিতির স্থলে

প্রযুক্ত হতে লক্ষণটি ব্যর্থ হয়। বাস্তবিক পক্ষে এই অব্যাপ্তির আপত্তিটি উল্লিখিত লক্ষণগুলির ক্ষেত্রে ঘটে কিনা তা সংশয়ের।

এইরূপ সংশয়ের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে। কারণ কেবলান্বয়ী অনুমিতি আদৌ সদ্ধেতুক অনুমিতি কিনা তা একটি বিচার্য বিষয়। একথা ঠিক যে নৈয়ায়িক সম্প্রদায় কেবলান্বয়ী, কেবলব্যতিরেকী ও অন্বয়ব্যতিরেকী লিঙ্গের এই ত্রিবিধ বিভাগের পাশাপাশি তিনপ্রকার সদ্ধেতুক অনুমানকে মান্যতা দেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতি আদৌ সদ্ধেতুক অনুমিতি কিনা সে জিজ্ঞাসা থেকেই যায়। এমন বহু সম্প্রদায় রয়েছেন যারা কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতি স্বীকার করেন না। এমনকি বহু নৈয়ায়িক একে অনুপসংহারী হেত্বাভাসের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন। যদি কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতি অনুপসংহারী হেত্বাভাসের অন্তর্ভুক্ত হয় তাহলে তাকে সদ্ধেতুক অনুমিতি বলা যাবে না। আর যে অনুমিতি সদ্ধেতুক নয় সে অনুমিতিতে প্রযুক্ত হয় না– এই যুক্তিতে কোনো ব্যাপ্তি লক্ষণকে বর্জন করাও যায় না।

এই বিষয়টি স্পষ্ট করার লক্ষ্যে অনুপসংহারী হেত্বাভাসের স্বরূপটি হৃদয়ঙ্গম করা দরকার। অনুপসংহারী অনৈকান্তিক হেত্বাভাসের একটি প্রকার। যে অনুমিতির ক্ষেত্রে হেতুটি সপক্ষ বা বিপক্ষ কোনোটিতেই ঐকান্তিক নয় সেই হেতু অনৈকান্তিক। হেতুর এই অনৈকান্তিকত্ব তিনভাবে সিদ্ধ হতে পারে- ১) হেতুটি যদি সপক্ষ বিপক্ষ উভয় বৃত্তি হয়, ২) হেতু যদি সপক্ষ বিপক্ষ ব্যাবৃত্ত হয়ে কেবল পক্ষ বৃত্তি হয় এবং ৩) হেতুটি যদি অন্বয়ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত রহিত হয়। প্রথম ক্ষেত্রে হেতুটি সাধারণ অনৈকান্তিক বলে গণ্য হয়, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হেতুটিকে বলা হয় অসাধারণ অনৈকান্তিক আর তৃতীয় ক্ষেত্রে হেতুটি হয় অনুপসংহারী। যেখানে অন্বয়ব্যতিরেক কোনো দৃষ্টান্তই প্রসিদ্ধ নয় সেখানে ‘যেখানে হেতু সেখানে সাধ্য’

কিংবা ‘যেখানে সাধ্যের অভাব সেখানে হেতুর অভাব’ কোনোভাবেই ব্যাপ্তি গৃহীত হতে পারে না। ফলে হেতুটি ব্যভিচারী নাকি অব্যভিচারী সে প্রশ্নের মীমাংসা বা উপসংহার হয় না। একারণেই এরূপ হেতু ‘অনুপসংহারী’ নামে আখ্যায়িত হয়। এখন দেখা দরকার একটি হেতু কখন অন্বয়ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত রহিত হয়।

প্রচলিত ক্ষেত্রে অনুপসংহারী লিঙ্গের যেসব দৃষ্টান্ত পেশ করা হয় সেইসব দৃষ্টান্তে পক্ষ কেবলান্বয়ী হয়। যেমন– ‘সর্বম্ অনিত্যম্ প্রমেয়ত্বাৎ’ এই অনুমানে পক্ষ হল সর্ব বিষয়। সাধ্য অনিত্যত্ব এবং হেতু প্রমেয়ত্ব। এরূপ অনুমিতির ক্ষেত্রে অন্বয় বা ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত পাওয়া সম্ভব নয়। ‘যেখানে প্রমেয়ত্ব সেখানে অনিত্যত্ব’ কিংবা ‘যেখানে অনিত্যত্বের অভাব সেখানে প্রমেয়ত্বের অভাব’ যেভাবেই ব্যাপ্তি গ্রহণ করা হোক না কেন তার অনুকূলে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন প্রয়োজন। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে যে দৃষ্টান্তই গ্রহণ করা হোক তা পক্ষের অন্তর্গত হয়ে পড়বে। এখন সকল পদার্থই পক্ষের অন্তর্গত হওয়ায় সকল পদার্থই সন্দিগ্ধ সাধ্যবান্। ফলে নিশ্চিত সাধ্যবান্ বা নিশ্চিত সাধ্যাভাববান্ রূপে কোনো পদার্থই গৃহীত হতে পারে না। এমতাবস্থায় হেতুর সপক্ষসত্ত্ব বা বিপক্ষাসত্ত্ব কোনটিই প্রতিষ্ঠিত হয় না। ফলত এইরূপ ক্ষেত্রে ব্যাপ্তিজ্ঞান বাধিত হয়। এইভাবে অনুপসংহারী হেত্বাভাস ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়ে পরামর্শ তথা অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়।

কিন্তু কেবল পক্ষটি কেবলান্বয়ী হলেই যে হেতু অনুপসংহারী হয় তা নয় যেখানে সাধ্য কেবলান্বয়ী হয় সেখানেও হেতু অনুপসংহারী হতে পারে। এই মতের সমর্থন বিশ্বনাথ, নীলকণ্ঠ প্রমুখ নব্য আচার্যদের রচনায় পরিলক্ষিত হয়। অনুপসংহারী হেত্বাভাসের পরিচয় দিতে গিয়ে ভাষাপরিচ্ছেদের ৭৪তম কারিকায় বিশ্বনাথ যদিও ‘‘তথৈবাহনুপসংহারী

কেবলান্বয়িপক্ষকঃ''[১] বলে চিরাচরিত ধারাকে অনুসরণ করেছেন, তথাপি মুক্তাবলীতে তিনি এমন কথাও বলেছেন– ''অনুপসংহারী চাত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিসাধ্যকাদিঃ''[২] অর্থাৎ কিনা কেবল কেবলান্বয়ী পক্ষক অনুমিতির ক্ষেত্রেই যে অনুপসংহারী হেত্বাভাস হয় তা নয়; কেবলান্বয়ীসাধ্যক যে অনুমিতি অর্থাৎ যে অনুমানের সাধ্যটি অত্যন্তাভাবের অপ্রতিযোগী হয় সেই অনুমানের ক্ষেত্রেও হেতু অনুপসংহারী হয়। এমনকি 'আদি' শব্দটির ব্যবহারের মধ্যে এই ইঙ্গিত স্পষ্ট যে যেখানে লিঙ্গ বা হেতুটি নিজেই কেবলান্বয়ী সেখানেও অনুমিতিটি অনুপসংহারী বলে বিবেচিত হতে পারে। পক্ষ, সাধ্য, হেতুর মধ্যে যেকোনো একটি কেবলান্বয়ী হওয়ার অর্থ অন্যগুলির দৃষ্টান্ত অপ্রসিদ্ধ হওয়া। কাজেই কেবলান্বয়ীসাধ্যক যে অনুমিতি তার ক্ষেত্রেও লিঙ্গটির অনুপসংহারীত্ব অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়।

ন্যায় সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে অনুপসংহারী হেত্বাভাসের যেরূপ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে তার সমর্থন নীলকণ্ঠীতেও পাওয়া যায়। তর্কসংগ্রহের স্বকৃত টীকায় নীলকণ্ঠ বলেছেন – ''নবীন মতে তু অত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিত্ববিশিষ্টসাধ্যাদিকমেবানুসংহারিত্বম্। তজ্-জ্ঞানস্য ব্যতিরেকব্যাপ্তিগ্রহপ্রতিবন্ধকতা''।[৩] বিশ্বনাথের ন্যায় নীলকণ্ঠও কেবলান্বয়ী কথাটির পরিবর্তে 'অত্যন্তাভাবাপ্রতিযোগিত্ব' সন্দর্ভটি প্রয়োগ করেছেন। মুক্তাবলীতে ব্যবহৃত 'সাধ্যকাদি'র পরিবর্তে নীলকণ্ঠ 'সাধ্যাদি' কথাটি ব্যবহার করেছেন। এই সাধ্যাদি কথাটি সাধ্য হেতুর অন্যতর একটিকে সূচিত করে। কাজেই সমগ্র বর্ণনাটির অর্থ দাঁড়ায়– যে অনুমিতির ক্ষেত্রে সাধ্য ও হেতুর কোনো একটি অথবা উভয়টি কেবলান্বয়ী হয় সেক্ষেত্রে লিঙ্গটি অনুপসংহারী

---

[১] *ভাষাপরিচ্ছেদ-* ৭৪।

[২] শ্রী পঞ্চানন শাস্ত্রী, *ভাষাপরিচ্ছেদ*, ২০১৬, পৃষ্ঠা- ৩৮৮।

[৩] পণ্ডিত শিবদত্ত, *তর্কসংগ্রহ* (নীলকণ্ঠীদীপিকা সহিত), ১৯৫৪, পৃষ্ঠা- ৭০।

বলে গণ্য হয়। নবীন মতে অনুপসংহারী হেতু ব্যতিরেক ব্যাপ্তির প্রতিবন্ধক হয়ে পরামর্শ তথা অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়।

এখন প্রশ্ন হল গঙ্গেশ পরবর্তী এই নবীন নৈয়ায়িকরা অনুপসংহারীর যে ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন তা কতখানি গ্রহণযোগ্য? যারা অন্তর্ব্যাপ্তিকে গ্রহণ করেন তাঁদের কাছে কেবলান্বয়ী পক্ষক অনুমিতির ক্ষেত্রেও ব্যাপ্তিজ্ঞান অসম্ভব হয় না। তাই অনুপসংহারী তাঁদের বিচারে কোন হেত্বাভাস নয়। কিন্তু প্রাচীন থেকে নব্য ন্যায় পরম্পরায় সকল আচার্যই অনৈকান্তিকের ত্রৈবিধ্য স্বীকার করেন এবং অনুপসংহারীকে একটি হেত্বাভাস হিসাবে মানেন। কেন অনুপসংহারী তাঁদের মতে হেত্বাভাস তা বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন। প্রতিটি হেত্বাভাসের ক্ষেত্রে দূষকতা বীজ পৃথক পৃথক হয় এবং এক একটি হেত্বাভাস এক এক ভাবে অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। এখন দেখা যাক অনুপসংহারী ঠিক কীভাবে অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। সাধারণভাবে অনৈকান্তিক হেত্বাভাসগুলি ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়ে অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়ে থাকে। সাধারণ অনৈকান্তিকের ক্ষেত্রে হেতুটি ব্যভিচারী হওয়ায় ব্যাপ্তি গৃহীত হতে পারে না। অসাধারণের ক্ষেত্রে হেতু সাধ্যের সামানাধিকরণ্য জ্ঞান প্রতিবন্ধক হওয়ায় ব্যাপ্তি গৃহীত হতে পারে না। অনুপসংহারীর ক্ষেত্রে অন্বয়ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত অসিদ্ধ হওয়ায় ব্যভিচারসংশয় থেকেই যায়। ব্যভিচারনিশ্চয় যেমন (সাধারণের ক্ষেত্রে) ব্যাপ্তি তথা অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয় তেমনই ব্যভিচারসংশয়ও ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রতিবন্ধক হয়। হেতুনিষ্ঠ অন্বয় দৃষ্টান্ত রহিতত্ব ব্যভিচারের বিরুদ্ধধর্ম। ওই দুই বিরুদ্ধধর্মের জ্ঞান ব্যাপ্তিসংশয়ের জন্ম দেয়। আর ব্যাপ্তিসংশয় হলে ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের অবকাশ থাকে না। তাই অনুপসংহারী হেতুর নিশ্চয়টি ব্যাপ্তি সংশয়ের জনকরূপে ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের প্রতিবন্ধক।

ব্যাপ্তিসংশয় যদি ব্যাপ্তিনিশ্চয়ের বাধক হয়ে পরামর্শ তথা অনুমিতির বাধক হয় তাহলে যেভাবেই ওই সংশয় উৎপন্ন হোক না কেন যথার্থ অনুমিতি ব্যাহত হতে বাধ্য। যেখানে পক্ষটি কেবলান্বয়ী সেখানে নিখিল পদার্থ পক্ষান্তর্গত বলে তদতিরিক্ত অন্বয়ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত বলে কিছু থাকে না। একইভাবে যেখানে সাধ্যটি কেবলান্বয়ী হয় সেখানে সাধ্যাতিরিক্ত পক্ষ বা হেতু বলে কোনো পদার্থ থাকে না। এমনকি যেখানে হেতুটি কেবলান্বয়ী সেখানে তদতিরিক্ত পক্ষ, সাধ্য অপ্রসিদ্ধই হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রে হেতু সাধ্যের মধ্যে ব্যাপ্তিনিশ্চয় ব্যাহতই হয়। তাই পক্ষ, সাধ্য, হেতু অন্যতর অন্তত একটি কেবলান্বয়ী হওয়ার অর্থ লিঙ্গটির অনুপসংহারী হওয়া।

অনুপসংহারিত্বের এই ব্যাখ্যা মানলে 'ইদং বাচ্যং জ্ঞেয়ত্বাৎ' অনুমিতি স্থলটি আর বৈধ অনুমিতির স্থল বলে বিবেচিত হতে পারে না। 'বাচ্যত্ব' যেমন সর্ব পদার্থ সাধারণ ধর্ম, তেমনই 'জ্ঞেয়ত্ব' সপ্তপদার্থের সাধর্ম্য। ফলে সাধ্য ও হেতু উভয়ই এখানে কেবলান্বয়ী। তাই অনুমিতিটিও অনুপসংহারী হওয়া অনিবার্য। এরূপ অসদ্ধেতুক অনুমিতি ব্যাপ্তি লক্ষণের লক্ষ্য না হওয়ায় 'অব্যভিচরিতত্ব' পদ প্রতিপাদ্য পঞ্চ লক্ষণের বিরুদ্ধে কিংবা 'সিংহ-ব্যাঘ্র' লক্ষণদ্বয়ের বিরুদ্ধে অব্যাপ্তির যে আপত্তি গঙ্গেশ উত্থাপন করেছেন তা কতখানি বিচারসহ সে প্রশ্ন থেকে যায়।

তবে এপ্রসঙ্গে একথাও স্বীকার্য যে কেবলান্বয়ীকে একপ্রকার যথার্থ অনুমিতি হিসাবে গ্রহণ করার একটি দীর্ঘ পরম্পরা রয়েছে ন্যায় ঐতিহ্যে। অন্বয়ব্যতিরেকী লিঙ্গের পাশাপাশি কেবলান্বয়ী ও কেবলব্যতিরেকী লিঙ্গের কথা ব্যক্ত হয়েছে ন্যায় গ্রন্থগুলিতে। একথাও ব্যক্ত হয়েছে যে পক্ষসত্ত্ব, সপক্ষসত্ত্ব, বিপক্ষাসত্ত্ব, অসৎপ্রতিপক্ষত্ত্ব ও অবাধিতত্ত্ব গমক লিঙ্গের এই পঞ্চধর্মের সবগুলি অন্বয়ব্যতিরেকী লিঙ্গে থাকা আবশ্যক হলেও কেবলান্বয়ী ও

কেবলব্যতিরেকীর ক্ষেত্রে চারটি ধর্মের উপস্থিতি পর্যাপ্ত। কেবলান্বয়ীর ক্ষেত্রে বিপক্ষাসত্ত্ব এবং কেবলব্যতিরেকীর ক্ষেত্রে সপক্ষসত্ত্ব অপেক্ষিত হয় না। কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতি হিসাবে 'ঘটো অভিধেয়: প্রমেয়ত্বাৎ পটবৎ' এবং কেবল ব্যতিরেকী সাধ্যক হিসাবে 'পৃথিবী ইতরেভ্যো ভিদ্যতে গন্ধবত্ত্বাৎ' এই দুইয়ের উল্লেখ অন্নংভট্টও করেছেন। কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতি যদি অনুপসংহারী হয় তাহলে কেবলব্যতিরেকী সাধ্যক অনুমিতির ক্ষেত্রেও ওইরূপ দোষের আশঙ্কা হতে পারে। সেক্ষেত্রে একমাত্র অন্বয়ব্যতিরেকী লিঙ্গক অনুমিতিই যথার্থ বলে বিবেচিত হবে। এরূপ পরিণতি ন্যায়ের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে কতখানি ব্যাঘাতক হবে তা বিচারের অপেক্ষা রাখে।

কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতির যথার্থতা বিষয়ে যেখানে ন্যায় সমাজেই এতাদৃশ মতানৈক্য সেখানে মীমাংসক এরূপ অনুমিতির বৈধতাই যে অস্বীকার করবেন তাতে আশ্চর্যের কি! যদি কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতি অবৈধ বলে গণ্য হয় তাহলে মীমাংসক সম্মত পঞ্চ লক্ষণের বিরুদ্ধে অব্যাপ্তির আপত্তি অসার কল্পনা বলে পরিগণিত হবে। শুধু তাই নয় সিংহ-ব্যাঘ্র লক্ষণদ্বয়ের খণ্ডন যে যুক্তিতে করা হয়েছে তা আর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। অধিকন্তু বিকল্প হিসাবে যে সিদ্ধান্ত লক্ষণের উপস্থাপন গঙ্গেশ করেছেন তা হয়ে দাঁড়াবে নিরর্থক।

এখন প্রশ্ন হল এই উভয় সংকটের সমাধান কোথায়? গঙ্গেশ বা রঘুনাথ এরূপ আপত্তির আশঙ্কা করেননি। সম্ভবত কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতির বৈধতা প্রশ্নাতীত বলে তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন। এই ব্যাপ্যারে অপরাপর টীকাকারদের নীরবতা প্রমাণ করে যে উত্থাপিত সমস্যাটি তাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়নি। কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতিকে অনুপসংহারী বলে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা মূলত বিশ্বনাথ, নীলকণ্ঠ প্রমুখের মধ্যে লক্ষ্য করা

যায়। যদি কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতি অনুপসংহারী হয় তাহলে 'অব্যভিচরিতত্ব' রূপে পরিচিত পঞ্চ লক্ষণ যে অকাট্য হয় দাঁড়াবে সে আশঙ্কা সম্ভবত মুক্তাবলীকার বিশ্বনাথের মনেও উদিত হয়েছিল। তাই কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতি ছাড়াও অপর একটি অনুমিতির উল্লেখ তিনি করেছেন যেখানে 'অব্যভিচরিতত্ব' পদ প্রতিপাদ্য লক্ষণগুলির অব্যাপ্তি দোষ প্রদর্শন করা যায়। প্রসঙ্গত বলা দরকার যে ভাষাপরিচ্ছেদের ৬৮ ও ৬৯নং কারিকায় বিশ্বনাথ ব্যাপ্তির দুটি লক্ষণের উল্লেখ করেন। এর মধ্যে দ্বিতীয়টি ব্যাপ্তির সিদ্ধান্ত লক্ষণ, যা মণিকারের সিদ্ধান্ত লক্ষণ অনুসারে রচিত বা বিকশিত। আর প্রথমটি যেখানে ব্যাপ্তিকে ''সাধ্যবদন্যস্মিন্নসম্বন্ধ উদাহৃতঃ''[৪] হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। পুর্বপক্ষী মীমাংসকের ব্যাপ্তি লক্ষণেরই একটি কল্পিত রূপ। বস্তুত গঙ্গেশ উপাধ্যায় ব্যাপ্তিপঞ্চকে অব্যভিচরিতত্ব পদপ্রতিপাদ্য যে চতুর্থ লক্ষণ উল্লেখ করেছেন সেই 'সাধ্যবদন্যাবৃত্তিত্বম্'- এর অনুসরণে ভাষাপরিচ্ছেদকার পূর্বপক্ষীর লক্ষণটিকে উপস্থাপিত করেছেন। পূর্বপক্ষীর ওই লক্ষণ ব্যাখ্যা ও বিস্তারের অনন্তর ওই লক্ষণটির বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করতে গিয়ে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিশ্বনাথ প্রথমে কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতির ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে ওই লক্ষণ যে ব্যর্থ সেকথা ব্যক্ত করেন– ''ননু কেবলান্বয়িনি জ্ঞেয়ত্বাদৌ সাধ্যে সাধ্যবদন্যস্যাহপ্রসিদ্ধত্বাদব্যাপ্তিঃ''।[৫] তবে এই আপত্তির অবতারণা করলেও সম্ভবত তাঁর মনে এই প্রশ্নটি দেখা দিয়েছিল যে কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতিকে যারা বৈধ অনুমিতি বলে গণ্য করেন না সেই পূর্বপক্ষীদের কীভাবে নিবৃত্ত করা যাবে। আর সেই বিবেচনা থেকেই তিনি বলেছেন– ''কিঞ্চ সত্তাবান্ জাতেরিত্যাদৌ সাধ্যবদন্যস্মিন্ সামান্যাদৌ হেতুতাবচ্ছেদকসম্বন্ধেন

---

[৪] *ভাষাপরিচ্ছেদ* -৬৮।

[৫] শ্রী পঞ্চানন শাস্ত্রী, *ভাষাপরিচ্ছেদ*, ২০১৬, পৃষ্ঠা- ৩৩৩।

সমবায়েন বৃত্তেরপ্রসিদ্ধত্বাদব্যাপ্তিশ্চ...”।[৬] বিবক্ষা এই যদি কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতি পূর্বপক্ষী অস্বীকার করেন তা হলেও ‘‘সাধ্যবদন্যস্মিন্নসম্বন্ধ’’ এরূপ ব্যাপ্তির লক্ষণের বিরুদ্ধে আপত্তি অব্যাহত থাকে। যার নিদর্শন হল এই অনুমিতির স্থলটি- ‘সত্তাবান জাতেঃ’।

এই অনুমিতির স্থলে সাধ্য হল সত্তা। আর জাতি হল হেতু। সত্তা যেহেতু সমবায় সম্বন্ধে সাধ্য হয়েছে তাই সাধ্যতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হল সমবায়। একইভাবে জাতিকে সমবায় সম্বন্ধে হেতু ধরা হয়েছে; তাই হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধও সমবায়। সমবায় সম্বন্ধে হেতু জাতি থাকে দ্রব্য, গুণ ও কর্মে (কারণ দ্রব্যে দ্রব্যত্ব, গুণে গুণত্ব এবং কর্মে কর্মত্ব জাতি থাকে)। ওই তিনটিতেই সমবায় সম্বন্ধে সত্তা আশ্রিত। তাই হেতুর যাবতীয় অধিকরণে সাধ্য উপস্থিত থাকায় এটি সদ্ধেতু। অথচ এই স্থলে পূর্বপক্ষী সম্মত অনুমিতির লক্ষণ প্রযোজ্য হতে ব্যর্থ হয়। কেননা এখানে সাধ্য সত্তা হওয়ায় সাধ্যবৎ হয় সে সকল পদার্থ যেগুলিতে সত্তা বিদ্যমান। সত্তা সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্য, গুণ, কর্মে থাকে তাই দ্রব্যাদি তিনটি হয় সত্তাবৎ। অন্যদিকে সাধ্যবদন্য বা সত্তাবৎভিন্ন হয় সামান্য, বিশেষ, সমবায়, অভাব। ওই সাধ্যবদন্য নিরূপিত হেতুতাবচ্ছেদক সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্বটি অপ্রসিদ্ধ। কারণ সামান্যাদিতে কোনো কিছু সমবায় সম্বন্ধে থাকে না। যে বৃত্তিত্ব অসিদ্ধ তার অভাব কখনই প্রসিদ্ধ হতে পারে না। আর ওই অপ্রসিদ্ধ অভাব কখনই হেতুতে পাওয়া যায় না। ফলে ওই অনুমিতির স্থলটিতে উল্লিখিত ব্যাপ্তি লক্ষণের সমন্বয় হয় না।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যারা কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতির যথার্থতা মানেন এবং যারা ওইরূপ অনুমিতির যথার্থতা অস্বীকার করেন উভয়পক্ষই এবিষয়টি স্বীকার করতে বাধ্য যে

---

[৬] তদেব, পৃষ্ঠা- ৩৩৪।

‘অব্যভিচরিতত্ব’ পদপ্রতিপাদ্য ব্যাপ্তি লক্ষণগুলি অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট। এখন প্রশ্ন হল বিশ্বনাথ উত্থাপিত ‘সত্তাবান্ জাতেঃ’ অনুমিতির স্থলে ‘সিংহ-ব্যাঘ্র’ লক্ষণদ্বয়ের অব্যাপ্তি হয় কিনা।

‘সত্তাবান্ জাতেঃ’ স্থলে প্রথম লক্ষণটি প্রয়োগ করা যাক। ‘‘সাধ্যাসামানাধিকরণ্যানধিকরণত্বম্’’ এই হল প্রথম লক্ষণ। ‘সত্তাবান্ জাতেঃ’ এর ক্ষেত্রে সমবায় সম্বন্ধে সত্তা হল সাধ্য। ওই সত্তার সমানাধিকরণ হল সেই সকল পদার্থ যেগুলি সত্তার অধিকরণে বৃত্তি হয়। অন্যদিকে ওই সত্তার অসমানাধিকরণ হল সেই সকল পদার্থ যেগুলি সত্তার অধিকরণে অবৃত্তি হয়ে অনধিকরণে বৃত্তি হয়। সত্তার অধিকরণ দ্রব্য, গুণ, কর্ম। সেগুলিতে বৃত্তি হল দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, কর্মত্ব। পক্ষান্তরে, সত্তার অধিকরণ হল সামান্য, বিশেষ, সমবায় (কেননা সামান্যাদিতে সত্তা থাকে না)। সেই অনধিকরণ বৃত্তি হল সামান্যত্ব, বিশেষত্ব, সমবায়ত্ব ইত্যাদি যেগুলি সত্তাধিকরণ দ্রব্যাদিতে থাকে না। ফলে দ্রব্যত্বাদি যেমন সত্তা সমানাধিকরণ হয় তেমনই সামান্যত্বাদি হয় সত্তার অসমানাধিকরণ। সেই সাধ্যাসামানাধিকরণের ভাবই সাধ্যাসামানাধিকরণ্য অর্থাৎ সামান্যত্বের ভাব, বিশেষত্বের ভাব, সমবায়ত্বের ভাব ইত্যাদি। এই সাধ্যাসামানাধিকরণ্যের অনধিকরণত্ব হেতুতে থাকা দরকার। জাতি এই অনুমানের হেতু হওয়ায় এবং তাতে সামান্যত্বত্বাদি না থাকায় আপাতদৃষ্টিতে সাধ্যাসামানাধিকরণ্যের অনধিকরণত্বই হেতুতে থাকে বলে মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে এই অনধিকরণত্ব অসিদ্ধ পদার্থ। কেননা অনধিকরণত্ব প্রসিদ্ধ হতে পারে যদি এবং কেবল যদি তাদৃশ অধিকরণত্বটি প্রসিদ্ধ হয়। যেখানে অধিকরণ সিদ্ধ নয় সেখানে যেমন অনধিকরণ সিদ্ধ নয় তেমনই যেখানে সাধ্যাসামানাধিকরণ্যের অধিকরণত্বটি সিদ্ধ নয় সেখানে সাধ্যাসামানাধিকরণ্যের অনধিকরণত্বটিও সিদ্ধ হতে পারে না। প্রশ্ন হবে সাধ্যাসামানাধি-

করণ্যের অধিকরণটি আলোচ্য ক্ষেত্রে সিদ্ধ নয় কেন? উত্তরে বলা যায় আলোচ্য ক্ষেত্রে জাতি সমবায় সম্বন্ধে হেতু হওয়ায় হেতুতাবচ্ছেদক সম্বন্ধ হল সমবায়; ওই সমবায় সম্বন্ধে সাধ্যাসামানাধিকরণ্য অর্থাৎ সামান্যত্বত্বাদি কখনই কোনো অধিকরণে প্রসিদ্ধ হয় না। বস্তুত সামান্যত্বের ভাব (সামান্যত্বত্ব), বিশেষত্বের ভাব (বিশেষত্বত্ব) এগুলি আশ্রয়ে স্বরূপ সম্বন্ধেই থাকতে পারে, সমবায় সম্বন্ধে নয়। ফলে সাধ্যাসানাধিকরণ্যের সমবায় সম্বন্ধে অধিকরণ অসিদ্ধ হয়। আর যে সম্বন্ধে যার অধিকরণ সিদ্ধই নয় সেই সম্বন্ধে তার অনধিকরণও সিদ্ধ হতে পারে না। সেইসঙ্গে হেতুও ওই অসিদ্ধ অনধিকরণত্বের আশ্রয় হতে পারে না অর্থাৎ কিনা 'সত্তাবান্ জাতেঃ' স্থলে লক্ষণটির অব্যাপ্তিই প্রতিষ্ঠিত হয়।

একই কারণে 'সত্তাবান্ জাতেঃ' স্থলে ''সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যানধিকরণত্বম'' লক্ষণটিরও অব্যাপ্তি হয়। সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যের অর্থ 'সাধ্যবদ্ভিন্ন বৃত্তিত্ব'। সাধ্য যেখানে সত্তা সেখানে সাধ্যবৎ হবে দ্রব্য, গুণ, কর্ম। সাধ্যবৎ ভিন্ন দ্রব্যাদি ভিন্ন অর্থাৎ সামান্যাদি (যেখানে সত্তা থাকে না)। সেই সাধ্যবৎ ভিন্ন বৃত্তি হয় সামান্যত্বাদি। তাঁদের ধর্ম হল সামান্যত্বত্বাদি। ওই বৃত্তিত্বের অধিকরণ হবে সেই পদার্থ যেখানে সামান্যত্বত্বাদি সমবায় সম্বন্ধে থাকে। কিন্তু সামান্যত্বত্বাদি সমবায় সম্বন্ধে কোনো অধিকরণেই থাকে না অর্থাৎ সামান্যত্বত্বাদি নিরূপিত সমবায় সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বৃত্তিত্ব অসিদ্ধ। ফলে ওই বৃত্তিত্বের অভাবও অসিদ্ধ। অন্যভাষায় এখানে সাধ্যবৈয়ধিকরণ্যের অধিকরণত্ব ও অনধিকরণত্ব উভয়ই অসিদ্ধ। সুতরাং হেতু জাতিতে ওইরূপ অসিদ্ধ অনধিকরণত্ব সিদ্ধ হতে পারে না।

অতএব কেবলান্বয়ীসাধ্যক অনুমিতি স্থলের উল্লেখ না করেও 'অব্যভিচরিতত্ব' পদপ্রতিপাদ্য পঞ্চ লক্ষণ এবং 'সিংহ-ব্যাঘ্র' লক্ষণদ্বয় যে অব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট তা প্রমাণ করা

যেতে পারে অন্যদিকে ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন অভাবের ধারণাটিকে বর্জন করে গঙ্গেশ উপাধ্যায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন ওই অভাবের ধারণাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠা কোনো ব্যাপ্তি লক্ষণ সন্তোষ জনক হতে পারে না। কাজেই 'ব্যধিকরণধর্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাক অভাবে'র যে দাবি সৌন্দড় ও তাঁর অনুগামীরা করে থাকেন তার অসারতা গঙ্গেশ প্রদত্ত নির্ণায়ক যুক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সৌন্দড়ের মত অনুসরণে রচিত ব্যাপ্তির লক্ষণদ্বয় ও সেই সঙ্গে চক্রবর্ত্তী প্রমুখ-কৃত দ্বাদশ প্রকার ব্যাপ্তি লক্ষণ পরিত্যাজ্য বলেই গণ্য হয়।

গ্রন্থপঞ্জী

- অকলঙ্ক, *অকলঙ্কগ্রন্থত্রয়ম্*, ন্যায়াচার্য পণ্ডিত মহেন্দ্র কুমার শাস্ত্রী (সম্পাঃ), আহমেদাবাদ, সরস্বতী পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৬।
- অনন্তবীর্য, *প্রমেয়রত্নমালা (মাণিক্যনন্দী নন্দী প্রণীত পরীক্ষামুখসুত্র লঘুবৃত্তিঃ সহ)*, পণ্ডিত শ্রী হীরালাল জৈন (সম্পাঃ), বারাণসী, ১৯৬৪।
- অন্নংভট্ট, *তর্কসংগ্রহ (নীলকণ্ঠী দীপিকা সহিত)*, পণ্ডিত শিবদত্তন (সম্পাঃ), মুম্বাই, ১৯৫৪।
- অন্নংভট্ট, *তর্কসংগ্রহ*, শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী (সম্পাঃ), কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪১৩ বঙ্গাব্দ।
- অন্নংভট্ট, *তর্ক-সংগ্রহঃ*, শ্রী পঞ্চানন শাস্ত্রী (অনুঃ), কলকাতা, নবভারত পাবলিশার্স, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ।
- আচার্য ধর্মকীর্ত্তি, *ন্যায়বিন্দু*, সঞ্জিত কুমার সাধুখাঁ (সম্পাঃ), কলকাতা, সদেশ, ২০০৭।
- আচার্য ধর্মকীর্ত্তি, *ন্যায়বিন্দু*, সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী (সম্পাঃ), কলকাতা, সাহিত্যশ্রী, ২০২০।
- আচার্য ধর্মকীর্ত্তি, *প্রমাণবার্ত্তিকম্*, স্বামী দ্বারিকাদাস শাস্ত্রী (সম্পাঃ), বারাণসি, বৌদ্ধ ভারতী, ১৯৯৪।
- ঈশ্বরকৃষ্ণ, *সাংখ্যকারিকা*, শ্রী পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু সাংখ্যভূষণ (সম্পাঃ), কলকাতা , পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৩।
- উদয়নাচার্য, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি*, শ্যামাপদ মিশ্র (অনুঃ), কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৩৯০ বঙ্গাব্দ।

- উদয়নাচার্য, *আত্মতত্ত্ববিবেক*, আচার্য কেদারনাথ ত্রিপাঠী (অনুঃ ও সম্পাঃ), বারাণসী, চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, ১৯৯২।
- উদয়নাচার্য, *কিরণাবলী (তৃতীয় খণ্ড)*, শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী (অনুঃ), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১।
- উদয়নাচার্য, *কিরণাবলী (প্রথম, দ্বিতীয় খণ্ড)*, শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী (অনুঃ), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯০।
- উদয়নাচার্য, *কিরণাবলী*, নরেন্দ্রচন্দ্র বেদান্ততর্কতীর্থ (সম্পাঃ), কলকাতা, দি এশিয়াইটিক সোসাইটি, ২০০২।
- উদয়নাচার্য, *কিরণাবলী*, মহামহোপাধ্যায় শিবচন্দ্র সার্বভৌম (সম্পাঃ), কলকাতা, দি এশিয়াইটিক সোসাইটি, ১৯৮৯।
- উদয়নাচার্য, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি*, ডঃ ব্রহ্মানন্দ ত্রিপাঠি (সম্পাঃ), বারাণসি, চৌখাম্বা সুরভারতী প্রকাশন, ১৯৯৭।
- উদয়নাচার্য, *ন্যায়কুসুমাঞ্জলি*, শ্রীমোহন ভট্টাচার্য (অনুঃ), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৫।
- কণাদ, *বৈশেষিক দর্শনম্* (উদয়ন কৃত কিরণাবলী ও প্রশস্তপাদ কৃত প্রশস্তপাদভাষ্য সহ), মহামহোপাধ্যায় বিন্দেশ্বরী প্রসাদ দ্বিবেদী (সম্পাঃ), বারাণসী, ব্রজভূষণ দাস এন্ড কো, ১৯১৭।
- কণাদ, *বৈশেষিক দর্শনম্*, শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন ভট্টাচার্য (অনুঃ), কলকাতা, বঙ্গবাসী-ইলেক্ট্রোমেসিন প্রেস, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ।
- কুমারিলভট্ট, *শ্লোকবার্ত্তিক* (ডঃ শ্যামসুন্দর শর্মা দ্বারা অনুবাদিত), ডঃ বিজয়া শর্মা (সম্পাঃ), বারাণসী, ভারতীয় বিদ্যা সংস্থান, ২০০২।

- কেশব মিশ্র, *তর্কভাষা,* শর্বাণী গাঙ্গুলি (সম্পাঃ), কলকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০২১।
- কেশবমিশ্র, *তর্কভাষা,* শ্রী গঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য (অনুঃ), কলকাতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ২০১৩।
- গঙ্গেশ উপাধ্যায়, *অনুমান চিন্তামণি,* শ্রীবিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য (অনুঃ), কলকাতা, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩।
- গঙ্গেশ উপাধ্যায়, *ব্যাপ্তিপঞ্চকম্,* শ্রী গঙ্গাধর কর (অনুঃ ও সম্পাঃ), কলকাতা, সেন্টার অফ এ্যাডভান্সড স্ট্যাডি ইন ফিলোসফি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৫।
- গঙ্গেশ উপাধ্যায়, *ব্যাপ্তিপঞ্চকম্,* শ্রীশৈলজাপতি মুখোপাধ্যায় (সম্পাঃ), কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০১৩
- গঙ্গেশোপাধ্যায়, *ব্যাপ্তিপঞ্চক,* রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ (অনুঃ ও সম্পাঃ), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১১।
- গঙ্গেশোপাধ্যায়, *ব্যাপ্তিপঞ্চকম্,* আচার্য পণ্ডিত চিত্তনারায়ণ পাঠক (সম্পাঃ), বারাণসি চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, ২০১০।
- গঙ্গেশোপাধ্যায়, *সিদ্ধান্তলক্ষণম্ (দীধিতিজাগদীশীসমেতম্),* শ্রীশৈলজাপতি মুখোপাধ্যায় (অনুঃ ও সম্পাঃ), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯০।
- গদাধর ভট্টাচার্য, *গাদাধরী* (প্রথম ভাগ), পণ্ডিত শ্রী কীর্ত্যানন্দ ঝা ও শ্রী সতকারি শর্মা (পুন. সম্পাঃ), বারাণসী, চৌখম্বা সংস্কৃত অফিস, ২০০৭।
- গদাধর ভট্টাচার্য, *তত্ত্বচিন্তামণি দীধিতিবিবৃত্তি,* শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ (সম্পা.), কলকাতা, এশিয়াটিক সোসাইটি, ১৯১০।

- ঘোষ, ডঃ শ্রীদীপক, *ভাষাপরিচ্ছেদসমীক্ষা,* কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৩।
- চক্রবর্তী, অরুণা, *ন্যায়দর্শনে পরামর্শ,* কলকাতা, ইকোনমিক প্রেস, ১৯৭৮।
- চক্রবর্তী, ললিতা, *ভাসর্বজ্ঞ ও ন্যায়সার,* বীরভূম, অক্ষর প্রকাশনী পাবলিশার্স এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটার্স, ২০১২।
- চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণকুমার, *ভারতীয় দর্শনে সাংখ্য-যোগদর্শন-প্রমাণতত্ত্ব,* কলকাতা, বিজন পাবলিশার্স, ১৯৮৮।
- চট্টোপাধ্যায়, হেরম্ব, বৌদ্ধাচার্যসম্মত স্বার্থানুমানের সংক্ষিপ্ত আলোচনা, কলকাতা, সংস্কৃত কলেজ, ১৯৮৩।
- জয়ন্তভট্ট, *ন্যায়মঞ্জরী,* পণ্ডিত শ্রী সূর্য নারায়ণ শুক্ল (সম্পাঃ), বারাণসী, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, ১৯৩৬।
- দত্ত, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, *সাংখ্য পরিচয়,* কলকাতা, অরফান প্রেস, ১৩৪৬ বঙ্গাব্দ।
- ধর্মকীর্তি, *ন্যায়বিন্দু,* আচার্য চন্দ্রশেখর শাস্ত্রী (সম্পাঃ), বারাণসী, চৌখম্বা সংস্কৃত সিরিজ, ১৯৫৪।
- ধর্মভূষণ, *ন্যায়দীপিকা,* পান্নালাল জৈন দ্বারা প্রকাশিত, চন্দ্রপ্রভামন্ত্রালয় দ্বারা মুদ্রিত, কাশী, ১৯১৫।
- ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র, *বেদান্তপরিভাষা,* শরৎচন্দ্র ঘোষাল (অনুঃ), কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৯৫।
- ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র, *বেদান্তপরিভাষা,* শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য (সম্পাঃ), কলকাতা, গুপ্ত প্রেস, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ।

- নারায়ণভট্ট, *মানমেয়োদয়ঃ*, শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী নবতীর্থ (অনুঃ), কলকাতা, সংস্কৃত কলেজ, ১৯৮৯।
- ন্যায়াচার্য, শ্রীসতীশ্চন্দ্র, *জৈনদর্শনের দিগ্ দর্শন*, কলিকাতা, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ, ১৯৫৭।
- পতঞ্জলি, *পাতঞ্জল দর্শন* (কালীবর বেদান্তবাগীশ কৃত), শ্রী আশোককুমার বন্দোপাধ্যায় সম্পাঃ, কলকাতা, শ্রীবলরাম প্রকাশনী, ২০০৪।
- পতঞ্জলি, *পাতঞ্জল দর্শন*, শ্রী পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু সাংখ্যভূষণ (সম্পাঃ), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৩।
- প্রশস্তপাদ, *প্রশস্তপাদভাষ্য* (শ্রীধর ভট্ট কৃত ন্যায়কন্দলী সহ), বারাণসী, দুর্গাধর ঝা (সম্পাঃ), সম্পূর্ণানন্দ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৭।
- প্রশস্তপাদ, *প্রশস্তপাদভাষ্যম্*, ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য (অনুঃ) কলকাতা, সংস্কৃত বুক ডিপো, ২০১৭।
- বাচস্পতিমিশ্র, *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদি,* শ্রী নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী (সম্পাঃ), কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৪০৬ বঙ্গাব্দ।
- বিশ্বনাথ, *ভাষাপরিচ্ছেদ*, ডঃ গজানন শাস্ত্রী মুসলগাঁবকর (সম্পাঃ), বারাণসী, চৌখম্বা সুরভারতী প্রকাশন, ১৯৭৮।
- বিশ্বনাথ, *ভাষাপরিচ্ছেদ*, শ্রীগোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (সম্পাঃ), বর্ধমান, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় পাবলিকেশন ইউনিট, ১৯৯৮।
- বিশ্বনাথ, *ভাষাপরিচ্ছেদ*, শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য (সম্পাঃ), কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০১৬।

- বীরসেন, *ষটখণ্ডাগম,* হীরালাল জৈন (সম্পাঃ), অমরাবতী, শ্রীমন্ত শেট শিতাবরায় লক্ষ্মীচন্দ্র জৈন সাহিত্যোদ্ধারক কার্যালয়, ১৯৪৭।
- বেদালঙ্কার, ডঃ জয়দেব, *প্রমাণ-ইন-ইন্ডিয়ান ফিলজফি এ ক্রিটিক্যাল স্টাডি,* বারাণসি, ভারতীয় বিদ্যা প্রকাশন, ১৯৯৮।
- ভট্টাচার্য, শ্রীদীনেশচন্দ্র, *বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান,* কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৩৫৮ বঙ্গাব্দ।
- ভট্টাচার্য, শ্রীমোহন এবং শ্রীদীনেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য, *ভারতীয় দর্শনকোষ,* কলকাতা, সংস্কৃত কলেজ কলকাতা, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ।
- ভাসর্বজ্ঞ, *ন্যায়সার,* স্বামী যোগীন্দ্রনাথ (সম্পাঃ), বারাণসী, ষড়দর্শন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান, ১৯৬৮।
- মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার, *বৈশেষিক দর্শন,* কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০১১।
- মথুরানাথ তর্কবাগীশ, *ব্যাপ্তিপঞ্চকরহস্যম্* (সিংহব্যাঘ্রলক্ষণরহস্য সহ), বারাণসী, পণ্ডিত দুণ্ডিরাজ শাস্ত্রী (সম্পাঃ), চৌখাম্বা সংস্কৃত সংস্থান, ১৯৯৭।
- মহর্ষি কপিল, *সাংখ্য-দর্শনম্ (শ্রীবিজ্ঞানভিক্ষুকৃত সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য-তত্ত্ব-সমাসাখ্য-সাংখ্যসূত্র-সমেতম্),* পূজ্যপাদ কালীবর বেদান্তবাগীশ (অনুঃ), দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ (সম্পাঃ), কলকাতা, সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী, ১৩৬০ বঙ্গাব্দ।
- মহর্ষি গৌতম, *ন্যায়দর্শন (দ্বিতীয় খণ্ড),* মহামহোপাধ্যায় ফণীভূষণ তর্কবাগীশ (সম্পাঃ), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৫।
- মহর্ষি গৌতম, *ন্যায়দর্শন (প্রথম খণ্ড),* মহামহোপাধ্যায় ফণীভূষণ তর্কবাগীশ (সম্পাঃ), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৮।

- মহর্ষি গৌতম, *ন্যায়দর্শনম্*, শ্রী অনন্তলাল ঠাকুর (সম্পাঃ), বারাণসি, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, ২০১৪।
- মহর্ষি জৈমিনি, *মীমাংসা দর্শনম্*, ডঃ গজানন শাস্ত্রী (সম্পাঃ), বারাণসি, ভারতীয় বিদ্যা প্রকাশন, ১৯৭৯।
- মাণিক্যনন্দী, *পরীক্ষামুখসূত্র*, মুনি প্রণম্যসাগর (সম্পাঃ), ভোপাল, আর্যন প্রিন্টার্স, ২০১১।
- মাধবাচার্য, *সর্বদর্শনসংগ্রহ (বৌদ্ধদর্শন ও জৈনদর্শন)*, সঞ্জিত কুমার সাধুখাঁ (সম্পাঃ), কলকাতা, সদেশ, ২০১৬।
- মাধবাচার্য, *সর্বদর্শনসংগ্রহ (বৌদ্ধদর্শনম্)*, শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য (অনু), কলকাতা, গুপ্ত প্রেস, ১৪০১ বঙ্গাব্দ।
- মিশ্র, সবিতা, *নব্যন্যায়ে অনুমিতি*, কলকাতা, প্রোগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ১৩৭২ বঙ্গাব্দ।
- মোক্ষাকরগুপ্ত, *বৌদ্ধ তর্কভাষা*, মধুমিতা চট্টোপাধ্যায় (অনুঃ), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০২০।
- শঙ্করমিশ্র, *বৈশেষিকসূত্রোপস্কারঃ*, আচার্য দুণ্ডিরাজ শাস্ত্রী (ব্যাখ্যাঃ), বারাণসি, চৌখাম্বা সংস্কৃত সংস্থান, ২০০২।
- শবরস্বামী, শাবরভাষ্যম্, ডঃ গজানন শাস্ত্রী মুসলগাঁবকর (সম্পাঃ), বারাণসী, চৌখম্বা সংস্কৃত সীরীজ অফিস, ২০০৪।
- শর্মা, রত্না দত্ত, *ভাসর্বজ্ঞ সম্মত প্রমাণতত্ত্ব*, কলকাতা, সেন্টার অফ্ এ্যাডভান্সড্ স্টাডি ইন্ ফিলসফি, ২০২০।

- শাস্ত্রী, ডঃ দয়াশঙ্কর, *উদ্যোতকর কা ন্যায়বার্তিক এক অধ্যয়ন*, বারাণসি, চৌখাম্বা বিদ্যাভবন, ২০০৪।
- শুক্লা, ডঃ বলিরাম, *অনুমান-প্রমাণ*, বারাণসী, ইস্ট্রান বুক লিঙ্ক, ১৯৮৬।
- শুক্লা, বদরীনাথ, *মাথুরী পঞ্চ লক্ষণী*, জয়পুর, রাজস্থান হিন্দী গ্রন্থ আকাদেমী, জয়পুর, ১৯৮৪।
- শ্রী জগদীশতর্কালঙ্কার, *জাগদীশীব্যধিকরণম্*, ডঃ মহেশ ঝা (সম্পাঃ), বারাণসি, চৌখাম্বা কৃষ্ণদাস অকাদেমি, ১৯৯৮।
- শ্রী জগদীশতর্কালঙ্কার, *জাগদীশীব্যধিকরণম্*, স্বামী শ্রীরামপ্রপন্নাচার্য, বারাণসি, চৌখাম্বা সিরিজ অফিস, ২০০৩।
- শ্রী জগদীশতর্কালঙ্কার, *ব্যাপ্তিপঞ্চকম্ সিংহব্যাঘ্রলক্ষণং চ*, আচার্য দুণ্ডিরাজ শাস্ত্রী (সম্পাঃ),বারাণসি চৌখাম্বা সংস্কৃত ভবন, ২০২১।
- শ্রী জগদীশতর্কালঙ্কার, *সিদ্ধান্তলক্ষণ-জাগদীশী*, ডঃ মহেশ ঝা (সম্পাঃ), বারাণসি, চৌখাম্বা কৃষ্ণদাস অকাদেমি, ২০১৪।
- শ্রী বল্লভাচার্য, *ন্যায়লীলাবতি*, পণ্ডিত শ্রী হরিহর শাস্ত্রী (সম্পাঃ), বারাণসি, চৌখাম্বা সিরিজ অফিস, ১৯৯১।
- শ্রীগঙ্গেশোপাধ্যায়, *তত্ত্বচিন্তামণি*, শ্রীকামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ (সম্পা.), চৌখাম্বা সংস্কৃত প্রতিষ্ঠান, ২০১০।
- শ্রীগঙ্গেশোপাধ্যায়, *সিদ্ধান্তলক্ষণম্*, শ্রী জ্বালাপ্রসাদ গৌড় (সম্পা.), বারাণসী, চৌখম্বা সংস্কৃত ভবন, ২০০৭।
- শ্রীগাগাভট্ট, *ভাট্টচিন্তামণিঃ*, পণ্ডিত শ্রী সূর্য নারায়ণ শুক্লা (সম্পাঃ), বেনারস, চৌখাম্বা সংস্কৃত সিরিজ অফিস, ১৯৩৩।

- শ্রীযশোবিজয়গনি, *জৈন তর্কভাষা*, পণ্ডিত শোভাচন্দ্র ভারিল্ল (সম্পাঃ), বারাণসি, ভারতীয় বিদ্যা প্রকাশন, ১৯৬৪।
- শ্রীশঙ্কর মিশ্র, *কণাদরহস্য*, পণ্ডিত বিন্দ্যেশ্বরী প্রসাদ (সম্পাঃ), বারাণসী, চৌখম্বা সংস্কৃত অফিস, ১৯১৭।
- সরকার, তমোঘ্ন, *জৈন জ্ঞানতত্ত্ব ও তর্ক পরিভাষা*, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০২১।
- সায়ন মাধবাচার্য, *সর্বদর্শনসংগ্রহ*, শ্রী অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাঃ), কলকাতা, শ্রীবলরাম প্রকাশনী, ২০০৫।
- সাহা, ডঃ বিশ্বরূপ, *নাস্তিকদর্শনপরিচয়ঃ*, কলকাতা, সদেশ, ২০০৫।
- Bhattacharya, Tarasankar, *The Nature of Vyāpti*, Calcutta, Sanskrit College, 1970.
- Chattopadhyay, Debiprasad and Mrinalkanti Gangopadhyay, *Nyāya Philosophy*, Calcutta, Indian Studies Past and Present, 1975.
- Dharmarāja Adhvarīndra, *Vedānta Paribhāṣā*, S.S. Suryaṇārāyṇa Śāstrī (ed.), Madras, Madras the Adyar Library and Research Centre, 1984.
- Dharmarāja Adhvarīndra, *Vedānta Paribhāṣā*, Swāmī Mādhavānanda (Trans.), Howrah, Ramkrishna Mission Sarada Pith, 1942.

- Dineshchandra Bhattacharya, *History of Navya Nyāya in Mithilā,* Dārbhāṅgā, Mithilā Institute of Post Graduate Studies and Research in Sanskrit Learning, 1958.
- Gaṅgeśa Upādhyāya*, Maṅgalavāda*, Gaurinātha Śāstrī (Ed.), Kolkata, The Asiatic Society,1997.
- Ingalls, Daniel H.H, *Navya-Nyāya Logic*, Varanasi, Motilal Banarsidass, 1988.
- Mishra, Arun, *Antarvyāpti*, New Delhi, Indian Council of Philosophical Research, 2002.
- Śaśadhara, *Nyāyasiddhāntadīpa (with Tippna by Gunaratnasuri)*, Bimal Krishna Matilal (ed.), Ahmedabad, L.D. Institute of Indology, 1976.
- Vidyābhūṣaṇa, Śatiśa Chandra, *A History of Indian Logic*, Delhi, Motilal Banarsidass International, 2023.
- Yaśovijaya, *Jaina Tarka Bhāṣā*, Dayānand Bhārgava (Trans.) Varanasi, Motilal Banarsidass, 1973.

সহায়ক প্রবন্ধ

- Chakraborty, Krishna, "Definitions of Vyāpti (Pervasion) In Navyanyāya: A Critical Survey", *Journal of Indian Philosophy*, 1978, Vol. 5: pp. 209-236.

- Goekoop, Cornelius, “The Logic of Invariable Concomitance in the Tattvacintāmaṇi: Gaṅgeśa's Anumitinirūpaṇa and Vyāptivāda”, *Journal of the American Oriental Society*, 1972, Vol. 92: pp. 169-173.
- Krishnamurti, G. G, “The Definition of Universal Concomitance as The Absence of Undercutting Conditions”, *Philosophy East and West*, 2012, Vol. 62: pp. 359-374.
- Mukherjea, A. K, “The Definition of Pervasion ("Vyāpti") In Navya-Nyāya”, *Journal of Indian Philosophy*, 1976, Vol. 4: pp. 1-55.
- Wada, Toshihiro, “Gaṅgeśa and Mathurānātha on Siṃhavyāghralakṣaṇa of "Vyāpti”, *Journal of Indian Philosophy*, 1995, Vol. 23: pp. 273-294.